বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

বিয়াল্লিশতম খণ্ড	গ্রীষ্ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

সম্পাদক
ভীষ্মদেব চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক
সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
সম্পাদক	:	অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক আবদুল বাছির
		অধ্যাপক শুচিতা শরমিন
		অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Bhishmadeb Choudhury, published by Professor M. Siddiqur Rahman Khan, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9513783, E-mail: asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মিশনারি শিক্ষা-উদ্যোগের ফলাফল
মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ১

আগরতলা মামলা এবং জনমত গঠনে *আজাদ* পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন 'ট্রাইবুনাল কক্ষে'
এ. এস. এম. মোহসীন ১৯

***শাম্ব* : পুরাণ ও ইতিবৃত্তের মেলবন্ধন**
হোসনে আরা ৪৭

নিয়োগযোগ্যতার সহিংসতা: একটি শ্রম-নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ
আনন্দ অন্তঃলীন ৬১

ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি: নৃত্যের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা
ওয়ার্দা রিহাব ৮১

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসের শৈলীবিচার
বেগম শারমিনুর নাহার ১০৩

নজরুলের নাটকবিচারে সমস্যা এবং ভিন্ন পাঠের প্রস্তাব
মো. নাজমুল হোসেন ১১৫

পূর্ব বাংলায় নারী পেশাজীবী শ্রেণি (১৯৪৭-৭০)
আসমাউল হুসনা ১৩১

ভারতবর্ষে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের গোড়ার কথা
মো. গোলাম কিবরিয়া ১৫১

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় এশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:
   - বাংলা বিজয় সফট্ওয়্যারের সুতন্বি-এমজে ফন্টে প্রবন্ধটি কম্পোজ করতে হবে। প্রবন্ধটির মোট শব্দসংখ্যা ৩০০০ থেকে ৫০০০-এর মধ্যে সীমিত হতে হবে;
   - কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ১.৫ ইঞ্চি, নিচে ১.৫ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি।

২. প্রবন্ধের সাথে প্রবন্ধকারের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:
   - জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
   - এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   - প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
   - এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধকার পত্রিকার একটি কপি ও প্রকাশিত প্রবন্ধের দশ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. কোনো প্রবন্ধ প্রকাশের বিষয়ে সম্পাদনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৫. বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের বানান অনুযায়ী প্রবন্ধটি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো ভুক্তিতে (entry) একাধিক শীর্ষশব্দ (headword) থাকলে প্রথমটির বানান গ্রহণ করতে হবে। তবে গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তাও অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।

৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

৭. প্রবন্ধের শেষে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। মূল পাঠের মধ্যে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যা সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) ব্যবহার করাই নিয়ম।

৮. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৯. তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশস্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নম্বরের উল্লেখ করতে হবে।

১০. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)।

১১. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে। আনুমানিক ২০০ শব্দের সারসংক্ষেপ এবং চাবি শব্দ (Key word) (৩-৭টি) থাকতে হবে।

১২. একাধিক লেখকের নামযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পৃথক পৃষ্ঠায় বাংলা ও ইংরেজিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজনী হিসেবে জমা দিতে হবে:

(ক) প্রবন্ধের শিরোনাম, (খ) সারসংক্ষেপ, (গ) চাবি শব্দ, (ঘ) সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২৪ ও ২০২৫

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হাফিজা খাতুন অধ্যাপক সাজাহান মিয়া অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ফেলো) ব্যরিস্টার শফিক আহমেদ (ফেলো) অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান অধ্যাপক সাদেকা হালিম অধ্যাপক আশা ইসলাম নাঈম অধ্যাপক আবদুল বাছির অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশ অধ্যাপক মো. আবদুল করিম অধ্যাপক শুচিতা শরমিন অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মিশনারি শিক্ষা-উদ্যোগের ফলাফল

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমনের শুরু থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রভাব পড়তে শুরু করে। বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা খ্রিষ্টান মিশনারিরা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যা পরবর্তীতে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা পাল্টে দেয়। বাংলায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে পাশ্চাত্য ধারায় বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান শুরু হয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় ভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়। মিশনারিতে ছাপাখানা স্থাপনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে বিতরণ করা হয়। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ, আদিবাসী ও নারীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা বাড়ে। এর ফলে বাংলার সার্বিক জীবনাচরণে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। এককথায়, আধুনিক শিক্ষার ভিত রচিত হতে থাকে মিশনারিদের হাত ধরে। সপ্তদশ থেক ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মিশনারিদের গৃহীত শিক্ষা-উদ্যোগসমূহ এবং এসব উদ্যোগের ফলে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রায় পড়া প্রভাব বর্তমান নিবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চাবি শব্দঃ বৈদিক শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা, মিশনারি শিক্ষা, শিক্ষা-উদ্যোগ, শ্রীরামপুর মিশন, উইলিয়াম ক্যারি

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারত উপমহাদেশে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষের আগমন শুরু হয়। ইউরোপীয়দের পূর্বে এ উপমহাদেশে আরব বণিকদের একচ্ছত্র বাণিজ্য ছিল। ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা (১৪৬০-১৫২৪) সামুদ্রিক পথ আবিষ্কারের মাধ্যমে ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন। এর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশ পাশ্চাত্যের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ বাংলায় ছড়িয়ে পড়েন। "ডাচরা চিনশুরায়, ডেনিশরা শ্রীরামপুরে, ফরাসিরা চন্দননগরে এবং ইংরেজরা হুগলি নদীর উপকূল ছেড়ে একসময়ে প্রাণকেন্দ্রে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে।"[১] ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আসা নাবিকদের সঙ্গে থাকতেন পাদ্রি ও মিশনারিরা। তারা ধর্মের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্রতী হতেন। ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তার এ দুটির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল।[২] অনস্বীকার্য যে, মিশনারিগণ এ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা আধুনিক শিক্ষার প্রাথমিক ভিত তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

* সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি), পরিচালক (সংযুক্ত), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
পিএইচ.ডি গবেষক, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ধর্ম প্রচার করতে এসে মিশনারিরা কেন শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হলেন তার পশ্চাতে আরও অনেক কারণ আছে। 'ধর্মের প্রতি অনুরাগকে স্থায়ী করার জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তেমনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ছিল সহজসাধ্য।'[৩] নতুন নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে মিশনারিরাই এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। আবার, শিক্ষার পরিকল্পনা ও শিক্ষা প্রদানে উপমহাদেশের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়। এজন্য মিশনারিরা কোথাও ধর্মান্তরিতদের জন্য, আবার কোথাও বা ধর্মান্তরিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।'[৪] মিশনারিদের শিক্ষা-উদ্যোগগুলো রাজনৈতিকভাবেও প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে, রাজনৈতিক সরকারও সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রধানত প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিষ্টান মিশনারি ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় সক্রিয় ছিল। তবে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের মূল সংযোগটি স্থাপন শুরু হয় ষোলো শতকে।

পর্তুগিজ, দিনেমা, ইংরেজ ও ফরাসি মিশনারিগণ বিভিন্ন সময়ে বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা বাংলার সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ফলে বাংলায় প্রচলিত ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার স্থলে খ্রিষ্ট ধর্মপ্রভাবিত পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা চালু হতে থাকে। অনেক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা তৈরি হয়। মিশনারি শিক্ষার সঙ্গে সরকারি শিক্ষার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। উপমহাদেশের প্রচলিত ধর্ম-প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানভিত্তিক ও সমাজ-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার সাথে খ্রিষ্ট ধর্মের মিশেলে নতুন এক শিক্ষার উদ্ভব হয়। মিশনারি শিক্ষার ক্রমোন্নতির প্রভাব বাংলায় বহমান থাকে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার লাভ করতে থাকে। ইউরোপ থেকে আসা বিভিন্ন জাতির মিশনারি শিক্ষার ধরন, মিশনারিদের শিক্ষা-উদ্যোগসমূহের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম যা গবেষণার দাবি রাখে।

২. মিশনারি শিক্ষার পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থা

মিশনারি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হলে মিশনারি-পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থার দিকে আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাংলার "প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতে এক সহজ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।"[৫] মিশনারিদের আগমনের পূর্বে ভারত উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা জানা যায় তা হলো বৈদিক শিক্ষা। বৈদিক পর্বের পর বৌদ্ধ শিক্ষা এবং পরবর্তীতে মুসলিম শিক্ষার প্রসার ঘটে।

২.১ বৈদিক শিক্ষা

"বৈদিক কথাটি এসেছে বেদ থেকে যা থেকে বোঝা যায় বেদই বৈদিক শিক্ষার মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে।"[৬] বৈদিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল বিষয় ছিল শ্রুতি যা শোনার কাজকে বোঝানো হয়। পিতা-ই পুত্রকে বেদ শিক্ষা দিতেন। শূদ্রের বেদ শিক্ষার অধিকার ছিল না। পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর উপনয়নের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গমন করত।[৭] শিক্ষাগুরুগণ বেদ পাঠ করতেন এবং শিষ্যগণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে তা শুনে শিক্ষালাভ

করত। এই শ্রুতি পদ্ধতির তিনটি সোপান ছিল শ্রবণ, চিন্তন ও প্রণিধান।[৮] এই সময়ে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল পুরোহিতদের ওপর। শিক্ষার্থীদের বয়স পাঁচ বছর হলে বিদ্যারাম্ভ অনুষ্ঠানের মাধমে শিক্ষাজীবন শুরু হতো। বিদ্যারাম্ভ অনুষ্ঠানের পর হতো উপনয়ন। বৈদিক যুগে শ্রবণ ও আবৃত্তিই শিক্ষার প্রধানতম পদ্ধতি ছিল। আশ্রম বা গুরুগৃহ ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। মুখস্থ, প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা ও বিতর্ক ছিল মূল পদ্ধতি। গুরু শিক্ষার্থীকে পুত্রের মতো মনে করতেন এবং ছাত্রকে কঠোর নিয়ম অনুযায়ী গুরুগৃহে থাকতে হতো।

২.২ বৌদ্ধ শিক্ষা

বৈদিক শিক্ষার পর উপমহাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ শিক্ষা ধর্মগ্রন্থ *ত্রিপিটক*ভিত্তিক হওয়ায় এর মূল বিষয় ছিল নির্বাণ লাভ করা। তবে পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ শিক্ষা উপমহাদেশে সর্বজনীন ও লোকায়ত জীবনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার রূপ গ্রহণ করে। ভারতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব শূদ্রদের লেখাপড়ার পথকে সুগম করে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম বর্ণপ্রথার বিরোধিতা না করলেও সকল বর্ণের মানুষকে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।[৯]

কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ হীনযান এবং মহাযান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। "অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী হওয়ায় মহাযান সম্প্রদায়ভুক্তরা লোকায়ত শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসে যার ফলশ্রুতিতে পাঠ্যসূচিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও চিকিৎসাবিদ্যা স্থান পায়।"[১০] সংঘারাম বা বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। আট বছর বয়স পর্যন্ত বৌদ্ধ শিশু পিতৃগৃহে শিক্ষা লাভ করত। আট বছর পর প্রব্রজ্যা[১১] অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘারামে কঠোর ছাত্রজীবন আরম্ভ করত।

তক্ষশীলা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক চাণক্য কৌটিল্য (৩৭০-২৮৩ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) এবং শৈল্য চিকিৎসক জীবক কুমার ভক্ক (৫৪০-৪৩৯ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ?) এখানকার কৃতী ছাত্র ছিলেন। কৌটিল্য তার *অর্থশাস্ত্র* এখানে রচনা করেছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ছাড়াও তিব্বত, চীন, কোরিয়া ও মধ্য এশিয়ার পণ্ডিত ও ছাত্ররা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে আসতেন। নালন্দায় চতুর্বেদ, হীনযান শাস্ত্র, মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্বসমূহ, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, জাদুবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ব্যবহারিক শাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ানো হতো।[১২] চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (৬০৩-৬৬৪) উল্লেখ করেন যে, সেসময় নালন্দায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করত।[১৩] এছাড়া, রাজা ধর্মপাল (৭৮৩-৮২০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঠাধ্যক্ষদের মধ্যে প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর উল্লেখযোগ্য।

২.৩ মুসলিম শিক্ষা

বৌদ্ধ শিক্ষার পর উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা প্রসার লাভ করে। সিন্ধুরাজ দাহিবের পরাজয় এবং মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয়ের মাধ্যমে ভারতে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরবীয় মুসলমানেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। বিজয়ী মুসলমানগণ এ দেশে নতুন ভাষা, লিপি ও নতুন ধর্ম নিয়ে আসেন। ভারতের

ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ের পর নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং মুসলমান শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন রাজনৈতিক ক্ষমতাবলয়ে থাকার কারণে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা দ্রুত বিস্তার ও উন্নতি লাভ করে। মুসলিম শাসকদের সময়ে "মুগল শাসনামল ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল যুগ।"[১৪] বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত *শিক্ষার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি* গ্রন্থ থেকে জানা যায়:

> মধ্যযুগে মুসলিম শাসিত ভারতে মক্তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন হতো। এ ধরনের মক্তব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিচালিত হতো মসজিদগুলোতে। সাধারণভাবে, সাত বছর বয়সে মক্তবের শিক্ষা শুরু হতো; তবে শিশুর বয়স চার বছর পুরো হলেই 'সবক' বা হাতেখড়ি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ করানোর ওপর জোর দেওয়া হতো। পড়তে ও লিখতে পারা এবং হিসাবনিকাশ জানার মধ্যেই মক্তবের শিক্ষা সীমিত ছিল। উচ্চ শিক্ষার জন্য সুলতান ও সম্রাটগণ ভারতের বিভিন্ন শহরে মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। মাদ্রাসাগুলো সাধারণভাবে স্থাপিত হয়েছিল মসজিদের কাছাকাছি। এ সকল মাদ্রাসায় ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হতো। উচ্চ শিক্ষার একটি প্রধান দিক ছিল আরবি, ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের চর্চা।[১৫]

এ-সময়ে দিল্লি, আগ্রা, ফিরোজপুর, জৈনপুর, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সম্রাট আকবরের আমলে *মহাভারত*, *রামায়ণ*, *হরিবংশ*, *অথর্ববেদ*, *নলদময়ন্তি উপখ্যান*, *বত্রিশ সিংহাসন* এবং খ্রিষ্টানদের *সুসমাচার*ও অনুবাদ হয়। আকবরের সময় মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি শিক্ষা, জরিপ, নীতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, শাসনবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, চিকিৎসা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, গার্হস্থ্যবিদ্যা এগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর সময়ে মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল। মুঘল আমলে নারী শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাধারা হিসেবে পরিগণিত হয়। সম্রাট আকবর মেয়েদের জন্য পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনেকে ঘরে বসে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করত। মুঘল আমলে অনেক সুশিক্ষিত নারীর পরিচয় মেলে। সম্রাট বাবরের কন্যা গুলবদন *হুমায়ননামা* রচনা করেন।

৩. বাংলায় মিশনারি শিক্ষা-উদ্যোগ

বাংলায় তৎকালে প্রচলিত বৈদিক, বৌদ্ধ ও সবশেষ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার ওপর মিশনারি শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। তবে তখন মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থাই বেশি উন্নত ছিল। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার (১৮৪০-১৯০০) তার *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "এ দেশটা আমাদের হুকুমাতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল।"[১৬] ভাস্কো-দা-গামার জলপথ আবিষ্কারের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের উপমহাদেশে আগমনের শুরু। এ প্রসঙ্গে সরদার আবদুর রহমানের *বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য-বসতি* গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

> চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপীয়রা বিপুল জলরাশি পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সম্পদের সন্ধান করতে থাকে। এর একটা বড়ো অংশ জুড়েই ছিল দস্যুতা তথা জোরপূর্বক সম্পদ আহরণ। এটি পর্যায়ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপ ধারণ করে। এর আগে সপ্তম শতক থেকেই ভারত মহাসাগরসংলগ্ন অঞ্চলের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। তারা বাণিজ্য করতো মূলত সমুদ্রপথে। একটি বিবরণে জানা যায়, ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনপোল অটোমান তুর্কিরা দখল করে নেয়। ফলে উপমহাদেশের সঙ্গে জলপথে ব্যবসা-

> বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন জলপথ আবিষ্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[১৭]

মিশনারি শিক্ষা প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) তাঁর *বাংলা দেশের ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

> খ্রিষ্টীয় মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেরা বাংলা শিক্ষা করেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য সচেষ্ট হন। প্রধানত: তাঁহাদের চেষ্টায়ই সর্ব প্রথমে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৭৩১ খ্রীঃ অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের ২৬ বৎসর পূর্বেই সেন্ট এন্ড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ (St. Andrews Presbyterian Church) একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করে। এখানে এবং এইরূপ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি এবং আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান শেখান হইত।[১৮]

পর্তুগিজ, দিনেমা, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি মিশনারি ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে এবং পরবর্তীতে বাংলায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় এবং প্রয়োজনের নিরিখে মিশনারিদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় যা পরবর্তীতে উপমহাদেশসহ বাংলার শিক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে বিবিধ প্রভাব তৈরি করে। পাশাপাশি, শিক্ষা বিস্তারে মিশনারিগণ বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রদানের ওপর জোর প্রদান করায় বাংলা ভাষারও উন্নতি সাধিত হয়।

৩.১ পর্তুগিজ মিশনারি

পর্তুগালের অধিবাসী ভাস্কো দা গামা তাঁর বাণিজ্যতরী 'তালীবনরাজিনীলা'[১৯] নিয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন। পর্তুগিজরাই ভারত উপমহাদেশে প্রথম ইউরোপীয়। মিশনারিদের মধ্যে তারাই প্রথম শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখেন। কালিকট তখন আরব বণিকদের মূল ব্যবসার ক্ষেত্র ছিল। এর সমৃদ্ধি ঘটেছিল আরব বণিকদের হাতে। ভাস্কো দা গামার পরবর্তী পর্তুগিজ বণিক পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল (১৪৬৮-১৫২০) কোচিনের রাজার সহায়তায় আরব বণিকদের কালিকট বন্দর থেকে বিতাড়িত করার জন্য এক যুদ্ধে কালিকটের রাজাকে পরাজিত করেন এবং কালিকট দখল করেন। পর্তুগিজরা বহু আরব বণিক ও নাবিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আগত বণিকদলকে পরাজিত করে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্থল ও নৌপথে দস্যুবৃত্তি চালাতে পর্তুগিজরা কোনো দ্বিধা করত না। এ বিষয়ে উনিশ শতকের খ্যাতিমান স্কটিশ ইতিহাসবিদ জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) বলেন:

> From the time when Vasco de Gama distinguished his nation by discovering the passage round the Cape of Good Hope, a whole century had elapsed, during which, without a rival, the Portuguese had enjoyed, and abused, the advantages of superior knowledge and art, amid a feeble and half-civilized people. They had explored the Indian ocean, as far as Japan; had discovered its islands, rich with some of the favourite productions of nature; had achieved the most brilliant conquests; and, by their commerce, poured into Europe, unexampled profusion, those commodities of the East, on which the nations at that time set an extraordinary value.[২০]

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলাতেও পর্তুগিজরাই প্রথম পদার্পণ করে। বাংলায় তাদের প্রথম আগমন ঘটে ১৫১৬ সালে। তখন ভারতের গোয়া থেকে তারা মাঝে মাঝে বাংলায় বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করত।[২১] পর্তুগিজদের প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। ব্যবসার পথ সুগম করতে তারা নানবিধ কৌশল অবলম্বন করে। এসব কৌশলের মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা ও ধর্মকে ব্যবহার করা। মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "অর্ডার অব জেসুইট সদস্যদের প্রথম দলটি ভারতে পা রাখে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে। এই দলে ছিলেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার।"[২২] ইতিহাস ও বিভিন্ন ভ্রমণ বিবরণ থেকে জানা যায়, "বাংলায় প্রথম এসেছিলেন জেসুইট ও সেকুলার পাদ্রীরা। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় পৌঁছেন জেসুইট ফাদার অ্যান্টোনিও ভাজ ও পেদ্রো ডিয়াজ।"[২৩] তবে পর্তুগিজ মিশরারিগণ এ অঞ্চলে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন। গোয়া, দমন, দিও, হুগলি ছিল তাদের ধর্ম প্রচারের প্রধান স্থান। পর্তুগিজরা ভারতে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

১) চার্চ ও যাজক পল্লি সংলগ্ন প্রাথমিক ল্যাটিন বিদ্যালয়

২) ভারতীয় অনাথ বালক বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩) উচ্চ শিক্ষার জন্য জেসুইট কলেজ

৪) ধর্ম প্রচার শিক্ষণের জন্য সেমিনারি[২৪]

৩.২ দিনেমা মিশনারি

ইউরোপের ছোটো দেশ ডেনমার্ক। সেখানকার বাণিজ্য-অভিযাত্রীদেরকে ভারতে 'দিনেমা' নামে অভিহিত করা হতো। ডেনমার্কের একদল বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে তারা দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলার ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু এ দেশে তারা লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হন। ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে কোনোরকম বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমারা বাংলা ত্যাগ করেন।[২৫] দিনেমা মিশনারিরা প্রধানত ব্রিটিশদের সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

বাংলায় শ্রীরামপুরে দিনেমাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল। বহুদিন এ স্থানকে কেন্দ্র করে তারা উত্তর ভারতে প্রচারকার্য চালাতেন। দিনেমা মিশনারিদের মধ্যে জিগেনবল্গ ১৭১৩ সালে তামিল ভাষার একটি ছাপাখানা, ১৭১৬ সালে ত্রিবাঙ্কুরে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ১৭১৭ সালে দুটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন। তাছাড়া, ১৭১৯ সালে প্রসিদ্ধ দিনেমা মিশনারি সুলজ ভারতে এসে পুরাতন বিদ্যালয়গুলোকে সংগঠিত করেন এবং আরও দুটি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৪২ সালে ফিয়ারন্যান্ডার সেন্ট ডেভিড দুর্গের নিকট ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬]

৩.৩ ইংরেজ মিশনারি

সপ্তদশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজ বণিকগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে ভারতে আসেন। ১৬৩৩ সালে শাহজাহানের এক ফরমানের মাধ্যমে গির্জার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধাসহ ইংরেজদেরকে ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি দান করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজরা হুগলিতে কুঠি স্থাপন করে। একই সময়ে শাহ সুজা ইংরেজদের অবাধে ব্যবসা করার নিশান জারি করেন। কোম্পানির কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব বিদ্যালয়ের পরিচালনায় মিশনারি সংস্থা খ্রিষ্টান জ্ঞান প্রচারক সমিতি (Society for Promoting Christian Knowledge)-এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।[২৭]

সরকারি উদ্যোগের বাইরে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন ইংরেজ খ্রিষ্টান মিশনারিরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আসার চৌদ্দ বছরের মাথায় মিশনারির জন্য ভারতীয় যুবক সংগ্রহ এবং কোম্পানির খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এ ব্যবস্থাটি ছিল সাময়িক বিধায় অসংগঠিত। ১৬৫৯ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য জাহাজে মিশনারিদের প্রেরণের আদেশ জারি করে। এ আদেশের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মিশনারিদের নিয়মিতভাবে আসা শুরু হয়। ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে ১৬৯৮ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছর কোম্পানির সনদ নবায়নের সময় শর্ত দেওয়া হয় যে, ক) ভারতীয় ফ্যাক্টরিসমূহে ধর্মকর্তা (Minister of Religion) নিয়োগ করতে হবে, খ) প্রত্যেক ধর্মকর্তাকে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষালাভ করতে হবে, গ) পাঁচশত বা তদূর্ধ্ব ওজনের মালবাহী জাহাজে অন্তত একজন পাদ্রি থাকবেন, ঘ) প্রতিটি সেনানিবাস ও কারখানার সাথে প্রয়োজন অনুসারে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[২৮]

কিন্তু ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভের পর কোম্পানির শিক্ষা বিষয়ের নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। স্থানীয় রাজনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে তা বিবেচনায় কোম্পানি এক ধরনের নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। "তাদের এই ভয় ছিল যে মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ফলে এদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।"[২৯] বিষয়টি মিশনারিদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে। এ নিয়ে কোম্পানি ও মিশনারিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

৩.৪ শ্রীরামপুর মিশনারি

শ্রীরামপুর মিশনারি মূলত ইউরোপ থেকে আসা সকল জাতির মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনার পীঠস্থান। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভের পর কোম্পানি শিক্ষা নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা পূর্বের মিশনারি উদ্যোগের সঙ্গে প্রায় বিপরীতমুখী অবস্থানে দাঁড়ায়। সেসময়ে চলমান শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 'তাদের ধারণা ছিল এইসব উদ্যোগ তাদের পক্ষে যাবে অর্থাৎ তাদের শাসন-ব্যবস্থার অনুকূলে থাকবে এবং

তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে।'[৩০] সরকার মনে করত যে, মিশনারিদের চলমান কার্যক্রম ভারতবাসীর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করবে এবং বিরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মিশনারিরা ইংল্যান্ডে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। কোম্পানির বিরোধিতা সত্ত্বেও মিশনারিরা শিক্ষা প্রসারের কাজ চালিয়ে যান। সম্ভবত এ কারণে প্রখ্যাত ব্যাপটিস্ট মিশনারি ইউলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) উদ্দেশ্য গোপন করে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। মিশনারি চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ চার্লস গ্রান্ট মতামত প্রদান করেন যে, খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিতকরণ ও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তন করাই হবে ভারতীয়দের মুক্তির পথ। উইলবার ফোর্স যথেষ্টসংখ্যক মিশনারি ও শিক্ষককে বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশের অনুমতি দানের আবেদন জানান। উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) ও উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) ইংরেজদের সহযোগী হিসেবে বাংলার যশোর, দিনাজপুর ও কলকাতায় ধর্ম প্রচার করেছেন। শ্রীরামপুর ছিল দিনেমা সরকারের বাণিজ্য কুঠি।[৩১] প্রতিকূল পরিবেশেও মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের পরামর্শে ডাচ উপনিবেশ কর্তৃক শ্রীরামপুরে 'ব্যাপটিস্ট মিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁদের উদ্যোগে শ্রীরামপুরের চতুর্দিকে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ আবার নবায়নের সময় চার্লস গ্রান্ট, উইলবার ফোর্স প্রমুখ পাশ্চাত্যবাদী পার্লামেন্ট সদস্য মিশনারিদের অনুকূলে একটি ধারা সংযোজন করতে সমর্থ হন। উক্ত ধারার কল্যাণে মিশনারিরা ভারতে ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি ও কার্যকর জ্ঞান প্রচারের জন্য এ দেশে আসার আইনগত অধিকার লাভ করেন।[৩২] কেরি *রামায়ণের* ইংরেজি অনুবাদ করেন ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁরই উদ্যোগে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের *নিউ টেস্টামেন্ট* অনূদিত হয়। বাংলা ব্যাকরণের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। লর্ড ওয়েলেসলি প্রাচ্যবাদী ভাবধারা প্রচারের জন্য শ্রীরামপুর মিশনারিদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে নানাভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করেন।

১৮১৩ সালের সনদ আইনের ফলে বিপুলসংখ্যক মিশনারি ভারতে এসে নতুন উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্বের মিশনারি সোসাইটিগুলো কর্মক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করে। অনেক নতুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জেনারেল ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসইটি, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি ও চার্চ মিশনারি সোসাইটি কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার ও ভারতীয় ভাষাগুলোকে জনপ্রিয় করার কাজে তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করেন। নারী শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত ভারতে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি প্রচেষ্টায় মোট ১৬২৮টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে ৬৪০৪৩ জন শিক্ষার্থী ছিল।

৩.৫ ফরাসি মিশনারি

ভারত উপমহাদেশে সবশেষে আগত ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি হচ্ছে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৬৪ সালে এই বাণিজ্যিক কোম্পানি গঠিত হয়। ১৬৬৮ সালে কোম্পানি সর্বপ্রথম সুরাটে ও পরের বছর মসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তারা ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলায় সম্প্রসারিত করে। কোম্পানি বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত চন্দননগর কিনে নেয়। ১৬৯০ থেকে ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চন্দননগর একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত বাণিজ্য কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি এখানে একটি শক্তিশালী দুর্গ স্থাপন করে। নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসিরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে।

ইংরেজ বণিকরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে দৃঢ় অবস্থানে তখন ফরাসিরা এ দেশে আসে। এ অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মূলত ব্যবসায়িক স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুই ইউরোপীয় শক্তি– ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসিরা বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করায় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য তাদেরকে আরও পর্যুদস্ত করে ফেলে। ফলে বাংলার ফরাসি কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানি পরাজিত হলে তারা এ দেশ ত্যাগ করে।

ফরাসি মিশনারিদের উদ্যোগে চন্দননগরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ স্থাপিত হয়। ফরাসিদের স্থাপিত বিদ্যালয় ও কলেজে জাতি-ধর্মভেদে সকলের ভর্তির সুযোগ ছিল। ফরাসি মিশনারিদেরও খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, পোশাক ও খাবার সরবরাহ করা হতো।

৪. মিশনারি শিক্ষা-উদ্যোগের ফলাফল

মিশনারি শিক্ষা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা পদ্ধতি ও কারিকুলামের আধুনিকায়ন, সিলেবাস, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মিশনারিগণ কাজ করেন। পাশাপাশি, সমাজ-সংস্কার, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান নানা ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্তি, সাহিত্য ও সংবাদপত্র প্রকাশসহ নানা বিষয়ে মিশনারিদের কর্মকাণ্ড শিক্ষার প্রসার ও প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রাখে। লিখন, পঠন, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি, বৃত্তিমূলক বিষয় পাঠ্যসূচির অর্ন্তগত করে মিশনারিগণ শিক্ষার মান উন্নততর করেন। মিশনারিদের শিক্ষা-উদ্যোগের ফলাফল সম্পর্কে এক গবেষণা থেকে জানা যায়:

> The discussion of social uplift and betterment was considered an important component in the theories of educational aim. The missionary work was clearly a well accepted among the poor class in the villages and on those missions which were not famous like Cambridge Brotherhood who paid attention on the Indian elite. Those missions were famous among the Indian Christians because mostly were disgraced at the time of their conversion. Education can be considered as the possible means of rising in the social scale as compared to their Hindu neighbors.[৩৩]

মার্শম্যান *History of Serampore Mission* গ্রন্থে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের শিক্ষা প্রচার-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে লিখেছেন যে, শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছিল:

(১) মাতৃভাষায় বিভিন্ন পাঠপুস্তক রচনা

(২) জনশিক্ষা প্রসারের জন্য যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন

(৩) দেশীয় শিক্ষকদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের উপযোগী করে প্রস্তুত করা

(৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের জন্য মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা

(৫) ছাত্র-ছাত্রীকে উৎসাহ দানের জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা

(৬) উপযুক্ত পরিদর্শকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা[৩৪]

শিক্ষা বিস্তার করতে গিয়ে মিশনারিগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনমানে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ-সকল পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

৪.১ আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন

মিশনারিগণ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম আমূল পাল্টে দিয়ে নতুন কারিকুলাম তৈরি করেন। শ্রীরামপুর মিশন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় আস্থাশীল হলেও তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেরির সময়ে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি সাধন এবং শিক্ষা বিস্তারের ওপর। তবে তারা বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থায় খ্রিষ্টান ধারণাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কেরি সাধারণ জনগণের নিকট শিক্ষা পৌঁছে দিতে 'সর্দার-পড়ো' মডেলের মতো শিক্ষার একটি কার্যক্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মেকলের 'নিম্ন দিকে চোয়ানো তত্ত্বে' (downward filtration theory) উইলিয়াম কেরির কোনো আস্থা ছিল না। তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তার সহযোগী জে. মার্শম্যান ১৮১৬ সালে গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য 'স্থানীয় স্কুল সম্বন্ধে আভাস' নামে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। গ্রামের স্কুলসমূহেও পাটিগণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল, প্রাকৃতিক দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করে পাঠক্রম প্রণয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে যে পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হতো তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। এসব বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে (১) দেশীয় ভাষা ও তার ব্যাকরণ, (২) প্রাথমিক গণন ও গণিত, (৩) জ্যোতির্বিদ্যা, (৪) প্রাথমিক ভূগোল, (৫) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৬) ইতিহাস এবং (৭) নীতিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে সংকলনের বইও এইসব বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ছিল।[৩৫]

৪.২ পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ

নতুন কারিকুলামের ওপর ভিত্তি করে দেশীয় ভাষায় নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিতরণের ওপর মিশনারিগণ জোর প্রদান করেন। পূর্ণাঙ্গ *বাইবেল* ছাপানোর কাজের জন্য শ্রীরামপুর মিশনে প্রেস স্থাপন করা হলেও এখানে পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। *বাইবেলের* অনুবাদ ছাড়াও ব্যাপ্টিস্টগণ এবং তাদের ভারতীয় সহযোগীবৃন্দ যেমন, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার *রামায়ণ* ও ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের অংশবিশেষ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তাঁরা গবেষণামূলক প্রবন্ধ অথবা প্রচারণামূলক পুস্তিকা অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিতরণ করেন যা সন্দেহাতীতভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। শ্রীরামপুর থেকে অন্যান্য বাংলা প্রকাশনাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কেরির *কথোপকথন* যা বাংলার সমকালীন সামাজিক জীবনকে প্রতিফলিত করে। ব্রিটিশ ব্যাপ্টিস্ট শিক্ষাবিদ জন ম্যাকের *প্রিন্সিপল্‌স অব কেমিস্ট্রি*, উইলিয়ম ওয়ার্ডের *একাউন্ট অব দি রাইটিংস*, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড ম্যানার্স অব দি হিন্দুস*সহ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়।

৪.৩ নারী শিক্ষা

মিশনারিগণ বাংলায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৭৬০ সালে স্থাপিত হেজেস গার্লস স্কুল সম্ভবত নারীদের জন্য প্রথম স্কুল।[৩৬] ভারতীয় নারীদের অবস্থা বিবেচনা করে ১৮২০ সালে উইলিয়াম ওয়ার্ড ইংরেজ নারীদেরকে ধর্মপ্রচারে যোগদানের আবেদন জানান। চুঁচুড়ায় ১৮১৮ সালে মেয়েদের জন্য প্রথম মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির রবার্ট মে। ১৮২৩ সাল নাগাদ খ্রিষ্টান মিশনারি সোসাইটির সাহায্য নিয়ে মিস মেরী অ্যান কুক কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ৩০০ জন ছাত্রী নিয়ে ১৫টি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যবর্তী দশকে ধর্মপ্রচারকগণ বাংলায় বিভিন্ন ধর্ম প্রচারের আবাসস্থল যেমন, কাটোয়া, সুরি, বহরমপুর, চুঁচুড়া, বর্ধমান, কালনা, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি স্থানে এ-রকম আরও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপ্রচারকদের স্ত্রীগণ এ স্কুলগুলোর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মেয়েদের পাঠক্রম ছেলেদের স্কুলের পাঠক্রমের অনুরূপ ছিল। মেয়েদের স্কুলসমূহের সাফল্য কম হওয়ায় ধর্মপ্রচারকগণ বোর্ডিং স্কুলের ওপর অধিক মনোযোগ দেন। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, সমগ্র ভারতে মেয়েদের সাত হাজার মিশনারি স্কুলের ছাত্রীদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান। ক্রমাগত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ছাত্রদের অনুরূপ কারিকুলাম, বিনাবেতনে শিক্ষা, বোর্ডিং সুবিধা ইত্যাদি কারণে নারী শিক্ষায় জোয়ার তৈরি হয়। ১৮৫২ সালে ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্সের *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* গ্রন্থে নারী শিক্ষার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ আছে।[৩৭] এছাড়া, নারী মিশনারিদের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতো:

> Apart from the regular schools, women missionaries had the clear advantage in the connecting with the native was Zenana education for women at home. The system of sending of missionary women into Zenanas (women's quarter of the house) where women were secluded or denied access to education become acceptable to some wealthy who

were interested in having educated wives. During the mid ninetieth century, the movement for home education in the Zenana developed fairly rapidly.[৩৮]

৪.৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী মিশন স্কুলসমূহে বিদ্যাশিক্ষার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি বিবেচনায় শ্রীরামপুর মিশন নিজেদের তত্ত্বাবধানে ১৮১৮ সালে একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষকতার কাজে যোগদানের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে এই নর্মাল স্কুলে প্রশিক্ষণ নিতে হতো।[৩৯] শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারণাটি এ অঞ্চলে মিশনারিগণই প্রথম প্রয়োগ করেন যা পরবর্তীতে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে ভূমিকা রাখে।

৪.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি

মিশনারিগণ শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়ার শুরুতে শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেন। মার্শম্যান বেল পদ্ধতি এবং প্রাচীন ভারতীয় সর্দার পড়ো বা মনিটরিয়াল পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি মনে করেন, দুটো পদ্ধতিই বাংলায় শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত।

৪.৫ উচ্চ শিক্ষা

উইলিয়াম কেরি ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্ট পাসের পর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর ত্রয়ী এশীয় যুবাদের প্রাচ্য দেশীয় সাহিত্য ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ শিক্ষা দান করতে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ কেন্দ্র প্রকাশিত *History of Education of India* গ্রন্থ থেকে জানা যায়:

> বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এবং যে সমস্ত ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষীত হয়েছে তাদের শিক্ষাদানের জন্য কলেজটি প্রথম স্থাপন করা হয়। কলেজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে মিশনের পুস্তিকায় বলা হয়েছে "এই কলেজে ভারতীয় খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য দেশীয় যুবকদের প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হবে।" কলেজটি স্থাপনে শ্রীরামপুরের তদানীন্তন দিনেমা গর্ভনর মিশনকে নানাভাবে সাহায্য করেন। কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কলেজটি একটি প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখেন নি। কলেজে ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব, আধুনিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সহ মানমন্দির (Observatory) গড়ে তোলা হয়। এছাড়া, কলেজে একটি উন্নত ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। প্রথম বছর যখন কলেজটি স্থাপন করা হয় তখন কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৭ জন যার মধ্যে ১৪ জন হিন্দু, ১৯ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪ জন। ১৮২৭ সালে তদানীন্তন ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডরিক এক সনদ জারি করে কলেজকে ডিগ্রি প্রদানের অধিকার দান করেন। ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে, এই শ্রীরামপুর কলেজই ভারতে প্রথম ডিগ্রি দেওয়ার অধিকার লাভ করে।[৪০]

বিশিষ্ট স্কটিশ ধর্মপ্রচারক আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-১৮৭৮) স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩০ সালে। এর মাধ্যমে বাঙালি যুবকদের পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কলেজটি 'উচ্চ বর্ণের' হিন্দু যুবকদের ধর্মান্তরিত করার প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়। ১৮৩২ থেকে ১৮৪৯ সময়ে মহেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জী ও লাল বিহারী দেসহ অনেক যুবক খ্রিষ্টান হন। এ ধর্মান্তরকরণ কলকাতার সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে ডাফের প্রচেষ্টাকে রামমোহন

রায় উষ্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। উডের শিক্ষা প্রস্তাবে (১৮৫৪) বেসরকারি স্কুলসমূহের জন্য সরকারি অনুদান প্রবর্তন করার পর বাংলা ভাষায় পরিচালিত স্কুলসমূহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ধর্মপ্রচারকগণ সেগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন। এ স্কুলগুলো ইংরেজি শিক্ষাক্ষেত্র থেকে মিশনারি স্কুলসমূহকে প্রায় হটিয়ে দেয়।

৪.৬ আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা

খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ আদিবাসী সাঁওতালদের নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান এবং খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন। নর্দান চার্চের সাঁওতাল মিশন পরবর্তী সময়ে উপজাতিদের ধর্মান্তরিতকরণের সর্ববৃহৎ মিশনে পরিণত হয়। চার্চ মিশনারি সোসাইটি ১৮৫৯ সালে ই. এল পাক্সলির অধীনে ভাগলপুর মিশনের সাঁওতাল শাখা খোলে। ১৮৬৩ সালে সাঁওতাল ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বিবেচনায় একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় যা ব্যাপকভাবে সফল হয়। পাক্সলি ১৮৬৬ সাল নাগাদ সাঁওতাল শব্দকোষ, সাঁওতাল অভিধান, *বাইবেলের* ইতিহাস, *সেন্ট ম্যাথিউর উপদেশাবলির* অংশবিশেষ ও ইংল্যান্ডের সরকার অনুমোদিত গির্জায় ব্যবহৃত প্রার্থনাপুস্তক রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। সাঁওতালদের মনে এ বিশ্বাস জন্মায় যে, জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষাই হলো একমাত্র রক্ষাকবচ। এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

৪.৭ অন্যান্য কার্যক্রম

মিশনসমূহ আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। এ-সকল কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো উল্লেখযোগ্য:

৪.৭.১ সংবাদপত্র প্রকাশ: সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচারে শ্রীরামপুরের ধর্মপ্রচারকগণ ভূমিকা রাখেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ* (১৮১৮-১৮৫২) সম্পাদনা করতেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি পিতা জশোয়া মার্শম্যানের সাথে *দিগ্‌দর্শন* নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। এছাড়া, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত *ম্যাগাজিন ফর ইন্ডিয়ান ইয়ুথ*, *দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* ইত্যাদি পত্রিকা সমকালীন সামাজিক সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.৭.২ বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন: বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্য দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রীরামপুর মিশনের মাধ্যমে বাংলা গদ্য একটি সংগঠিত রূপ লাভ করে। মিশন থেকে *বাইবেলের* অংশ "মঙ্গল সমাচার: মতীয়ের রচিত" অনুবাদ করে ও ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। ধারণা করা হয়, এটিই বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম ছাপানো বই। বাংলা ভাষায় *রামায়ণ*, *মহাভারত*, ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* শ্রীরামপুর মিশন থেকেই প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের সাহায্যে *কথোপকথন* এবং *ইতিহাসমালা* নামে দুটি বই রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

৪.৭.৩ সমাজ সংস্কার: মিশনারিগণ কিছু হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচারানুষ্ঠান, যেমন–জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, শিশুহত্যা, অন্তর্জলী[৪১] ইত্যাদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজমান এ-সকল সামাজিক ব্যাধি নিষিদ্ধ করতে আইন পাসে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি, মিশনারিদের শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার হওয়ার ফলে আধুনিক ও কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষার প্রসারের জন্য সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

৪.৭.৪ কৃষি ও শ্রমিক কল্যাণ: ক্যালকাটা মিশনারি কন্‌ফারেন্স বাংলার কৃষকদের সমর্থন করেছিল। নীল সংকটের পর বাংলায় কর্মরত ধর্মপ্রচারকগণের ভেতর এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে, কেবল বিচক্ষণ খ্রিষ্টান শিক্ষা কৃষকদের দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে পারে। তারা সাধারণ গণশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উইলিয়াম কেরি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং কৃষিজীবীদের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান সরবরাহ করে সংগঠিত করতে হবে। দারিদ্র্য অশিক্ষা ও শিক্ষাহীনতার একটি প্রধান কারণ। তাই তিনি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসকে পৃষ্ঠপোষক করে ভারতে প্রথম ভারতীয় কৃষি সমিতি গঠন করেন।[৪২] এ সমিতি কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান, কৃষক সমাজের উন্নয়ন ও সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

উপসংহার

"যদিও ভারতবর্ষে মিশনারি কার্যকলাপ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্ত একটি লক্ষ্য ছিল অপরিবর্তিত। তা হল, ভারতবর্ষে খ্রিস্টানধর্ম প্রচার করে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে খিস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত করা। মিশনারিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল ভারতে শিক্ষা বিস্তার।"[৪৩] ভারতে আসা মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারে জড়িয়ে যাওয়ার পশ্চাতের কারণ নিয়ে বিস্তর আলোচনা দেখা যায়। খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা এবং পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে বাংলার মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা ছিল মিশনারি শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তৎকালীন তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, মিশনারি শিক্ষা-উদ্যোগসমূহ বাংলায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রায় প্রতিস্থাপিত করেছিল।

১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিশনারিদের ধর্ম প্রচার ও এদেশে খ্রিষ্টানদের শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করলেও "পলাশির যুদ্ধ হয়ে যাবার পরে, মিশনারিদের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। তাদের এই ভয় ছিল যে মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ফলে এ দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।"[৪৪] এ-রকম ধারণা থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৩ সাল হতে মিশনারিদের শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিরোধিতা করে আইন জারি করতে থাকে। এ-সকল আইনের মধ্যে একটির মাধ্যমে মিশনারি স্কুলগুলোতে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক কারণে এবং ব্যবসার পথ নিষ্কণ্টক করতেই ধর্মনিরপেক্ষতার

নীতি গ্রহণ করে। সরকারের উদারনৈতিক ও নিরপেক্ষ মনোভাবের কারণে মিশনারি শিক্ষার গতিতে ভাটা পড়ে। জাতিচ্যুত ও উপজাতি এবং অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুও খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। মিশনারি শিক্ষা নারীদের শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়। পিছিয়ে থাকা আদিবাসীদের মধ্যেও শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সমাজে বিরাজিত বিভন্ন ধরনের কুসংস্কার দূর হয়। এককথায়, মিশনারি শিক্ষা-উদ্যোগের ফলে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলায় মিশনারি শিক্ষা-প্রচেষ্টার পরিমাণগত বিষয়টি অনির্ণেয় হলেও এর প্রকৃতি, প্রভাব ও গুণগত গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার সংগঠন থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সাজসরঞ্জামের ওপর মিশনারিদের চিরস্থায়ী প্রভাব রয়ে গেছে। মিশনারিরা শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যসূচিতে আধুনিকতার ভাবধারার বিকাশ ঘটান। লিখন, পঠন ও গণিতের সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি, বৃত্তিমূলক বিষয় পাঠ্যসূচির অর্ন্তগত করে মিশনারিরা শিক্ষার মানকে উন্নততর করেন। এসব নতুন নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে মিশনারিরাই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।[৪৫] বর্তমানে প্রচলিত বিদ্যালয়ের ধারণার সূত্রপাত হয় মিশনারিদের শিক্ষা-উদ্যোগ থেকেই। এ-সকল উদ্যোগের ফলে বাংলায় তথা ভারত উপমহাদেশে পশ্চিমা আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

তথ্যসূত্র

১. মহীবুল আজিজ, *সরকারি ও মিশনারি শিক্ষা*, ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১৮, পৃ. ৫৩
২. মোহাম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা*, গাজীপুর: স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৩০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৫. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও শ্রেয়া রায়, *বাংলার ইতিহাস ১৭৫৭-১৯০৫*, কলকাতা: মিত্রম্, ২০২২, পৃ. ১৩৯
৬. মোহাম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা*, গাজীপুর: এমএড প্রোগ্রাম, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৬
৭. Jayanta Mete, *History of Education of India* (BA (Education. III Semester), Tripura: Directorate of Distance Education, Tripura University, p. 2
৮. মোহাম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা*, গাজীপুর: এমএড প্রোগ্রাম, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৬
৯. রাহমান চৌধুরী, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শূদ্র সম্প্রদায়', https://www.protichinta.com/, ৮ এপ্রিল ২০১৭
১০. মোহাম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা*, গাজীপুর: এমএড প্রোগ্রাম, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৬-৭
১১. প্রব্রজ্যা: প্রব্রজ্যা বৌদ্ধধর্মীয় আচারবিশেষ। প্রবজ্যার সাধারণ অর্থ গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা, আর বিশেষ অর্থ গৃহত্যাগের পর মুণ্ডিতমস্তক হয়ে গৈরিক বসন 'চীবর' পরিধান করা এবং বৌদ্ধসংঘে প্রবেশপূর্বক শ্রমণ হওয়া। এ সময় তাকে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণরা একজন উপাধ্যায়ের অধীন শিক্ষানবিশ থাকেন এবং দশ শিক্ষাপদ পালন করে পবিত্র জীবনযাপন করেন। বিশ বছর বয়স্ক শ্রমণরা উপসম্পদা

লাভ করে পূর্ণাঙ্গ ভিক্ষুরূপে স্বীকৃত হন। [বিনয়েন্দ্র চৌধুরী], https://bn.banglapedia.org/index.php?title=প্রবজ্যা

১২. মোহাম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা*, গাজীপুর: এমএড প্রোগ্রাম, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৭
১৩. আবদুল আজিজ, *বাঙলা ও বাঙালি*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০২২, পৃ. ১৭৮
১৪. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, অনুবাদ: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামন ও ফজলে রাব্বি, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, পৃ. ২২৫
১৫. লাভলী আখতার ডলি ও ডি এম ফিরোজ শাহ (সম্পাদিত), *শিক্ষার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি*, গাজীপুর: স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১৬
১৬. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্*, অনুবাদ: আব্দুল মওদুদ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬, পৃ. ১৪১
১৭. সরদার আবদুর রহমান, *বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য-বসতি*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০২২, পৃ. ১৫
১৮. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ, কলকাতা: জনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭১, পৃ. ১২০
১৯. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *ফিরিঙ্গি বণিক*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৬২
২০. James Mill, *The History of British India,* forgottenbooks.com, pp. 3-4
২১. মুহম্মদ আব্দুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ. বি. এম. মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১, নবম সংস্করণ, পৃ. ৩৩৬
২২. জোয়াকিম জোসেফ এ. ক্যাম্পোস, *হিস্টরি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল*, অনুবাদ: শানজিদ অর্ণব, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৯৯
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
২৪. আবু হেনা মোঃ ফারুক (সম্পাদিত), *শিক্ষার ইতিহাস ১*, গাজীপুর: স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৯৬, পৃ. ৩০
২৫. সরদার আবদুর রহমান, *বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য-বসতি*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০২২, পৃ. ১৯
২৬. মোহাম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা*, গাজীপুর: স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৬
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
২৮. শোয়াইব জিবরান, 'উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষায় বৃটিশ উদ্যোগ: ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া', *বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী*, ডিসেম্বর ২০১২
২৯. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও শ্রেয়া রায়, *বাংলার ইতিহাস ১৭৫৭-১৯০৫*, কলকাতা: মিত্রম্, ২০২২, পৃ. ১৪৯
৩০. মোহাম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা*, গাজীপুর: স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৩২
৩১. Jayanta Mete, *History of Education of India* (BA (Education. III Semester), Ibid.
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৩. Mavra Farooq, "The Aims and Objectives of Missionary Education in the Colonial Era in India", *Pakistan Vision,* Vol. 15, No. 1, p. 138
৩৪. প্রাগুক্ত, Jayanta Mete, পৃ. ৪১
৩৫. দেবশ্রী ব্যানার্জি ও মধুমালা সেনগুপ্ত, *স্নাতকোত্তর পাঠক্রম*, কলকাতা: নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১৭
৩৬. মহীবুল আজিজ, *সরকারি ও মিশনারি শিক্ষা*, ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১৮, পৃ. ২০৪
৩৭. Jayanta Mete, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩৮. Firoj High Sarwar, "Christian Missionaries and Female Education in Bengal during East India Company's Rule: A Discourse between Christianised Colonial Domination versus Women Emancipation", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS)*, Vol. 4, Issue 1, Nov.-Dec. 2012, pp. 37-47
৩৯. Jayanta Mete, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৪১. অন্তর্জলী: মুমূর্ষুর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তার নিম্নাঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করে কৃত অনুষ্ঠানবিশেষ। এ আচার নাভিস্নান নামেও পরিচিত। মূলত মৃত্যুর আগে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে ফেলে রাখার নামই ছিল অন্তর্জলী। এ যাত্রা ছিল এক সামাজিক অভিশাপ। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন-এর মতো এটিও এক ভয়ংকর কুসংস্কার বা কুপ্রথা হিসেবে সমাজে প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী, এমনকি তার পরেও সমাজের কিছু গোঁড়া ধর্মান্ধ মানুষ বিশ্বাস করতেন অন্তর্জলী যাত্রার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুমূর্ষু ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গল সাধন এবং অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। হিন্দু সমাজে প্রচলিত এ কুসংস্কার নিয়ে কমলকুমার মজুমদার *অন্তর্জলী যাত্রা* নামে উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে গৌতম ঘোষ নির্মাণ করেন *অন্তর্জলী যাত্রা* চলচ্চিত্র।

৪২. Jayanta Mete, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪৩. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও শ্রেয়া রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৪৫. আবু হেনা মোঃ ফারুক (সম্পাদিত), *শিক্ষার ইতিহাস* ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

আগরতলা মামলা এবং জনমত গঠনে *আজাদ* পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন "ট্রাইবুনাল কক্ষে"

এ. এস. এম. মোহসীন*

সারসংক্ষেপে

১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন, সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায়। জাতীয় অধিকারের প্রশ্নসহ গণতন্ত্রের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি এ সময় উপস্থাপিত হয়েছিল যা এর আগে কখনই ঐক্যবদ্ধ এবং বিপুল সংগ্রামের দাবি হিসেবে আসেনি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে গণতন্ত্রকামী বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়। পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবির ভিত্তিতে ১৯৬০-এর দশকের প্রথম থেকে অধিকার বঞ্চিত বাঙালিদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে যে বহুমাত্রিক আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে সেটি এই মামলার সূত্র ধরেই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সামগ্রিক পরিপূর্ণতা অর্জন করে। সুতরাং আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে পূর্ণতা অর্জন করে সেটির রাজনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে আগরতলা মামলা সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহে ঢাকার অন্যতম দৈনিক পত্রিকা *আজাদ* কী ভূমিকা পালন করেছে তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে সচেষ্ট হওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে আগরতলা মামলা এবং মামলার সাওয়াল জবাব, আদালতের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র ভূমিকা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

চাবি শব্দ : আগরতলা মামলা, আজাদ, ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন, সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মাইলফলক। পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবির ভিত্তিতে যে বহুমাত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে সেটি এই মামলার সূত্র ধরেই ঘটে। ইতিহাসের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান [আলোচ্য প্রবন্ধের সময়সীমার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান "বঙ্গবন্ধু" উপাধি না পাওয়ায় তা ব্যবহৃত হয়নি] ও অন্যান্যের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপনের ভেতর

* সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), ডিপার্টমেন্ট অব বেসিক সায়েন্সেস এণ্ড হিউম্যানিটিজ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ঢাকা।

দিয়েই এই আন্দোলন ধীরে ধীরে একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হতে থাকে। এর সাথে ছাত্রদের এগারো দফা (১৯৬৯) মিলে বিক্ষোভ এক প্রবল রূপ ধারণ করে যার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে গণঅভ্যুত্থানের সময়ে। জাতীয় অধিকারের প্রশ্নসহ গণতন্ত্রের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি এ সময় গৃহীত হয়েছিল যা এর আগে কখনই ঐক্যবদ্ধ এবং বিপুল সংগ্রামের দাবি হিসেবে আসেনি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে গণতন্ত্রকামী বাঙালির বিজয় এবং একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পঞ্চাশের দশকে একদল মেধাবী, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তরুণ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। প্রতিশ্রুতিশীল এসব বিপ্লবী সাংবাদিকের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, ফয়েজ আহ্‌মদ, সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন অন্যতম। এদের অনেকেই ছিলেন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে সোচ্চার। কেউ কেউ ছিলেন মওলানা ভাসানী কিংবা শেখ মুজিবের কর্ম ও আদর্শে বিশ্বাসী যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আব্দুস সালাম, এবিএম মুসা, শামসুর রাহমান, কাজি মোহাম্মদ ইদ্রিস, ইরফান বারী, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, এম. আর. আখতার মুকুল, শিবসাধন চক্রবর্তী প্রমুখ। পাশাপাশি সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন একদল দেশপ্রেমিক সাংবাদিক যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬০ এর দশকে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারের চরিত্র উন্মোচন করা এবং স্বাধিকার বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। এঁদের মধ্যে প্রথমেই আসে সংবাদের আহমেদুল কবীর, ইত্তেফাকের তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), গণশক্তির বদরুদ্দীন উমর, হলিডের এনায়েত উল্লাহ খান প্রমুখের নাম। এঁদের সম্পৃক্ততায় আগরতলা মামলা ও এর ধারাবাহিকতায় আন্দোলন, সংগ্রাম ও অভ্যুত্থানে জনমত গঠনে বিভিন্ন দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকা স্বৈরাচার বিরোধী ভূমিকা পালন করে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯৬৮ সাল জুড়েই আগরতলা মামলার খবর সংবাদপত্রে প্রভাব বিস্তার করে। দৈনিক পত্রিকাগুলো এসকল বিপ্লবী ও নির্ভীক সাংবাদিকের সংবাদ প্রকাশে অনেকটাই স্বাধীনতা দিয়েছিল – সংবাদপত্রের মালিকপক্ষ যে মতাদর্শেরই হোক না কেন। *আজাদ*, *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় নিয়মিত মামলার বিবরণ ছাপা হয়। তবে মামলাটি বিচারাধীন থাকায় মামলার পক্ষে বা বিপক্ষে নিজস্ব মতামত প্রদান করে সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করা পত্রিকাগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে মামলার জবানবন্দি ও সাওয়াল-জওয়াব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে কৌশলে ভাষাভঙ্গি যোগে, আভাস ও ইঙ্গিতে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়। আগরতলা মামলা সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্যতম বিরোধী দলীয় দৈনিক পত্রিকা (কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থক) হিসেবে *আজাদ* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঐতিহাসিক গবেষণার উৎস হিসেবে সংবাদপত্র ব্যবহৃত হলেও সরাসরি সংবাদপত্রের অবস্থান পর্যালোচনা করে গবেষণা সম্পন্ন করার হার তুলনামূলকভাবে কম। আগরতলা মামলায় *আজাদ* পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে প্রধানতম গ্রন্থ ফয়েজ আহ্‌মদ রচিত *'আগরতলা মামলা,' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪)। ফয়েজ আহ্‌মদ নিজেই "ট্রাইবুনাল কক্ষে"

শীর্ষক প্রতিবেদনের লেখক হওয়ায় গ্রন্থটিতে প্রাপ্ত তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কিত অপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংবাদপত্রে প্রতিফলন* (ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০০৮)। এটি মূলত সংবাদপত্রে গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের সংকলন। এ সম্পর্কিত অপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মোঃ এমরান জাহান রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২)। ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে ১৯৪৭-৭১ সময়কালে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে *দৈনিক আজাদ*-এর ভূমিকা তুলে ধরেছেন। একইভাবে সুব্রত শংকর রচিত *বাংলাদেশের সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫) গ্রন্থে লেখক পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন যেখানে অন্যান্য সংবাদপত্রের পাশাপাশি গণঅভ্যুত্থানে দৈনিক আজাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম রচিত *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩) গ্রন্থে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক গণঅভ্যুত্থানে দৈনিক আজাদের ভূমিকা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের পাশাপাশি আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ মোহাম্মদ হাননান রচিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বঙ্গবন্ধু এবং দৈনিক আজাদ" (মোঃ শাহ আলমগীর সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম*, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট, ২০১৩)। প্রবন্ধটিতে আগরতলা মামলায় *আজাদ* পত্রিকার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফয়েজ আহ্মদ লিখিত বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশেষত "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র কথা উঠে এসেছে। তবে প্রবন্ধটিতে "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র সকল প্রতিবেদন বিবেচনায় নেয়া হয়নি। অর্থাৎ ফয়েজ আহ্মদের গ্রন্থ এবং মোহাম্মদ হাননানের প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য গ্রন্থগুলোতে আগরতলা মামলা সম্পর্কিত "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনের বিষয়টি তেমন জোরালোভাবে আসেনি।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ সে-সময় ঢাকাই ছিল পূর্ব বাংলার কেন্দ্র। ১৯৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে পূর্ণতা অর্জন করে সেটির রাজনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে আগরতলা মামলা সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহে ঢাকার অন্যতম দৈনিক পত্রিকা *আজাদ* কী ভূমিকা পালন করেছে তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে সচেষ্ট হওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে আগরতলা মামলা এবং মামলার সাওয়াল জবাব, আদালতের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র ভূমিকা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতি, যেখানে আলোচ্য দৈনিক পত্রিকা এবং অন্যান্য সরকারি দলিল-দস্তাবেজ প্রাথমিক এবং বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধটির

তিনটি অংশ। প্রথম অংশে আগরতলা মামলা সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আজাদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং তৃতীয় অংশে আগরতলা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জনমত গঠনে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ধারাবাহিক এবং সময়ানুক্রমিকভাবে করা হয়েছে।

১. ঘটনাপ্রবাহ

ছয় দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ বাঙালির সকল ন্যায্য দাবি বানচাল করার নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে তৎকালীন আইয়ুব খানের সরকার ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে ছয় দফার উপস্থাপক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবসহ ৩৪ জনের (পরবর্তী সময়ে ৩৫ জনে উন্নীত হয়) বিরুদ্ধে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" দায়ের করে তাদের গ্রেফতার করে। এই মামলার বিচার করার জন্য ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল স্পেশাল ট্রাইবুনাল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী পাকিস্তানের ভূতপূর্ব বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। অপর দু'জন বাঙালি সদস্য ছিলেন বিচারপতি মুজিবুর রহমান খান এবং বিচারপতি মুখসুমুল হাকিম। ট্রাইবুনালে অভিযুক্তদের পক্ষে মোট ২৬ জন আইনজীবী নিয়োজিত ছিলেন। শেখ মুজিবের প্রধান আইনজীবী ছিলেন আব্দুস সালাম খান। একটি বিশেষ সেশনের জন্য এসেছিলেন ব্রিটিশ আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস। আমিরুল ইসলাম ও মওদুদ আহমদ ছিলেন তার সহকারী। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঞ্জুর কাদের ছিলেন সরকারের প্রধান আইনজীবী। দ্বিতীয় প্রধান আইনজীবী ছিলেন টিএইচ খান।[১] মামলাটির প্রকৃত নাম ছিল– "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য"। ভারত বিরোধী সমর্থন অর্জনের অভিপ্রায় থেকে ভারতের আগরতলার নাম উল্লেখ করে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামে সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ দফতর থেকে প্রচারণা চালানো হয়। আইয়ুব সরকার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য পত্র-পত্রিকায় এটিকে ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে প্রচার করলেও মামলার অভিযুক্তরা এবং আরও অনেকে "ষড়যন্ত্র" শব্দটি মেনে নিতে রাজি নন। কারণ তারা মনে করেন দেশপ্রেমিক বাঙালিদের অসম্মান করার জন্য পাকিস্তানিরা "ষড়যন্ত্র" শব্দটি ব্যবহার করেছিল; যেমনভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা মুক্তিযোদ্ধাদের বলত দুষ্কৃতকারী।[২] ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদ থেকে কয়েক দফা ঘোষণায় জানানো হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করার একটি চেষ্টা তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় একটি সরকারি প্রেস নোট এবং অভিযুক্তদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রেস নোটে বলা হয়, "একটি রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদ্‌ঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।" ৬ জানুরারি প্রকাশিত প্রেস নোটে এক নম্বর অভিযুক্ত হিসেবে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম থাকলেও ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করা হয়। তবে ১৯৬৮ সালের আগে থেকেই তিনি পূর্ব

পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা আইনে আটক ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন থেকে ট্রাইবুনালে বিচার কাজ শুরু হয় এবং মামলার শুনানি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[৩]

এই মামলাটি বিশেষ ট্রাইবুনালে দেশদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের অভিযোগে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১-ক ধারা ও ১৩১ ধারা অনুযায়ী করা হয়। যেমন– ১৯ জুন ১৭ নম্বর অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগে বলা হয়:

> That he, between the beginning of the year, 1964 and the end of the year, 1967 conspired with his co-accused, appened herewith as well as certain citizens of India, to wage war against Pakistan, and to deprive Pakistan of its sovereignty over a part of its territory, namely, the Province of East Pakistan, by means of criminal force, in an armed revolt which was to be carried out mainly with the weapons, ammunition and funds provided by India through his Indian co-conspirators ... And thereby committed an offence punishable under section 121-A of the Pakistan Penal Code ... under section 131 of the Pakistan Penal Code[৪]

পূর্ব-পাকিস্তানের আন্দোলন ও সংগ্রামকে চিরতরে উৎখাত করার রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে এবং অভিযুক্তদের ফাঁসি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দু'শ জন সাক্ষীর তালিকা সরকার প্রথমদিনই মুদ্রিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কুর্মিটোলায় সেনানিবাসের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে অভিযুক্তদের রাখা হয় এবং এখানে একটি বিশেষ বাংলোর কক্ষে ট্রাইবুনালের বিচার কাজ শুরু হয়। মামলার ১১ জন রাজসাক্ষী কোনো না কোনো ভাবে বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত ছিলেন।[৫]

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুতে গঠিত হয় "কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"। আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই কমিটি এগারো দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি – ড্যাক) গঠিত হয়। ন্যাপ (ভাসানী) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি ড্যাক-এ যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ড্যাক ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর মূল বক্তব্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার।[৬] কিন্তু এতে ছয় দফার প্রতিফলন ঘটেনি। বিপরীতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা (১৯৬৯) দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিও অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭] ফলে এগারো দফা বাঙালি জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে আসে ছাত্র সমাজের হাতে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ জুড়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ হামলা চালাতে থাকে। ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ১১ দফা দাবির সমর্থনে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ২০ জানুয়ারি ধর্মঘট চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের মিছিল বের হয়। এই মিছিলে একজন পুলিশ অফিসারের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের ঢাকা হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান নিহত হন।[৮] এ সময় ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থনে পুলিশের গুলিতে প্রায় প্রতিদিনই ছাত্র ও সাধারণ

মানুষ নিহত হতে থাকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুদ্দোহা প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় পুলিশের বেয়নেট চার্জে ১৮ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। এর আগে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হককে আগরতলা মামলার আসামি করে বন্দি অবস্থায় কুর্মিটোলায় গুলি করে হত্যা করা হয়।[৯] এসব হত্যাকাণ্ড আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমানের বাসভবনে (বর্তমান বাংলা একাডেমির পাশে) ১৬ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভরত মিছিল থেকে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।[১০] আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার এক ঘোষণায় ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীকে বিনাশর্তে মুক্তি দেয় এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। সরকার ঘোষণা করে যে, "ফৌজদারি আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৮" নামক অধ্যাদেশটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে আগরতলা মামলাটি নিজ থেকেই বাতিল হয়ে যায়।[১১]

সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার ও বেসামরিক প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কয়েকজন অফিসের পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার এই প্রাথমিক সশস্ত্র আয়োজন সত্য ও বাস্তব ছিল। মূলত ষাটের দশকের শুরু থেকেই এই প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। মামলার ২৬ নং অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন এম. শওকত আলী এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, "বিপ্লবী সংস্থার সাথে আমার আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ তখন থেকেই শুরু। সম্ভবত সেটা ছিল ১৯৬৬ সালের জুন মাস। আনুষ্ঠানিক এবং বিশদ আলোচনা ছাড়াই আমরা একমত হয়েছিলাম যে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গঠিত 'বিপ্লবী সংস্থার' সদস্য।"[১২] শওকত আলী আরও উল্লেখ করেছেন যে, আর্মি মেডিকেল কোরের ক্যাপ্টেন ডা. খুরশীদ উদ্দীন আহমেদ (৩৪নং অভিযুক্ত) এবং নৌ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন (২নং অভিযুক্ত) ১৯৬১ সাল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করছিলেন এবং নৌবাহিনীতে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন।[১৩] দীর্ঘদিন ধরে বাঙালিদের প্রতি অর্থনৈতিক ও চাকরিগত বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ এসব অভিযুক্তদের নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করে এবং পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বিদ্রোহ আয়োজনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে আয়োজনকৃত বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন বিদ্রোহীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেন। তবে বিদ্রোহীদের ঢাকা অফিসের কোশাধ্যক্ষ, সাবেক করপোরাল আমির হোসেন মিয়া (রাষ্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষী) এবং অন্যান্য সূত্র থেকে পাকিস্তান সরকার চট্টগ্রামে আসন্ন বিদ্রোহের খবর জানতে পারে।[১৪] ১৯৬৬ সালের শুরুতে এই তথ্য আর্টিলারি কোরের বাঙালি কর্মকর্তা এবং পূর্ব পাকিস্তানে আইএসআই ডিটাচমেন্টের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামসুল আলম জানতে পারেন এবং তিনি তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। সন্দেহভাজনদের ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে গ্রেফতার করা শুরু হয়।[১৫] কিন্তু দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণে এসব দেশপ্রেমিককে উদ্ধারে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা এ মামলাটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করেন।

২. *আজাদ* : উৎপত্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর মওলানা আকরম খাঁর সার্বিক পরিচালনা ও সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা হিসেবে *আজাদ* আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা রাখা। পত্রিকাটি "আজাদের আত্মনিবেদন" শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয়তেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে, "... তিন কোটি মুছলমানের সত্যিকার সেবা ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে *দৈনিক আজাদ* হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম।"[১৬] *আজাদ* প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং এতে মুসলিম ভাবাদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পত্রিকাটিতে দীর্ঘ সময় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আবুল কালাম শামসুদ্দীন মন্তব্য করেন: "বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে বসে এ কথা না বললে সম্ভবত বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে *আজাদ* থেকেই বাংলার মুসলিম দৈনিকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।"[১৭] *আজাদ* ছাপা হতো ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে এবং মুদ্রিত হতো মোহাম্মদী প্রেস থেকে। কলকাতা থেকে *আজাদ*-এর সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। এতে উল্লেখ করা হয়, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় *আজাদ*-এর প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে এর একটি প্রভাব পাওয়া যায়। *আজাদ*-এর অনেক বক্তব্যই ছিল দ্বৈত নীতির প্রকাশক। পত্রিকাটি রবীন্দ্র সংগীত, মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের বিরোধিতা যেমন করেছে তেমনি বিপরীতে ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। ষাটের দশকে *আজাদের* রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এক সময় ছয় দফার বিরোধিতা করলেও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং আগরতলা মামলায় পত্রিকাটি ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যা আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ সময় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের মুখপত্র থেকে গণ-আন্দোলনের বাণী বাহকের ভূমিকায় *আজাদ*-এর রূপান্তর হয় এবং গভর্নর মনায়েম খাঁর ছবি পত্রিকাটিতে ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়। মওলানা আকরম খাঁর ছেলে কামরুল আনাম খাঁ *আজাদের* ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার পর এই চরিত্রগত পরিবর্তন হয়। *আজাদ* ১৯৬৮-৬৯ সালে ছিল রাজনৈতিকভাবে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থক যা আইয়ুব বিরোধী।[১৮]

৩. আগরতলা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জনমত গঠনে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন "ট্রাইবুনাল কক্ষে"

মামলা চলাকালীন প্রতিদিন পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে মামলার বিবরণ ছাপা হতো। আইয়ুব সরকারের ধারণা ছিল পত্রিকায় প্রতিদিন মামলার বিবরণ ছাপা হলে জনগণের মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হবে। কিন্তু মামলার প্রাত্যহিক কার্যবিবরণী দৈনিক পত্রিকায় যতই প্রকাশিত হতে থাকে, বাঙালি জনগণ ততই উপলব্ধি করতে পারে শাসক শ্রেণির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দিতে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ও বঞ্চনার বাস্তব দিকগুলো প্রকাশিত হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যই একে ষড়যন্ত্র মামলা বলে উল্লেখ করেন।[১৯] আইনজীবী, সাংবাদিক ও অন্য সবার প্রতি তাঁর পরামর্শ ছিল আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে আদালতের বাইরে রাজনৈতিকভাবে দেশে-বিদেশে লড়াই করে অভিযুক্তদের প্রতি জনমত বৃদ্ধি করার। তিনি আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে একটি গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।[২০] রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে *আজাদ* শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগকে সমর্থন না করলেও মামলার বিবরণী ছাপার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।[২১]

আজাদ প্রতিদিন "ট্রাইবুনাল কক্ষে" নামে আগরতলা মামলার বিবরণ নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদনও প্রকাশ করে। "ট্রাইবুনাল কক্ষে" ছিল প্রশ্ন-উত্তর ধরনের জেরার ভিত্তিতে মূল প্রতিবেদনের বাইরে সেই সময়কার প্রধান প্রতিবেদক ফয়েজ আহ্মদের নিজস্ব নোট নিয়ে লিখিত একটি বিশেষ প্রতিবেদন। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের ২০ জুন যা ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতিদিন মূল প্রতিবেদন লেখা শেষ করে রাত বারোটার পর ফয়েজ আহ্মদ এই নিজস্ব প্রতিবেদন লিখতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "মামলার শুনানির প্রতিদিনের প্রতিবেদন ছাড়াও প্রত্যহ আমি তখন "ট্রাইবুনাল কক্ষে" নামক একটি ক্ষুদ্র বিশেষ রিপোর্ট লিখতাম – যা ছিল মূল মামলার বাইরে সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং দুঃখ-বেদনা-আনন্দ, সাহসিকতা স্বাভাবিক মানবধর্মী বিষয়ক।"[২২] সরকার বিরোধী পত্রিকা হিসেবে *আজাদ* ট্রাইবুনালের প্রতিবেদন হুবহু ছাপতে থাকে এবং এটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। আগরতলা মামলাকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপন করে জনমত গঠনের কৌশল সম্পর্কে ফয়েজ আহ্মদ বলেন, "সরকারি ভাষ্য শোনার পর এবং কোনো সূত্র থেকে কয়েকজন রিপোর্টার উৎসাহী হয়ে জানতে পারেন যে, এই বিদ্রোহের উদ্যোগটি সত্য। তখন থেকে আমরা কিছু সংখ্যক রিপোর্টার মামলার জেরার অংশ, যাতে মামলাটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় রিপোর্ট উপস্থাপন করতে থাকি। জেনে শুনেও এখানে আমরা সত্যকে মিথ্যা বলেছি।"[২৩]

সাংবাদিক ফয়েজ আহ্মদ স্পেশাল ট্রাইবুনালের শুনানি সম্পর্কিত সংবাদগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংগ্রহ করেন এবং *আজাদ* সেগুলো গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশ করে। ১৪ পৃষ্ঠার *আজাদ*-এ প্রথম পাতায় মামলা সংক্রান্ত খবরাদি এবং ভেতরের ১২ পাতায় মামলার প্রতিদিনের কার্যক্রমের পূর্ণ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। ১৯৬৮ সালের জুন-ডিসেম্বর মাসের *আজাদ* বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৬৮ সালের জুন মাসে *আজাদ*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় আগরতলা মামলা সংক্রান্ত ১২টি, জুলাই মাসে ৬টি, আগস্ট মাসে ৩৪টি এবং নভেম্বর মাসে ৪৭টি শিরোনাম ছাপা হয়। ডিসেম্বর মাসে মামলা সংক্রান্ত খবর হ্রাস পায় কারণ মামলার শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর বাইরে ১৯৬৮ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত *আজাদ* আগরতলা মামলা সংক্রান্ত ছোট-বড় প্রায় ১৭০টি সংবাদ প্রকাশ করে।[২৪]

কিন্তু *আজাদ*-এর প্রতিনিধি হিসেবে ফয়েজ আহ্মদকে গ্রহণ করতে পাকিস্তান সরকারের আপত্তি ছিল। তবে পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল আনাম খাঁন সরকারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, ফয়েজ আহ্মদ ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগ করা হবে না এবং তাঁকে গ্রহণ করা না হলে *আজাদ* এই মামলার রিপোর্ট করা থেকে বিরত থাকবে। আজাদের মালিকপক্ষ সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও *আজাদ*-এর এই দৃঢ় ভূমিকার জন্য ফয়েজ আহ্মদের পক্ষে রিপোর্ট করা সহজ হয়ে ওঠে। রিপোর্টাররা সকাল ন'টার আগেই যার যার প্রবেশ কার্ড দেখিয়ে নির্ধারিত স্থান গ্রহণ করতেন। ফয়েজ আহ্মদের বিবরণে জানা যায় যে, বিচার কক্ষটি ছিল ভীতিকর ও ক্ষুদ্র। বিচারকদের ডান পাশে ছিল নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিকের জন্য চেয়ার ও টেবিল। সাংবাদিকদের ডান পাশে অভিযুক্তদের জন্য স্থান করা হয়েছিল।[২৫]

ফয়েজ আহ্মদের এই প্রতিবেদন বাঙালি জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা পায়, ফলে *আজাদ*-এর বিক্রি ও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একটি পর্যায়ে আজাদের নিজস্ব মেশিনে পাঠকের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হওয়ায় *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার অফসেট মেশিনে সেলোফিন থেকে প্লেট বানিয়ে অতিরিক্ত সংখ্যা মুদ্রিত হতো।[২৬] তবে মামলার আরও অনেক ঘটনা ছিল যা রিপোর্ট করা হয়নি। কিন্তু এরপরও যা প্রকাশ করা হয়েছিল তা গণজাগরণের জন্য যথেষ্ট ছিল।

৩.১ বিশেষ শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ

আজাদ তাদের প্রতিবেদনে বিশেষ শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করে, ফলে জনগণের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একটি বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আনার পর অনেক সময় বিচারকদের উপস্থিত হতে কিছুটা বিলম্ব হতো। সেসময় কিংবা বিচারক চলে যাওয়ার পর কক্ষে যা কিছু হতো ফয়েজ আহ্মদ একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তা বিশেষ শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে "ট্রাইবুনাল কক্ষে" উপস্থাপন করেছেন। "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের ২০ জুন। প্রতিবেদনটির প্রথম প্যারাতেই উল্লেখ করা হয় যে, মামলা আরম্ভের প্রথম দিন এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি মুজিবুর রহমান প্রথম আগমন করেন এবং এডভোকেট, দর্শক, আত্মীয়-স্বজন ও সাংবাদিকদের অভিবাদন জানান। এছাড়া আরও উল্লেখ করা হয় যে তিনি অভিযুক্তদের প্রথম সারিতে প্রথম আসনে বসেন এবং তারপর অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আসেন। এভাবে কৌশলে দেখানো হয় যে, শেখ মুজিব নিরাপরাধ বলেই সাহসিকতার সাথে অভিবাদন জানান এবং তিনি বাঙালির নেতা বলেই প্রথম আসনে বসেন এবং বাকিরা তাঁকে অনুসরণ করেন।[২৭]

১৯৬৮ সালের ২০ জুন *আজাদ* উল্লেখ করে যে, অধিবেশন সমাপ্তির পর শেখ মুজিবের সাথে আলাপ করার জন্য কাঠগড়ায় দর্শকদের ব্যাপক ভিড় জমে। প্রায় প্রতিদিনের প্রতিবেদনেই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো শেখ মুজিবের সাথে "পুলিশ কর্ডনের ভেতরেই" হাতমেলানো বা কথা বলতে জনগণের "আগ্রহী" বা "উদগ্রীব" হয়ে ওঠার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে পরোক্ষভাবে

বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে আগরতলা মামলা দায়ের করা হলেও মামলার অভিযুক্তদের প্রতি বাঙালি জনমনে কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়নি। এছাড়া "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র বিভিন্ন প্রতিবেদনে পরোক্ষভাবে দেখানো হয়েছে যে, অভিযুক্তদের আত্মীয়-স্বজন সবাই বিখ্যাত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ২০ জুনের প্রতিবেদনে বলা হয়– "অভিযুক্ত শামসুর রহমান সিএসপি ট্রাইবুনাল কক্ষস্থ 'আসামীর কাঠগড়ায়' উপস্থিত হইয়াই তাঁহার বড় ভাই প্রাদেশিক সাবেক উজিরে আলা আতাউর রহমান খানকে দেখিতে পান। তাঁহার স্ত্রী প্রখ্যাত গায়িকা আফাসারী খানম।" – এই উক্তি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৮] এসব বার্তা যখন সাধারণ বাঙালি জনগণের কাছে পৌঁছে তখন তারাও ধীরে ধীরে সচেতন ও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে, প্রস্তুতি নেয় রাজপথে নেমে আসার।

৩.২ শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা

আজাদ মূলত শেখ মুজিবুর রহমানকে মূল উপজীব্য করে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। প্রায় প্রতিটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে, পূর্ব দিনের ন্যায় শেখ মুজিবুর রহমান সহাস্যবদনে বা "পূর্বের ন্যায় প্রশান্ত দৃষ্টি লইয়া" কক্ষে প্রবেশ করেন। যেমন ১৯৬৮ সালের ২০, ২১, ২২ জুন এবং ৩০ ও ৩১ জুলাই শেখ মুজিব যে সহাস্যবদনে প্রবেশ করেন সে-তথ্য উল্লেখ করা হয়। এছাড়া মামলা পরিচালনা করার জন্য ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী টমাস উইলিয়ামসের আগমনের কথা জানানো হয় যা মামলাটির খ্যাতিকে প্রমাণ করেছে। ৩০, ৩১ জুলাই এবং ৮, ৯ আগস্ট টমাস উইলিয়ামসের কথা উল্লেখ করা হয়।[২৯]

আজাদ বিভিন্নভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করে। মুজিবের যে বিশাল জনপ্রিয়তা রয়েছে "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র বিভিন্ন প্রতিবেদনে সেই সত্যটিকেই সামনে নিয়ে আসা হয়। সাধারণ জনগণের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রবীণ নেতৃবৃন্দও শেখ মুজিবের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন সেটি "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ২ আগস্ট পত্রিকাটি প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ সম্পর্কে আবেগপ্রবণ ভাষায় প্রতিবেদন প্রকাশ করে মন্তব্য করে, "শেখ মুজিবকে বহুদিন পর একবার দেখিবার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার একজন বৃদ্ধ রাজনীতিক ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ রাজনীতিক আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ দর্শকদের গ্যালারীতে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। ...এই বৃদ্ধের চোখে অশ্রু ছিল। ...দূর হইতে মুজিবকে একনজর দেখিতেই শুধু তিনি শহরের দূর প্রান্তে আসিয়াছিলেন।"[৩০]

শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ১৯৬৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদন, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে পঙ্গু আবদুল মতিন পাটোয়ারি চাঁদপুর থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে এসেছিলেন। এই প্রতিবেদনে আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের "কথিত" বলেও উল্লেখ করা হয়।[৩১] প্রতিবেদক ফয়েজ আহ্মদ বিভিন্ন প্রতিবেদনে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন যে, কেবল শেখ মুজিবকে দেখার জন্যই অনেকে আদালত কক্ষে উপস্থিত হন। যেমন ২১ অক্টোবর মুজিব তাঁর অসুস্থ মাতাকে দেখতে গোপালগঞ্জে

থাকায় আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। বিষয়টি উল্লেখ করে ২২ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, তিনি কাঠগড়ায় উপস্থিত না থাকায় যে সমস্ত দর্শক দূর হতে তাঁকে দেখতে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তারা স্বাভাবিকভাবেই নিরাশ হয়েছেন।[৩২] একইভাবে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার বিষয়টি উপজীব্য করে ২৩ অক্টোবর উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয় দফাপন্থি) গত শনিবার কাউন্সিল অধিবেশনে পুনরায় মুজিবকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করায় দর্শকগণ তাঁকে দেখতে আরও উৎসাহী ছিলেন।[৩৩] এই প্রতিবেদন দিয়ে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পাকিস্তানি সামরিক চক্র শেখ মুজিবকে মামলা দিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা করলেও বাঙালি জনগণের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া।

শেখ মুজিব একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে সকলের সাথেই সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে উপযাচক হয়ে কথা বলছেন – এসব তথ্য প্রকাশ করে "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র কিছু কিছু প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর আলাপী চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৩ আগস্ট তারিখে পত্রিকাটি এ বিষয়ে মন্তব্য করে: "বিশেষ করিয়া তিনি যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন, পরিচিত ব্যক্তিদের ভুলিতে পারেন না– এই কথাই তাঁহার আলাপী চরিত্র হইতে প্রকাশ পায়।"[৩৪]

পাকিস্তান সরকার মামলা করলেও সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তিবর্গ স্বপ্রণোদিত হয়ে শেখ মুজিবের সাথে সৌজন্যমূলক আলোচনা করছেন এমন তথ্য উপস্থাপন করে ফয়েজ আহ্মদ সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের অভ্যন্তরে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। যেমন ১৯৬৮ সালের ৬ আগস্টের প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এন. এ. রেজভী দ্রুত এগিয়ে এসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কাঠগড়ার বাইরে থেকে কোলাকুলি করেন বলে উল্লেখ করা হয়।[৩৫]

শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তুলে ধরতে গিয়ে বিভিন্ন সময় ফয়েজ আহ্মদ পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের উদাহরণ তুলে ধরেন। ৩০ আগস্টের প্রতিবেদনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয় যে তিনি বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের সাথে ২৯ আগস্ট আদালতের প্রথমার্ধের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। রাজনীতিতে শেখ মুজিবের বিরোধী কিন্তু তাঁর কাঁধে হাত রেখে কথা বলছেন- এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের বিরোধিতা এবং শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন– এ সত্যটিকেই উপস্থাপন করা হয়।[৩৬]

এছাড়া *আজাদ*-এর প্রতিবেদনে জেনারেল আইয়ুব খানের পাঠানো প্রধান কৌঁসুলি সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎ এবং সৌজন্য সমীহের বিষয়টি উঠে আসে। এমনকি ১৯৬৮ সালের ৩০ নভেম্বরের *আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, পুলিশের ঝগড়া বিবাদও শেখ মুজিবুর রহমান থামাতে এগিয়ে আসছেন যেটি তার বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় মামলার আসামি কিন্তু সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও তাঁর সাথে দেখা করতে আসছেন– বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই আইয়ুব খানের

বিরুদ্ধে এবং আগরতলা মামলার আসামিদের পক্ষে বাঙালি জনমতকে সংগঠিত করতে ভূমিকা রাখে।

৩.৩ মামলার অসারতা

আজাদ এমনভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে যাতে করে সাধারণ জনগণের কাছে এই মামলার অসারতা প্রমাণিত হয় এবং তারা উপলব্ধি করে কেবল হয়রানি করতেই এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। *আজাদ* বিভিন্ন প্রতিবেদনে পরোক্ষভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যে শেখ মুজিবসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ৬, ৯, ১৪ ও ১৮ আগস্ট উল্লেখ করা হয় যে, দর্শক গ্যালারিতে উপস্থিতির হার অনেক কম। অর্থাৎ আগরতলা মামলা নিয়ে জনগণের আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে।

প্রতিবেদক ফয়েজ আহ্‌মদ দর্শকের পাশাপাশি কৌসুলিদের সংখ্যা কমে আসার বিষয়টি ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৫ অক্টোবর এবং ১২ নভেম্বর তারিখে উল্লেখ করেন। মামলার গুরুত্বহীনতার বিষয়টি উল্লেখ করে ৫ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, হাইকোর্ট বা জেলা কোর্টে নিয়মিত থাকা বিভিন্ন আইনজীবী যারা রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান গং মামলা পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নন, তারা অনেকেই বিশেষ ট্রাইবুনালে যাওয়া বন্ধ করেছেন।[৩৭] একইভাবে ১২ নভেম্বর উল্লেখ করা হয় যে, বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের "আজকাল" অধিবেশন কক্ষে সাধারণত উপস্থিত থাকেন না।[৩৮] মামলার অসারতা প্রমাণে এমনভাবে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় যেন প্রতীয়মান হয় যে এটির বিচার প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিচারকগণ নিজেরাই গুরুত্ব প্রদান করছেন না। ফলে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। ট্রাইবুনাল কক্ষের ২৪ ও ২৬ অক্টোবর এবং ২৭ নভেম্বরের প্রতিবেদনে এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। ২৭ নভেম্বর উল্লেখ করা হয়: "গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ট্রাইবুনালে যখন গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্য চলিতে থাকে, সেই সময় রুচিসম্মত হাস্যাত্মক উক্তি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষণকালের জন্য হইলেও লঘু পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।"[৩৯]

"ট্রাইবুনাল কক্ষে"র ১৯৬৮ সালের ৩ আগস্টের প্রতিবেদনে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে অভিযুক্ত করলেও সরকারি আইনজীবীগণ তাঁদের নিরাপরাধ মানুষের মতোই সম্মান প্রদর্শন করছেন। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় যে, শেখ মুজিবকে "এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি" হিসেবে চিহ্নিত করে যে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঞ্জুর কাদের সেই মামলায় রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত প্রধান কৌসুলি। তিনি অভিযুক্তদের আবক্ষ রেলিং-এর দিকে সহাস্য বদনে উপস্থিত হন এবং অভিযুক্ত শেখ মুজিবকে শেখ সাহেব বলে সম্বোধন করেন।[৪০]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এন. এ. রেজভীকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন ১৯৬৮ সালের ৬ আগস্ট *আজাদ* প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, "... প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবের সাথে তিনি কাঠগড়ার বাহির হইতে কোলাকুলি করেন সহাস্যবদনে। তাহারা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। জনাব এন. এ. রেজভী কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। ...

ট্রাইবুনালের অধিবেশন সমাপ্তির পর জনাব রেজভী পুনরায় শেখ মুজিবের নিকট আসেন।"[৪১] একইভাবে ১৩ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌসুলি মঞ্জুর কাদের বঙ্গবন্ধুকে দেখে তার কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। বিরোধী পক্ষ নিজ থেকেই শেখ মুজিবের সাথে কথা বলছে এর মাধ্যমে পত্রিকাটি দেখানোর চেষ্টা করে যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা অসার এবং সরকারের কর্তাব্যক্তিরা নিজেরাই তাদের আচার আচরণে অভিযুক্তদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করছেন না।

৩.৪ মানবিক আবেদন

মহিলা দর্শনার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা, আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনে বেশ কয়েকবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে পাঠকদের মনে একধরনের মানবিক আবেদন তৈরির প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আদালত কক্ষে মহিলা দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করা, অভিযুক্ত আত্মীয়দের সাথে দেখা করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবের কথা যেমন *আজাদ*-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে তেমনি এসব মহিলা দর্শনার্থী যারা অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কারও না কারও মা, বোন, স্ত্রী– মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আদালত কক্ষে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন সেই মানবিক দিকটিও স্পষ্ট হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ২২ জুন প্রতিবেদনে বলা হয়, "অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন হুদার বৃদ্ধ মাতা গতকাল পুত্রের বিচার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সাথে পুত্রবধূ ছিলেন। পুত্রকে স্পর্শ করিয়া নির্বাক মাতা মন্থর গতিতে ট্রাইব্যুনাল কক্ষ ত্যাগ করেন।"[৪২]

১৯৬৮ সালের ৮ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়: "ট্রাইবুনাল কক্ষে সে সময় এক তরুণী বধূ একা বসিয়া ছিলেন। তাঁহার এই আসনটি যেন নির্দিষ্ট। বেঞ্চের এই স্থানটি প্রত্যহ যেন তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করে। ক্যাপ্টেন স্বামী যেন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রথমেই দেখিতে পান ইহাই যেন তাঁহার কামনা। স্বামী অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি।"[৪৩] একইভাবে ১৭ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষে অভিযুক্তদের আত্মীয়গণ আরও কয়েক মিনিট বেশি দেখা এবং কথা বলার আশায় কক্ষে অপেক্ষা করেন।[৪৪] ৪ সেপ্টেম্বর বৈরী সাক্ষী কামালউদ্দীনের স্ত্রী এবং অপর অভিযুক্ত সুলতানউদ্দীনের ছোট বোন হাসিনা কামালের প্রতিদিন দর্শক গ্যালারিতে অপেক্ষা করা সম্পর্কিত একটি মানবিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[৪৫] ১৯৬৮ সালের ২০, ২১ জুন; ৩১ জুলাই; ১, ৭, ৮, ১৭, ২৩, ২৮ আগস্ট; ৪, ১০, ১১, ১৩ সেপ্টেম্বর; ১৫, ১৬, ২৬ অক্টোবর এবং ১৪, ১৬, ২১, ২২ এবং ২৩ নভেম্বর "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে মানবিক আবেদনের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের তরুণী স্ত্রীদের স্বামীর সাথে কথা বলতে দেওয়ার একটি আদেশ ২৭ আগস্ট বিচারপতি এস. এ. রহমান প্রদান করেন। কিন্তু ৯ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় মহিলা দর্শকদের যাওয়া নিষিদ্ধ হলে বিষয়টি ১০, ১১ ও ১৩ সেপ্টেম্বর "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনে উঠে আসে। এমনকী অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যে টাকা বেতন বাবদ পেয়ে থাকেন তা সম্পূর্ণ বেতন না হওয়ায় সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে যাওয়ার বিষয়টি *আজাদ* উল্লেখ করে।[৪৬] একটি পর্যায়ে প্রতি সোমবার

অভিযুক্ত স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হলেও মহিলা দর্শনার্থীদের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায়। তবে পূর্বের মতো কয়েকজন মহিলা নিয়মিত দর্শক গ্যালারিতে উপস্থিত থাকতেন। এই বিষয়ে ১৬ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা হয়: "প্রথম দিন হইতেই কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রীকে প্রতিদিনই দর্শক গ্যালারীতে বসিয়া থাকতে দেখা যায়। তাঁহারা নিয়মিত প্রতিদিন সকালে কক্ষে প্রবেশ করেন এবং অধিবেশন শেষ হইলে অন্যদের সাথে নীরবে চলিয়া যান। প্রতিদিন অধিবেশনে উপস্থিত থাকা যেন তাঁহারা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।"[৪৭] মুজিব-পরিবারের পরিস্থিতিও মানবিকভাবে *আজাদ* উপস্থাপন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৪ সেপ্টেম্বর উল্লেখ করা হয় যে পুত্র কামাল দূর হইতে পিতাকে দেখার জন্য প্রত্যহই কক্ষে উপস্থিত থাকেন কিন্তু তার পক্ষে পিতার সাথে সাক্ষাৎ করা অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না।[৪৮]

একইভাবে ১৯ নভেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, শেখ মুজিবের প্রথমা কন্যা শেখ হাসিনার বিবাহ নিরানন্দময় পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সরাসরি এটি উল্লেখ করা সম্ভব ছিল না যে শেখ মুজিবকে বিয়েতে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ কারণে পরোক্ষভাবে ফয়েজ আহ্মদ উল্লেখ করেন, "উক্ত বিবাহে শেখ ছাহেবকে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দানের প্রার্থনা করিয়া প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হইয়াছিল। শেখ ছাহেব উক্ত বিবাহে উপস্থিত ছিলেন না।"[৪৯]

১৯৬৮ সালের ২১ নভেম্বর *আজাদ* আরেকটি সংবেদনশীল প্রতিবেদন প্রকাশ করে। মামলার দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে সাড়ে আট বছরের ওয়ালীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়: "কাঠগড়ার রেলিংয়ের উচ্চতা ওয়ালীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।[৫০] এরই ধারাবাহিকতায় ২২ নভেম্বর অভিযুক্ত সিনিয়র সিএসপি শামসুর রহমানের সাথে তার দশ বছরের মেয়ে শাহিন রহমানের সাক্ষাতের বিষয়টি উঠে আসে। পরদিন ২৩ নভেম্বর পুনরায় মোয়াজ্জেম হোসেনের পাঁচ বছরের মেয়ে সিপার উল্লেখ করা হয়।

এভাবে মানবিক আবেদনের দিকটি "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনে গুরুত্ব পায় এবং জনমত গঠনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

৩.৫ বাঙালি বিদ্বেষী চরিত্র উন্মোচন

আজাদ বিভিন্নভাবে তৎকালীন শাসকশ্রেণির বাঙালি বিদ্বেষী চরিত্র উন্মোচনের চেষ্টা করে। আদালত কক্ষে সাদা পোশাকে কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করতেন। অনেকক্ষেত্রেই তারা বিবাদী পক্ষের অনেক তরুণ আইনজীবীর ওকালতনামা ও অন্যান্য পরিচয়পত্র পরীক্ষার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতেন যা ছিল অনভিপ্রেত। কারণ আদালত কক্ষে প্রবেশের সময়ই প্রত্যেককে কার্ড দেওয়া হতো।[৫১] বিষয়টি সরাসরি প্রতিবাদ করে কোনো প্রতিবেদন উপস্থাপন করা সম্ভব ছিলো না। ১৯৬৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর তরুণ আইনজীবী এবং সাদা পোশাকের ব্যক্তির মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সম্পূর্ণ চিত্রই কৌশলে ৩ সেপ্টেম্বরের "ট্রাইবুনাল কক্ষে" কলামে উপস্থাপন করে বলা হয়: "জনৈক সিনিয়র কৌসুলি এডভোকেটদের ওকালতনামা ও পরিচয় সম্পর্কে যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবাদ করিয়া

বলেন যে, ইহা অত্যন্ত গর্হিত ও দুঃখজনক। অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় জানার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছেন। ইহাদের কোন অধিকার নাই কক্ষের মধ্যে কাহারো উপস্থিতির অধিকার চ্যালেঞ্জ করা। কক্ষে প্রবেশের সময়ই প্রত্যকের কার্ড দেখা হয়।"[৫২] একইভাবে আগরতলা মামলায় যেসব ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের পরিবারবর্গও বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন যা ছিলো প্রকৃত অর্থেই অমানবিক। এই অমানবিক দিকটি অনেকটা সাহসিকতার সাথেই "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে ফয়েজ আহ্মদ উপস্থাপন করেন শাসক শ্রেণির বাঙালি বিদ্বেষী চরিত্র উন্মোচনের মাধ্যমে।

আজাদ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি বিদ্বেষী ভূমিকার জন্যই আগরতলা মামলা দায়ের করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ১৯ অক্টোবর *আজাদ* তাদের প্রতিবেদনে বলে, "ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস. এ. রহমান গতকাল তিনটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেন।" এর মাধ্যমে পত্রিকাটি বাঙালিদের জানানোর চেষ্টা করে যে, অবাঙালি শাসকবর্গ বাঙালি নেতৃবৃন্দের বিচার করছে। ২২ নভেম্বরের প্রতিবেদনে অভিযুক্ত শামসুর রহমানের স্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী আফসারী খানমের প্রতি কর্তৃপক্ষের অবহেলার কথা উল্লেখ করে বলা হয়: "এক সময় যাঁহার গান শোনার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের ভিড় জমিত, সুধী সমাজের ঘরে ঘরে যাঁহার কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও বাজিত, সেই আফসারী খানমকে এখন আর বেতারের অনুষ্ঠানে গান গাহিবার জন্য আহ্বান জানানো হয় না। তাঁহাকে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। আজ আকস্মিকভাবে তাঁহার প্রতি কেন অবহেলা, তাহা কেবল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেই বোধগম্য।"[৫৩] আইয়ুব আমলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যে নিবর্তনমূলক আচরণ প্রদর্শন করেছে একজন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীর প্রতি অবহেলা প্রকৃতপক্ষে সেই আচরণেরই ধারাবাহিকতা–এই নিষ্ঠুর বাস্তব উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটে ২২ নভেম্বরের প্রতিবেদনে।

আগরতলা মামলায় অবাঙালি নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বাঙালিদের বিচার করা হচ্ছে এমন ইঙ্গিত প্রদান করে ১৯ নভেম্বর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে বিচারপতি এম. আর. খান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে পিন্ডিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করায় ট্রাইবুনালে উপস্থিত হতে পারেননি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েও তিনি আগরতলা মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রাইবুনালে কাজ করবেন।[৫৪] এভাবে "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনের মাধ্যমে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি বিরোধী চরিত্র পরোক্ষভাবে স্পষ্ট করা হয়।

৩.৬ শাসক শ্রেণির বৈষম্যমূলক আচরণ

ফয়েজ আহ্মদ এমনভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন যেন শাসক শ্রেণির বৈষম্যমূলক আচরণের দিকটি সাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৬৮ সালের ২৩ আগস্ট তারিখের

প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয় যে, বৃহৎ শিল্পপতি পরিবারের অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ পরিবারের মহিলা দর্শকদের বসার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেটিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীগণ বৈষম্যমূলক আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৫৫] অভিযুক্তদের আইনি সহায়তা লাভে বাধাপ্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করা হয় ১৭ অক্টোবরের প্রতিবেদনে। আদালতের কার্যক্রম শুরুর দশ মিনিট আগে আসলে আইনজীবীদের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হতো। কিন্তু ১৬ অক্টোবর থেকে অভিযুক্তদের বিচারপতিদের এজলাসে ওঠার সময় একইসাথে আনা হতে থাকে। "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনে কোনো মন্তব্য না করেই উল্লেখ করা হয় যে, অভিযুক্তদের কিছুটা আগেই কক্ষে নিয়ে আসার বিবাদী পক্ষের আবেদনে বিচারপতি এস. এ. রহমান সম্মত হননি।[৫৬]

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রক্ষার কথা বলে শাসক শ্রেণি নিজেরাই ধর্মীয় প্রতীকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন এবং অভিযুক্তরা সরকারের বৈরী আচরণের শিকার এই বার্তা পরোক্ষভাবে "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। সরকারি সাক্ষী নোয়াব আলী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় স্টুয়ার্ড মুজিব ও লিডিং সিম্যান সুলতান উদ্দীনকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হলে সরকার পক্ষের আইনজীবী টি. এইচ. খান অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় দাঁড় করান এবং মুখে দাড়ি হওয়ায় তাদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন, যা ১৪ নভেম্বরের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। ফয়েজ আহ্মদ আরও মন্তব্য করেন যে ইতিপূর্বে সাধারণত কোনো সাক্ষী কাউকে শনাক্ত করতে না পারলে সরকার পক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বলেননি এবং এই প্রথম সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দাড়ি হয়েছে বলে সরকারি কৌসুলি মন্তব্য করেন।[৫৭] ২৮ নভেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ২৭ নভেম্বর এগারোজন সাক্ষীর মধ্যে দশজনই ছিলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য। এভাবে পরোক্ষভাবে জনগণকে এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যে, বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে আইয়ুব খান তার সামরিক যন্ত্রকে ব্যবহার করছেন।[৫৮]

এভাবে *আজাদ* "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করে যে সংশ্লিষ্ট সরকারের ব্যক্তিবর্গই বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। এভাবে আগরতলা মামলায় প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি শাসকসশ্রেণির বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে এই সত্যটিই ফয়েজ আহ্মদের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়।

৩.৭ অবাঞ্ছিত পরিবেশ

ফয়েজ আহ্মদ ট্রাইবুনাল কক্ষের পরিস্থিতি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেখানে আদালত কক্ষের যথাযথ পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। ১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই উল্লেখ করা হয় যে, বিরতির সময় বিচারপতিগণ আসন ত্যাগ করার মুহূর্তেই কক্ষের মধ্যে প্রতিবাদ ও গোলযোগের কণ্ঠ শোনা যায়। এমনকী সরকার পক্ষের আইনজীবীগণ নিজেরাই নিরাপত্তার কথা বলছেন সেটিও উল্লেখ করা হয়।[৫৯] এভাবে আদালত কক্ষের যথাযথ পরিবেশ না-থাকার বিষয়টি কৌশলে উল্লেখ করা

হয়। ১৯৬৮ সালের ২৩ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রায়ই আদালত কক্ষে গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যায় কিংবা বিড়ালের ডাক, হাসাহাসি, চাপা গলায় আলাপের কণ্ঠ ভেসে আসে। অর্থাৎ সরকার যেটিকে বিদ্রোহ হিসেবে পরিচিতি দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ করে প্রচারণা চালিয়েছে সেটির বিচার প্রকৃতপক্ষে এমন এক পরিবেশে হয়েছিল যা আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোটেই উপযুক্ত ছিল না।[৬০] এছাড়া আদালতের কার্যক্রম চলার সময় প্রায়ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হতো যেটি ১৬ এবং ২৩ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রায় প্রতিদিনের প্রতিবেদনে গুঞ্জনের কারণে প্রশ্নোত্তর সঠিকভাবে শুনতে না-পারার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

২৩ আগস্টের প্রতিবেদনে নারী দর্শনার্থীদের জন্য বিশ্রামাগার ও নাস্তা করার ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষের অবাঞ্ছিত পরিবেশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ২০ নভেম্বর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের শব্দের কারণে সাক্ষী কৌসুলিদের প্রশ্নোত্তর অধিকাংশ সময় শুনতে না-পারার অসুবিধা উল্লেখ করা হয়। ফয়েজ আহ্‌মদ তৎকালীন সরকারের দুর্নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেন, "বহু অর্থ ব্যয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।"[৬১]

৩.৮ আওয়ামী লীগের গুরুত্ব উপস্থাপন

"ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের গুরুত্ব উপস্থাপনের প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। যেমন– ১৯৬৮ সালের ২৭ আগস্টের প্রতিবেদনে আগরতলা মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দই জড়িত ছিলেন এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। মামলার অভিযুক্ত, রাজসাক্ষী, বিবাদী পক্ষের আইনজীবী– এরা অধিকাংশই ছিলেন আওয়ামী লীগের কোনো না কোনো পর্যায়ের নেতা। দর্শক সারিতে প্রতিদিন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন এবং বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যেসব নেতা আওয়ামী লীগকে এগিয়ে নিয়েছিলেন তাদের একটি পরিচিতি এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়।[৬২] রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যে একটি সক্রিয় সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে ২৩ আগস্টের প্রতিবেদনে সেটিই স্পষ্ট হয়। ১২ নভেম্বরের প্রতিবেদনেও আওয়ামী লীগকে গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

৩.৯ অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে সম্মানজনকভাবে উপস্থাপন

আগরতলা মামলার শুরু থেকেই অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য ও অর্থবোধক ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা মামলার প্রতিবেদনের সাথে সংযোজন করতে গিয়ে আইনের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মামলা চলাকালে প্রতিবেদক ফয়েজ আহ্‌মদের সাথে সরকারের প্রধান আইনজীবী মঞ্জুর কাদেরের তিনবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি একদিকে যেমন আজাদে প্রকাশিত "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রশংশা করেন তেমনি এটি যে আইনের দৃষ্টিতে ঝুঁকিপূর্ণ সে-কথাও উল্লেখ করেন। আদালতের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র অনুবাদ মঞ্জুর কাদেরের দফতরে পৌঁছাতে হতো।[৬৩] ১৯৬৮ সালের ২৯ আগস্ট "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রকাশ করা হয় মঞ্জুর

কাদেরের কর্মকাণ্ড প্রশংসাসূচকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে। তিনি সরকারি আইনজীবী হওয়ার পরও বিবাদী পক্ষের আইনজীবী সালাম খানকে বিভিন্ন সময় সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন, নিয়মিতভাবে ট্রাইবুনালের অধিবেশন শুরুর আগেই নির্ধারিত আসনে উপস্থিত থাকেন এবং উভয়পক্ষের আইনজীবীদের মাঝে উত্তপ্ত পরিস্থিতি আন্তরিকতার সাথে সমাধান করেন যা ছিল পরোক্ষভাবে মামলার অভিযুক্তদের প্রতি সরকারি প্রধান আইনজীবীর সম্মানজনক আচরণেরই প্রকাশ।[৬৪] সরকারি আইনজীবী হওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে মঞ্জুর কাদের তথা বাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী সম্মানের সাথে কথা বলছেন এবং তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন– এমন তথ্য প্রকাশ করে *আজাদ* প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যে সমাজে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত সেই সত্যটিকেই স্পষ্ট করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১১ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মঞ্জুর কাদের অভিযুক্ত লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম কেমন আছেন এবং তাঁর কোনো অসুবিধা হয় কিনা সে-বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন।[৬৫] এছাড়া মঞ্জুর কাদের অভিযুক্তদের সাথে তাদের আত্মীয় ও স্ত্রীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে এবং অভিযুক্তদের পূর্ণ বেতন-ভাতা প্রদানে সরকারের অনুমতি অর্জনে ভূমিকা রাখেন যা ১০ ও ১৩ সেপ্টেম্বরের "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে উঠে আসে।[৬৬] অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ সকলেই যে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবাই নিরাপরাধ এবং সরকারের পক্ষ থেকে সম্মানজনক আচরণ প্রত্যাশিত, "ট্রাইবুনাল কক্ষে" এসব তথ্য এবং মঞ্জুর কাদেরের উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে সেই সত্যটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

৩.১০ আদালত ও বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রহণযোগ্যতা

আজাদ "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আদালত ও বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রহণযোগ্যতার দিকটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ কেউ ভালো অবস্থায় নেই সেটি ইঙ্গিত করে ১৯৬৮ সালের ১ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে বৈরী সাক্ষী কামালউদ্দীন "বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে" কৌঁসুলিদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।[৬৭] ৩ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বিভিন্ন অভিযোগ ও অসুবিধার কথা ট্রাইবুনালকে জানান। বাঙালিদের শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সামরিক আদালতে দ্রুত মামলা পরিচালিত হচ্ছে এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করা হয় বিভিন্ন প্রতিবেদনে। ১৯৬৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদনে ফয়েজ আহ্‌মদ উল্লেখ করেন যে, শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইবুনালে এক মাসের অধিক সময় টানা মামলার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৬৮] ফয়েজ আহ্‌মদ সাধারণ বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ধারণা প্রদানের চেষ্টা করেন যে, অভিযুক্তদের বিচার প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-নির্ধারিত এবং এ কারণে বিচারকগণ বিচার প্রক্রিয়ায় তেমন গুরুত্ব প্রদান না করে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক মন্তব্য করছেন। তবে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে সমালোচনামূলকভাবে উপস্থাপন না-করে আদালতের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় প্রদানকৃত মন্তব্য হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৮ সালের ২৪ অক্টোবর বিচারপতির মন্তব্য সম্পর্কে বলা হয়: "ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি রহমান মাঝে

মাঝে দুই একটি অতীব উজ্জ্বল মন্তব্য করেন।"[৬৯] একই ধরনের প্রয়াস ২৬ অক্টোবরের প্রতিবেদনেও দেখা যায়। তবে জনগণের কাছে আদালতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নেতিবাচক বার্তাটি ঠিকই পৌঁছে যায়।

১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১১১ জন সরকারি সাক্ষীকে ট্রাইবুনালের সামনে উপস্থিত করা হয়। সাক্ষীর আধিক্য থাকলেও সকলের জবানবন্দি নেয়া হতো না। "ট্রাইবুনাল কক্ষে" প্রতিবেদনে এত বিপুল সংখ্যক সাক্ষীর উপস্থিতি অনেকটাই লোক দেখানো সে-সত্যকেই ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ১৫ নভেম্বর এ-বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ ধরনের একজন সাক্ষী ঢাকার ক্যাসেরিনা হোটেলের আবদুল করীমের কথা উল্লেখ করা হয়। ফয়েজ আহ্মদ তাঁকে "পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বয়" হিসেবে উল্লেখ করে প্রবীণ কৌসুলি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "এই সাক্ষী ইতিমধ্যেই শপথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার পর তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি এখন শপথ লইয়াই বাড়ি চলিলেন। সারাদিনই তাঁহাকে সত্য কথা বলিতে হইবে।"[৭০] এভাবে সাক্ষীর আধিক্য থাকার পরও জবানবন্দি গ্রহণ না করার তথ্য উপস্থাপন করে আদালত ও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রহণযোগ্যতাকেই স্পষ্ট করা হয়েছে।

১৯ নভেম্বরের প্রতিবেদনে বিচারপতি এম. আর খানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার এবং আগরতলা মামলা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাঁর ট্রাইবুনালে কাজ না-করার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। এভাবে আগরতলা মামলার মাঝপথে একজন বিচারপতিকে পদোন্নতি প্রদান ও মামলাটি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ট্রাইবুনালের বিচারপতি হিসেবে কাজ করতে দেওয়ার সুযোগ প্রদান করে সরকার প্রকৃতপক্ষে মামলার ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করছে– এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত প্রদান করা হয় "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র বিভিন্ন প্রতিবেদনে। বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রহণযোগ্যতাকে তুলে ধরতে গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের আইনি সহায়তা না-পাওয়ার বিষয়টি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেন ফয়েজ আহ্মদ। যেমন, ১৭ অক্টোবরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সাধারণভাবে বিচারপতিগণ এজলাসে আগমনের পাঁচ মিনিট আগে অভিযুক্তদের কক্ষে আনা হলেও ১৬ অক্টোবর সকল অভিযুক্ত ও বিচারপতি একসাথে কক্ষে প্রবেশ করেন। এ অবস্থায় বিবাদী পক্ষের আইনজীবী আদালতের কাছে অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিট আগে অভিযুক্তদের কক্ষে আনার ব্যবস্থা করতে আবেদন করেন যেন আইনজীবীরা তাদের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু বিচারপতি রহমান এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। এভাবে বাঙালিরা আইনি সহায়তা পেতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে এমন ধারণা কৌশলে প্রদান করা হয়।

৩.১১ মামলার গুরুত্ব হ্রাস

নভেম্বর মাসে রাজপথের আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সমান্তরালে আদালতের কার্যক্রমের গুরুত্বও কমে আসতে থাকে, যেটি "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। ১২ নভেম্বর উল্লেখ করা হয় যে, বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের অধিবেশন কক্ষে সাধারণত উপস্থিত থাকেন না এবং সম্ভবত মামলা সংক্রান্ত অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। মঞ্জুর

কাদেরের অনুপস্থিতির বিষয়টি ১৯৬৮ সালের ২৯ নভেম্বর এবং ৩ ডিসেম্বরও "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বিবাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী সালাম খানও অন্য কাজে ব্যস্ততার জন্য আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকেন না বলে ফয়েজ আহ্মদ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। এছাড়া বিচারপতি এম. আর. খানের অনুপস্থিতির বিষয়টি ১৯৬৮ সালের ২০, ২১, ২৩ ও ২৬ নভেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ২২ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি মোট ৫ দিন অনুপস্থিত ছিলেন এমন তথ্য প্রকাশ করে *আজাদ* পরোক্ষভাবে দেখাতে চেয়েছে যে তিনি নিজেও আগ্রহী নন আগরতলা মামলার বিচারের সাথে যুক্ত থাকতে। আদালতের কার্যক্রমের গুরুত্ব হ্রাসের বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে ফয়েজ আহমদ বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেখান যে, আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়ার শুরুতে দর্শক ও আইনজীবীদের অস্বাভাবিক ভিড় থাকায় সকলের স্থান সংকুলান হতো না। কিন্তু আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আদালত কক্ষের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৮ আগস্ট "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে আইনজীবীদের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে আসায় যে-কোনো সাংবাদিক অনেক দেরিতে উপস্থিত হলেও আসন পেতে তেমন সমস্যা হয় না। পাশাপাশি তিনি মন্তব্য করেন, "বিদেশী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মরত পাকিস্তানী সাংবাদিকরাও এখন আর উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নহেন।"[৭১] একইভাবে বিশেষ ট্রাইবুনালে দর্শকদের সংখ্যা ক্রমে কমে আসার বিষয়টি ১৯৬৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। আদালতের কার্যক্রমের গুরুত্ব কমে আসার বিষয়টি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করা হয় যেসব এডভোকেট হাইকোর্ট বা জেলা কোর্টে নিয়মিত ব্যবসায় করতেন এবং রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান গং মামলা পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নন তারা অনেকেই বিশেষ ট্রাইবুনালে যাওয়া বন্ধ করেছেন। "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদন থেকে আদালতের কার্যক্রমের গুরুত্ব কমে আসার বিষয়টি এভাবে পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৩.১২ বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের নিষ্ঠা

সরকারি পক্ষের সাক্ষীদের আধিক্য থাকলেও কিংবা আদালত কক্ষে গুরুগম্ভীর পরিবেশের পরিবর্তে বিচারকদের মাধ্যমে হাস্যরসাত্মক বক্তব্য উপস্থাপিত হলেও বিবাদী পক্ষের আইনজীবীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছিলেন– সেটি প্রমাণের প্রচেষ্টা "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়। ১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই উল্লেখ করা হয় যে, এক নম্বর রাজসাক্ষী লে. মোজাম্মেল হোসেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় থাকা অবস্থায় বিবাদী পক্ষের আইনজীবীগণ উচ্চস্বরে সরকার পক্ষের একজন আইনজীবীকে বিচারকের অনুপস্থিতিতে রাজসাক্ষীর সাথে কথা বলতে বাধা প্রদান করেন। বিবাদী পক্ষের আইনজীবীগণ সাক্ষীদের জেরা করার সময় যে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করছেন সেটি ১৯৬৮ সালের ১৬ নভেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭২]

বাদী ও বিবাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী বিভিন্ন সময় অনুপস্থিত থাকলেও ৫ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে ফয়েজ আহ্মদ উল্লেখ করেন যে, বিবাদী পক্ষের দু'জন আইনজীবী ব্যারিস্টার কে. জেড. আলম এবং জনাব আব্দুল্লাহ নিয়মিতভাবে ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত থাকেন। তবে ফয়েজ আহ্মদ তাঁর প্রতিবেদনে বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিও উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১০ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে বিচারপতিগণ আগমনের পরও বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি সালাম খান উপস্থিত না-হওয়ায় আদালতের কার্যক্রম শুরু হতে দেরি হয়।[৭৩] ২২ অক্টোবরের প্রতিবেদনে দেখানো হয় যে বিবাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী সালাম খান অনুপস্থিত থাকায় অন্যান্য আইনজীবী কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক্ষত্রে এডভোকেট জহিরুদ্দিনকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনে তাঁর ইতস্তত বোধ করা কিংবা সাক্ষ্য গ্রহণে অন্যমনস্ক থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। পাকিস্তান সরকার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনলেও উভয়পক্ষের আইনজীবীগণ অধিকাংশ সময় পরস্পরের প্রতি সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করেছেন। যেমন– ১৪ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে বিবাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী জনাব সালাম খান বাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশংসা করেছেন।[৭৪]

৩.১৩ সরকারের প্রস্তুতিহীনতা

আগরতলা মামলা পরিচালনার বিষয়ে সরকারের যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না, যা "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ১৩ নভেম্বরের "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে প্রধান বিচারপতি সরাসরি বাংলায় জবানবন্দি গ্রহণের পরিবর্তে কোর্টের সুবিধার জন্য দোভাষীর মাধ্যমে ইংরেজিতে সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণের পক্ষে মত দিলেও সরকারিভাবে কোনো দোভাষীর ব্যবস্থা ছিল না। ২৬ নভেম্বরের প্রতিবেদনে ফয়েজ আহ্মদ উল্লেখ করেন যে, প্রতিদিন দশ থেকে বারোজন সাক্ষী যে সাক্ষ্যদান করবে সে-সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না-থাকায় প্রতিদিন প্রায় এক ডজন সাক্ষীকে ট্রাইবুনালের সামনে উপস্থিত রাখার জন্য বাদী পক্ষকে ব্যস্ত থাকতে হয়। একইভাবে ২৮ নভেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ২৭ নভেম্বর বাদী অর্থাৎ সরকার পক্ষ তালিকাভুক্ত সাক্ষীর অভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। মামলা প্রমাণ করার লক্ষ্যে সরকারি আইনজীবীদের অনুসৃত পদ্ধতির সমালোচনা করেন বিচারক যা "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। যেমন– ২৮ নভেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির "সার্ভিস বুক" শনাক্তের লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হতে বেশ কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীকে (সামরিক) আদালতে উপস্থাপন করা হলে আদালত "সার্ভিস বুক" শনাক্তের জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি পূর্ববর্তী নোটিশ ছাড়া আকস্মিকভাবে সাক্ষী উপস্থাপনেরও সমালোচনা করা হয়। এভাবে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে যখন আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাজপথের আন্দোলন ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সে-সময় "ট্রাইবুনাল

কক্ষে"র প্রতিবেদনে আদালতে সরকারি আইনজীবীদের দুর্বলতা প্রকাশ করে জনমতকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়।

সাক্ষীদের উপস্থিতির বিষয়ে আদালতের অসন্তোষের বিষয়টি ২৯ নভেম্বরের প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়। ২৮ নভেম্বর দু'শত তিন নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য দানের পর তালিকাভুক্ত সাক্ষীর অভাবে নির্ধারিত সময়ের আগেই আদালত মুলতুবি হয়ে যায়। বিরতির পরও বাদী পক্ষ সাক্ষীদের তালিকা উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় এবং প্রধান আইনজীবী মঞ্জুর কাদের অনুপস্থিত থাকায় আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ফয়েজ আহ্মদ, "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র ২৯ নভেম্বরের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে উল্লেখ করেন: "অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বে পুনরায় সাক্ষীদের তালিকা সম্পর্কে কোর্ট জানিতে চাহেন এবং বিচারপতি রহমান এক পর্যায়ে মন্তব্য করিয়ে বলেন যে, ইহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক ব্যবস্থা।"[৭৫] এভাবে *আজাদ* সরকারের প্রস্তুতিহীনতা তথা বাদী পক্ষের দুর্বলতা উপস্থাপনের আলোকে জনমতকে সংগঠিত করায় ভূমিকা রাখে।

৩.১৪ মামলা পরিচালনায় সরকারি আইনজীবীদের দুর্বলতা

বাদী পক্ষ দু'শর বেশি সাক্ষী উপস্থিত করলেও অনেকক্ষেত্রে সাক্ষীদের বক্তব্য ছিল বিভ্রান্তিকর। এই মামলার এগারো জন রাজসাক্ষী কোনো না কোনোভাবে বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত থাকলেও সাক্ষী কামালউদ্দীন, এ. বি. এম. ইউসুফ সহ তিনজন বৈরী সাক্ষীর ভূমিকা অবলম্বন করেন যা "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র ১ ও ১৩ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও সাধারণ সাক্ষীগণ অনেকেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন। সাক্ষীর পাশাপাশি সরকারি আইনজীবী টি. এইচ. খান অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিবের দাড়ি থাকা নিয়ে সঠিক তথ্য প্রদানে অসমর্থ হন বলে ফয়েজ আহ্মদ ৪ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। এভাবে মামলা পরিচালনায় সরকারের আইনজীবী ও সাক্ষীদের দুর্বলতা যতই প্রকাশিত হতে থাকে আগরতলা মামলাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণ করে জনমতকে সংগঠিত করার কাজটি ততই এগিয়ে যায়। একইভাবে একটি দলিল খুঁজে না-পাওয়ায় ৫ ডিসেম্বর আদালতের কার্যক্রম প্রায় ১২ মিনিট বন্ধ থাকার কথা ফয়েজ আহ্মদ তাঁর ৬ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যা মামলা পরিচালনায় সরকার পক্ষের দুর্বলতাকেই তুলে ধরে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে রেজিস্ট্রার জনাব মির্যা প্রায় ২৫ দিন অনুপস্থিত থাকার পর কোর্টে আসেন এবং রেজিস্ট্রারের দলিল রাখার বাক্স থেকে ঐ দলিলটি খুঁজে পাওয়া যায়।

৩.১৫ জনমত উপস্থাপন

"ট্রাইবুনাল কক্ষে"-র প্রতিবেদনে ফয়েজ আহ্মদ পরোক্ষভাবে তৎকালীন স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গণতন্ত্রহীনতার কথা উপস্থাপনে সচেষ্ট হন। এ ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি কোনো মন্তব্য না করে সাধারণ জনগণের কথোপকথন উপস্থাপন করেন। যেমন– রমজান মাসে চায়ের দোকান খোলা রাখা সম্পর্কিত একজন দোকানি ও সাধারণ ব্যক্তির কথোপকথন ৪ ডিসেম্বর তুলে ধরে

উল্লেখ করা হয়: "বৃদ্ধ দোকানীকে জনৈক দর্শক জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কোন খদ্দের নাই বলিলেই চলে। তবুও কেন দোকান খুলিয়া রাখিতেছেন?' দোকানী: চা-খানা খুলিবার অনুমতি পাইয়াছি– এখনও বন্ধ করিবার নির্দেশ পাই নাই।"[৭৬] এই প্রতিবেদনে প্রকৃতপক্ষে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনে মানুষের মৌলিক অধিকারের অনুপস্থিতিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রে বাঙালিরা যে উপেক্ষিত সেই সত্যকেই পরোক্ষভাবে "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে ফয়েজ আহ্মদ উপস্থাপন করেন। মহিলা দর্শকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলতে গিয়ে জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তির তরুণী স্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে ২৩ আগস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়: "আমরা উপেক্ষার মধ্যে চারি ঘন্টা কাটাই।"[৭৭] ফয়েজ আহ্মদ ছয়দফার পক্ষে জনমত গঠনেও "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করেন। ৩০ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, দুই বছর পূর্বে ছয়দফা সংক্রান্ত রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে শেখ মুজিব ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাবেক মন্ত্রী ভুট্টো পরস্পরের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও ট্রাইবুনাল কক্ষে তারা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেন।[৭৮] প্রতিবেদনটি এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যেন সাধারণ পাঠকদের মনে হয় যে ছয়দফার প্রতি সমর্থন প্রদান করেই ভুট্টো মুজিবের সাথে কথা বলেছেন। বাঙালি জনমতের অবস্থান যে ছয়দফার পক্ষে সেটির পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় ফয়েজ আহ্মদের প্রতিবেদনে। দর্শকদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসার কথা আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই উল্লেখ করা হলেও ২৩ অক্টোবরের প্রতিবেদনে দর্শক আধিক্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (ছয়দফা পন্থি) কাউন্সিল অধিবেশনে মুজিব সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় দর্শকরা তাঁকে দেখতে আগ্রহী ছিলেন।[৭৯]

ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মামলার সাওয়াল জবাব শুরু হবে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের প্রচন্ড গণঅভ্যুত্থানের সময় সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইবুনালের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলাই প্রত্যাহার করা হয়।[৮০]

৪. মূল্যায়ন

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে অনুঘটক হিসেবে আগরতলা মামলার গুরুত্ব অপরিসীম। আগরতলা মামলা দায়ের এবং আসামীদের গ্রেফতার ও বিচারের শুনানি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা অর্জন করে। ১৯৬৮ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ১৯৬৯ সালের শুরুতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে এবং এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই আইয়ুব খানের পতন ঘটে। এই অভ্যুত্থান শেখ মুজিবসহ অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের পথ সুগম করেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের বিজয়ে এই গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পাকিস্তান আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি প্রথম সারির দৈনিক ছিল *আজাদ*। পত্রিকাটির প্রধান প্রতিবেদক ফয়েজ আহ্মদ আদালত কক্ষে উপস্থিত থেকে বিচার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করেন। এক্ষেত্রে তিনি পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল আনাম খাঁনের পূর্ণ সমর্থন অর্জন করেন। রাজনৈতিক ধারায় কৌশলগত কারণে ইতিহাস অনেকভাবেই প্রবাহিত হয়। আগরতলা মামলা সংক্রান্ত ঘটনাবলি সত্য হওয়ার পরও মামলাটির বিশ্বাসযোগ্যতা যেন জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফয়েজ আহ্মদ "ট্রাইবুনাল কক্ষে" শিরোনামে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তিনি আইনি বাধা পেরিয়ে এমন ভাষায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন যেন পাকিস্তানি শাসকদের আগরতলা মামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের কাছে পরোক্ষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফয়েজ আহ্মদের "ট্রাইবুনাল কক্ষে" এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে ভাষাগত দক্ষতা এবং আইনের সাধারণ জ্ঞান থাকলে ঐতিহাসিক মামলাগুলোর অনেক দিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আগরতলা মামলা সংশ্লিষ্ট নিয়মিত প্রতিবেদনের পাশাপাশি "ট্রাইবুনাল কক্ষে" শিরোনামে প্রধান প্রতিবেদকের বিশেষ প্রতিবেদন জনগণের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এর প্রমাণ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

আগরতলা মামলা চলাকালীন শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের অনেক ঘটনা "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব ঘটনার ঐতিহাসিক উপাদান কেবল ফয়েজ আহ্মদের প্রতিবেদনেই পাওয়া যায়। "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এখানে সচেতনভাবে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে মামলাটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণিত না হয় এবং পাঠকদের কাছে মামলার অভিযুক্তদের প্রতি একধরনের মানবিক আবেদন তৈরি হয়। এমনভাবে প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে যেন সাধারণ জনগণের কাছে মামলার অসারতা প্রমাণিত হয় এবং তারা উপলব্ধি করে যে কেবলমাত্র হয়রানি করতেই এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। ফয়েজ আহ্মদ মূলত শেখ মুজিবুর রহমানকে মূল উপজীব্য করে সংবাদ প্রকাশ করেন। বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তা রয়েছে "ট্রাইবুনাল কক্ষে"র প্রতিবেদনে সেই সত্যটিকেই সামনে নিয়ে আসা হয়। একইসাথে এসব প্রতিবেদনে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের গুরুত্ব উপস্থাপনের প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। *আজাদ* এসব প্রতিবেদনে বিভিন্নভাবে তৎকালীন শাসক শ্রেণির বাঙালি বিদ্বেষী চরিত্র উন্মোচনের চেষ্টা করে পরোক্ষভাবে দেখায় যে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি বিদ্বেষী ভূমিকার জন্যই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এভাবে ফয়েজ আহ্মদের প্রতিবেদনে শাসকশ্রেণির বৈষম্যমূলক আচরণের দিকটি সাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপরীতে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ সকলেই যে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবাই নিরাপরাধ এবং সরকারের পক্ষ থেকে সম্মানজনক আচরণ প্রত্যাশিত "ট্রাইবুনাল কক্ষে" এসব সত্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সামগ্রিক পরিস্থিতি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন আদালত কক্ষের যথাযথ পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। অর্থাৎ সরকার যেটিকে বিদ্রোহ হিসেবে

পরিচিতি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রচারণা চালিয়েছে সেটির বিচার প্রকৃতপক্ষে এমন এক পরিবেশে হয়েছিল যা আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এক্ষেত্রে মামলার গুরুত্ব হ্রাস, সরকারের প্রস্তুতিহীনতা এবং মামলা পরিচালনায় সরকারি আইনজীবীদের দুর্বলতা ইত্যাদি বিষয় পরোক্ষভাবে তুলে ধরা হয়। ফয়েজ আহ্মদ পরোক্ষভাবে তৎকালীন স্বৈরতান্ত্রিক পরিস্থিতি ও গণতন্ত্রহীনতার কথা অর্থাৎ জনমত উপস্থাপনে সচেষ্ট হন।

"ট্রাইবুনাল কক্ষে"র বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আগরতলা মামলার সাথে অনেক ঐতিহাসিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য ও অর্থবোধক ঘটনা যুক্ত ছিল এবং এসব ঘটনার বিবরণ উপস্থাপনে আইনের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকা ছিল। দক্ষতার সাথে লেখার কারণে তৎকালীন সরকারের কঠোর দৃষ্টির মধ্যেও আইন অমান্যকারী বাক্য ও শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মামলার মূল প্রতিবেদনের বাইরে সংশ্লিষ্ট সাধারণ ঘটনাবলি "ট্রাইবুনাল কক্ষে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে মামলার আরও অনেক বিষয় ছিল যা রিপোর্টে উপস্থাপিত হয়নি। কিন্তু এরপরও যা প্রকাশিত হয়েছে তা গণজাগরণের জন্য ছিল যথেষ্ট। সুতরাং আগরতলা মামলা সংক্রান্ত ঘটনা, প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ও তথ্য উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট সময়ে বাঙালি জনমত গঠনে আজাদের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ

১. ফয়েজ আহ্মদ, *'আগরতলা মামলা,' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ১৩
২. কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ১৬
৩. আগরতলা মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৭১)*, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে হাক্কানী পাবলিশার্স, পৃ. ৩০৭-৬৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
৫. ফয়েজ আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২; আদালত কক্ষের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন কর্নেল শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-২৯
৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪-৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯
৮. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৪
৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩, ৩৬
১০. ফয়েজ আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮
১২. কর্নেল শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
১৪. ফয়েজ আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪
১৫. কর্নেল শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১১৮
১৬. "আজাদের আত্মনিবেদন", সম্পাদকীয়, *আজাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬

১৭. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩, পৃ. ২৮-২৯

১৮. জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ১৭২।

১৯. আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পূর্ণ জবানবন্দির জন্য দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৬৮

২০. কর্নেল শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

২১. *আজাদ* পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলী উল্লেখ করেন: "'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' মামলার শুনানি প্রায় সব সংবাদপত্রে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলা পত্রিকা দৈনিক *আজাদ*-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। নীতিগতভাবে দৈনিক *আজাদ* আওয়ামী লীগ বিরোধী হলেও খ্যাতিমান সাংবাদিক ফয়েজ আহ্মদ স্পেশাল ট্রাইবুনালের শুনানি-সম্পর্কিত সংবাদগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রহ করেন এবং *দৈনিক আজাদ* সেগুলো যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশ করে। সাংবাদিক ফয়েজ আহ্মদের মামলার বিচারকার্য সম্পর্কিত খবরগুলো 'ট্রাইবুনাল কক্ষে' শিরোনামে *দৈনিক আজাদ*- এ প্রকাশিত হতো।" দেখুন কর্নেল শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

২২. ফয়েজ আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২৪. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ৫৫

২৫. ফয়েজ আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২৭. ফয়েজ আহ্মদ, "ট্রাইবুনাল কক্ষে", *আজাদ*, ২০ জুন ১৯৬৮। অভিবাদন জানানোর বিষয়টি ২১ ও ২২ জুনের প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়।

২৮. ফয়েজ আহ্মদ, "ট্রাইবুনাল কক্ষে", *আজাদ*, ২০ জুন ১৯৬৮

২৯. যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা আইনজীবী এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার দলের সদস্য টমাস উইলিয়ামকে শেখ মুজিবের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে বাংলাদেশে প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে তিনি সব অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করবেন। দেখুন কর্নেল শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-৩২

৩০. ফয়েজ আহ্মদ, "ট্রাইবুনাল কক্ষে", *আজাদ*, ২ আগস্ট ১৯৬৮

৩১. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

৩২. প্রাগুক্ত, আজাদ, ২২ অক্টোবর ১৯৬৮

৩৩. প্রাগুক্ত, আজাদ, ২৩ অক্টোবর ১৯৬৮

৩৪. প্রাগুক্ত, আজাদ, ১৩ আগস্ট ১৯৬৮

৩৫. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৬ আগস্ট ১৯৬৮

৩৬. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৩০ আগস্ট ১৯৬৮

৩৭. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

৩৮. প্রাগুক্ত, আজাদ, ১২ নভেম্বর ১৯৬৮

৩৯. প্রাগুক্ত, আজাদ, ২৭ নভেম্বর ১৯৬৮

৪০. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৩ আগস্ট ১৯৬৮

৪১. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৬ আগস্ট ১৯৬৮

৪২. প্রাগুক্ত, আজাদ, ২২ জুন ১৯৬৮

৪৩. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৮ আগস্ট ১৯৬৮

৪৪. প্রাগুক্ত, আজাদ, ১৭ আগস্ট ১৯৬৮

৪৫. প্রাগুক্ত, আজাদ, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

৪৬. প্রাগুক্ত, আজাদ, ১০, ১১, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

৪৭. প্রাগুক্ত, আজাদ, ১৬ অক্টোবর ১৯৬৮
৪৮. প্রাগুক্ত, আজাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
৪৯. প্রাগুক্ত, আজাদ, ১৯ নভেম্বর ১৯৬৮
৫০. প্রাগুক্ত, আজাদ, ২১ নভেম্বর ১৯৬৮
৫১. ফয়েজ আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৫২. ফয়েজ আহ্মদ, "ট্রাইবুনাল কক্ষে", *আজাদ*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
৫৩. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২২ নভেম্বর ১৯৬৮
৫৪. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১৯ নভেম্বর ১৯৬৮
৫৫. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৩ আগস্ট ১৯৬৮
৫৬. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১৭ অক্টোবর ১৯৬৮
৫৭. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১৪ নভেম্বর ১৯৬৮
৫৮. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৮ নভেম্বর ১৯৬৮
৫৯. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ৩০ জুলাই ১৯৬৮
৬০. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৩ আগস্ট ১৯৬৮
৬১. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২০ নভেম্বর ১৯৬৮
৬২. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৭ আগস্ট ১৯৬৮
৬৩. ফয়েজ আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৭
৬৪. ফয়েজ আহ্মদ, "ট্রাইবুনাল কক্ষে", *আজাদ*, ২৯ আগস্ট ১৯৬৮
৬৫. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
৬৬. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১০, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
৬৭. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১ আগস্ট ১৯৬৮
৬৮. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
৬৯. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৬৮
৭০. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৬৮
৭১. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১৮ আগস্ট ১৯৬৮
৭২. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮
৭৩. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১০ আগস্ট ১৯৬৮
৭৪. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ১৪ আগস্ট ১৯৬৮
৭৫. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৬৮
৭৬. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৮
৭৭. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৩ আগস্ট ১৯৬৮
৭৮. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ৩০ আগস্ট ১৯৬৮
৭৯. প্রাগুক্ত, *আজাদ*, ২৩ অক্টোবর ১৯৬৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

শাম্ব : পুরাণ ও ইতিবৃত্তের মেলবন্ধন

হোসনে আরা*

সারসংক্ষেপ

কালকূট ছদ্মনামে সমরেশ বসু যে উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন তার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন পৌরাণিক আখ্যান এবং চরিত্র। কমিউনিস্ট পার্টির একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতায় তিনি পুরাণের আধারে বর্তমান থেকে উত্তরণের, উজ্জীবনের চেষ্টা করেছেন। মানুষই ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার মৌল অন্বিষ্ট। সেই মানুষের মনে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যোগাতে পুরাণকে ইতিহাস হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস দেখা যায় তাঁর *শাম্ব* উপন্যাসে। নানান যুক্তি এবং প্রমাণ দিয়ে তিনি পুরাণকে ইতিহাসের সমলগ্ন করে এবং পৌরাণিক চরিত্রকে মানবীয় প্রতিপন্ন করে স্বকালের মানুষের মনে শ্রেষ্ঠত্বের বোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন – আলোচ্য প্রবন্ধে তারই সুলুক-সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

কালকূট তথা সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) *শাম্ব* (১৯৭৭) উপন্যাসটিতে পৌরাণিক কাহিনির নবরূপায়ণে স্বকালের মানুষের জীবনে আশা ও বিশ্বাসের বোধকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছেন। পুরাণকে ইতিহাস প্রতিপাদ্য করে পৌরাণিক চরিত্রদের মানবীয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস, বঙ্কিম-রবীন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক কালের প্রায় সব সাহিত্যিকের মধ্যেই কম-বেশি দেখা যায়। তবে সমরেশ বসু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 'কালকূট' ছদ্মনামে একের পর এক পৌরাণিক উপন্যাস রচনা করেছেন। ভারতীয় পুরাণ-নির্ভর কাহিনিকেন্দ্রিক উপন্যাসে তিনি ইতিহাস বা পুরাণকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নির্মাণ করেছেন। 'কালকূট' শব্দের অর্থ তীব্র বিষ। আভিধানিক হরিচরণের মতে কালকূট অর্থ – কালের অবসাদক বা দাহক। পৌরাণিক কাহিনির অনুষঙ্গে সমরেশ মূলত স্বকালকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজ সময়ের ক্রান্তির রূপালেখ্য এবং তা থেকে উত্তরণের সুলুকসন্ধান করেছেন তিনি পুরাণ-আধারে। রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে নিজ মত প্রকাশের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের প্রয়াস দেখা যায় তাঁর 'কালকূট' নামধারণ এবং পুরাণকেন্দ্রিকতায়।

কৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র শাম্বের আখ্যান বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নভাবে রক্ষিত রয়েছে। *মহাভারত* ও *ভাগবতপুরাণে* শাম্বকে যদুবংশের ধ্বংসের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমরেশ সচেতনভাবেই এ আখ্যান এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত 'ভবিষ্য-সৌর-শাম্ব'[১] পুরাণত্রয় অবলম্বনে পিতা কর্তৃক শাম্বের অভিশপ্ত হওয়া ও শাপমোচনের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন আলোচ্য উপন্যাসের মূল কাহিনি হিসেবে। কৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করেছেন 'ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহামানব' হিসেবে এবং শাম্বকে 'প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী, ত্যাগী, "বিশ্বাসী" উজ্জ্বলতম ব্যক্তিরূপে' দেখেছেন।[২] শাম্ব লেখকের কাছে একজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের প্রতীক; এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি 'বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে' দেখাতে চেয়েছেন এবং তা দেখাতে চেয়েছেন 'কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে'।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বছর দশেক পরে কৃষ্ণের দ্বারকা নগরীতে মহর্ষি নারদের আগমনের মধ্য দিয়ে *শাম্ব* উপন্যাসের মূল কাহিনির সূচনা। মহর্ষিকে স্বয়ং কৃষ্ণ এবং নগরের সকলে সাদর সম্ভাষণ জানালেও প্রণয়-লীলায় মগ্ন কৃষ্ণপুত্র শাম্ব অসচেতনভাবে তা থেকে বিরত থাকেন। শাম্বের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিতে অপমানিত নারদ প্রতিশোধস্পৃহায় কৃষ্ণের মনে সৃষ্টি করে পুত্রের প্রতি ঈর্ষা। প্রতিশোধস্পৃহায় মহর্ষি নারদ ষোল সহস্র রমণীসহ প্রমোদকাননের জলাশয়ে অবগাহনরত কৃষ্ণের সামনে কৌশলে এনে দাঁড় করায় রূপবান তরুণ শাম্বকে। কৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকা রমণীরা মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণকে অবহেলা করে শাম্বের প্রতি মনোযোগী হয়। মর্মাহত ও ক্রোধ-গ্লানিতে অস্থির কৃষ্ণ নারদের ফাঁদে ধরা দেন। অসূয়া-বিষে জর্জরিত হয়ে তিনি নির্দোষ পুত্রের প্রতি উচ্চারণ করেন অভিশাপের করাল বাণী "তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।"[৩]

নিক্ষিপ্ত তীরের মতোই অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য এ অভিশাপে শাম্ব অচিরেই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। কালকূট অবশ্য অভিশাপ ও তার বাস্তবায়নে অলৌকিকতাকে পরিহার করার প্রয়াসী ছিলেন। সেকারণেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে কৃষ্ণ পুত্রকে জানান যে, এ কেবল অভিশাপ নয়, তার নিয়তিও; জন্মলগ্ন থেকেই কুষ্ঠরোগের মতো কুৎসিত ব্যাধি শাম্বের ভাগ্যে লেখা ছিল – অতিক্রোধে তিনি তা উচ্চারণ করেছেন মাত্র। অভিশপ্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই শাম্বর দেহে রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে – দেহ রক্তাভ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফীত হয়েছে; যদিও শাম্ব সে-ব্যাপারে সচেতন ছিল না।

সিসিফাসের মতোই ভাগ্য-বিড়ম্বিত শাম্ব নিয়তির কাছে নতি স্বীকার করেনি বরং রোগমুক্তির উপায় অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে, অকম্পিত স্বরে ঘোষণা করেছে –

> এই অভিশাপ আমার অদৃষ্ট। ... আমার ভাগ্যের এই অমোঘ অনিবার্য পরিণতি জেনেও, আমি নিশ্চেষ্ট থাকব না। প্রয়োজন হলে, মুক্তির জন্য আমি এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র যাব।[৪]

পরবর্তী সময়ে নারদ মুনিকে স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করে তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী শাম্ব শত শত গ্রাম-নগর-জনপদ অতিক্রম করে সাত ঋতু পর চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্তী মিত্রবনের সূর্যক্ষেত্রে পৌঁছে এবং সেখানকার ঋষি-নির্দেশিত দ্বাদশ তীর্থ পরিভ্রমণ, দ্বাদশ নদনদীতে স্নান এবং সূর্যোপসনা করে রোগমুক্তি লাভ করে।

শাম্বের এই রোগমুক্তির যাত্রা একক বা আত্মকেন্দ্রিক নয়, মিত্রবনে অবস্থানরত সত্তরজন কুষ্ঠরোগীকে নীরোগ হওয়ার আশায় উদ্দীপ্ত করে সে তার সহযাত্রী করেছিল। শাপমোচন বা রোগমুক্তির পরও দ্বারকার বিলাসীজীবনে আর ফিরে যায়নি শাম্ব। মিত্রবনের ঋষির অনুরোধে শাকদ্বীপে গিয়ে মগ ব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষে নিয়ে এসে তিনটি সূর্যমন্দির স্থাপন করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং নিজে 'শাম্বাদিত্য' অভিধায় অভিহিত হয়ে সূর্যরাজের সম হয়ে ওঠে। এভাবে শাম্বের উত্তরণের মধ্য দিয়ে কালকূট তাঁর 'দিবি আরোহণ' মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। লেখক তাঁর মৌল উদ্দেশ্য উপন্যাসের ভূমিকাতেই স্পষ্ট করেছেন –

> আমি একটি ব্যক্তির কথাই বলতে চেয়েছি, যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন। শাম্ব আমার কাছে এক "সংগ্রামী" ব্যক্তি, "বিশ্বাস"

> এখানে আমার বক্তব্য বিষয়, এবং এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছি, দেখতে চেয়েছি কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।[৫]

মহাভারতে শাম্ব তুলনামূলক অপ্রধান চরিত্র হলেও পুরাণ ও উপপুরাণে তাকে বিশিষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে তো বটেই, শাম্ব নামে একটি উপপুরাণ রয়েছে। ভবিষ্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বায়ুপুরাণে শাম্বের উল্লেখ রয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে সমলগ্ন করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, পঞ্চরাত্র ব্যূহবাদের প্রবর্তনের পূর্বকালে কৃষ্ণ বা বাসুদেবের পূজকদের মধ্যে তাঁর পুত্র শাম্বের পূজার প্রচলন ছিল। বায়ুপুরাণে ব্যূহবাদের পূর্ববর্তী ভাগবত ধর্মের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> "মনুষ্যপ্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্তমানান্নিবোধত।
> সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-শাম্ব এব চ।
> অনিরুদ্ধাশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।"

অর্থাৎ, মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতাদের মধ্যে যেসব নাম বলা হয়েছে তা আপনারা শুনুন। সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব এবং অনিরুদ্ধ – এই পাঁচজন বংশের বীর বলে বিখ্যাত।[৬]

ব্যূহবাদে বাসুদেবই আদিপুরুষ বলে বিবেচিত। তাঁর থেকে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ থেকে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্নের থেকে অনিরুদ্ধের ক্রমিক বিকাশ ঘটে। এই ব্যূহবাদে কৃষ্ণ এবং তাঁর বিভিন্নরূপই প্রধান; তবু পুত্র শাম্ব স্বীয় গুণে উল্লেখিত এবং পূজিত।

সমরেশ বসু পুরাণকে ইতিহাস হিসেবে দাঁড় করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর *শাম্ব* উপন্যাসে। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট করে এ কথা ব্যক্ত করেছেন বারবার । *শাম্ব* উপন্যাসের প্রথম তেত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে পৌরাণিক কাহিনিকে ইতিহাসের বাস্তবতার ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য নানা যুক্তি-তর্ক ও মতের বিশ্লেষণের অবতারণা করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে পুরাণকে আমরা 'মাইথলজি' হিসেবে দেখি, ইতিহাস নয়। সমরেশ পুরাণকারদের উদ্ধৃত করেছেন এভাবে – "পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরাণকে প্রাচীনকালের বিবরণ জ্ঞানেই অবগত আছেন।"[৭] পুরাণকে তিনি হিস্ট্রি অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং হিস্ট্রির পরিভাষা হিসেবে সংস্কৃত শব্দ 'ইতিবৃত্ত'কে নির্বাচন করেছেন, ইতিহাস নয়। কেননা, ইতিহাস শব্দের অর্থ সংস্কৃত ও বাংলায় ভিন্ন; অন্যদিকে 'ইতিবৃত্ত' শব্দটি ব্যবচ্ছেদ করলে এ শব্দের অর্থ পাওয়া যায় –অতীতের বর্ণনা ('ইত' অর্থ যা গত হয়েছে, বৃত্ত অর্থ বর্ণনা) ; যাতে বিভ্রান্তির আশঙ্কা কম থাকে। " 'হিস্ট্রি' একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ হলো গবেষণা বা সযত্ন অনুসন্ধান। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণাকর্মের নামকরণে শব্দটি ব্যবহার করেন এবং আজ পর্যন্ত বিষয়টি এ নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।"[৮]

ইতিহাসের সংজ্ঞায়ন বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন। ইবনে খলদুনের মতে, "ইতিহাস মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবরণ, সমাজের রূপে যে পরিবর্তন আসে তার কাহিনী, সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অপরের সংঘাত ও বিপ্লবের বৃত্তান্ত, সমাজের রূপান্তরেই ইতিহাসের গতি, সেই রূপান্তরের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রাণ।"[৯]

এডওয়ার্ড হ্যালেট কার মনে করেন ইতিহাস বিজ্ঞান, এর পাঠ্য মানুষ ও প্রকৃতি;[১০] তাঁর লিখিত *বলশেভিক বিপ্লব* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, 'আমি বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে বসিনি, বিপ্লব থেকে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম হলো তারই ইতিহাস লিখতে চাই।'[১১]

ইতিহাস যে কেবল সন, তারিখের আকর বা ঘটনা-কাহিনির বর্ণনা নয়, মানুষ এবং তার পরিপার্শ্ব ইতিহাসের মূল অবলম্বন – কারের কথা থেকে আমরা সেই প্রত্যয় পেয়ে থাকি। সেই সঙ্গে ইতিহাসে বর্ণিত বিষয় বিজ্ঞানের মতোই পরীক্ষিত এবং নানান যুক্তির ধাপে উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিপাদ্যরূপে বিবেচিত হয়। যে কেউ অতীতের যেকোনো বিষয়ের বর্ণনা করলেই তা ইতিহাস হয়ে যায় না, বরং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে, বিভিন্ন উৎস থেকে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মধ্যে ইতিহাস বা ইতিবৃত্তের স্বরূপ বর্তমান।

পুরাণ শব্দের অর্থ প্রাচীন বা পুরাতন কথা। ঋকসংহিতার ভাষ্যে পুরাণের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য সায়ন বলেছেন–'ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ। জগতঃ প্রাগ্ অবস্থাম্ উপক্রম্য সর্গ প্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্' – এই জগৎসৃষ্টির পূর্বকালীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত যে বৃত্তান্ত তাই-ই পুরাণ।[১২]

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পুরাণসাহিত্য প্রচলিত। বৈদিক সাহিত্য বিশেষত অথর্ববেদে একাধিকবার পুরাণের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মহাভারতেও পুরাণের উল্লেখ রয়েছে। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে সত্যবতীপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ইত্যাদির দ্বারা পুরাণ রচনা করেন।[১৩]

পুরাণকে অনেকক্ষেত্রে বেদের লৌকিক ব্যাখ্যা বলে মনে করা হয়। বেদের যুগে দ্বিজ ছাড়া কারো বেদপাঠের অধিকার ছিল না। অথচ ধর্মাচরণ সকলের কর্তব্য। তাই বেদের তত্ত্বকথা গল্পের এবং ইতিহাসের মাধ্যমে পাঠদানের লক্ষ্যে পুরাণশাস্ত্র রচিত। বলা হয়ে থাকে, বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ কোনো পুরুষের রচনা নয়, ব্রহ্মের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই তা চিরকাল আছে; অন্যদিকে পুরাণ পৌরুষেয় অর্থাৎ কোনো পুরুষ বা মানুষের রচনা। ব্যাসদেব আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণের রচয়িতা বলে প্রচারিত; কার্যত তিনি হয়ত একটি পুরাণ রচনা করেন। পুরাণের পরবর্তী রচয়িতারা স্বেচ্ছায় ব্যাস নাম ধারণ করে নিজেদের নাম গোপন করেছেন। বিভিন্ন পুরাণে ২৮ জন ব্যাসের নাম পাওয়া যায় – মনে হয়, ব্যাস নামটি তাঁর শিষ্যদের উপাধি ছিল। এই শিষ্যরাই পুরাণসমূহ রচনা ও প্রচার করেছেন।[১৪] গুরু ব্যাসই সমস্ত পুরাণের রচয়িতা এ বিশ্বাসকে সম্মানের সঙ্গে ধারণ ও প্রতিষ্ঠাই হয়তো তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল।

পুরাণ ও ইতিহাসকে এক করে এবং পৃথক করে দেখবার ইতিবৃত্তও নতুন নয়, মোটামুটি প্রাচীন। মহাভারতের বনপর্বে ব্যাসদেব মহাভারতকে একইসঙ্গে ইতিহাস ও পুরাণ বলে অভিহিত করেছেন–

"অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম।।"[১৫]

মৎস্য পুরাণে আবার ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে পার্থক্য টানা হয়েছে– "পুরাণেস্বিতিহাসোহয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ"।[১৬]

ইউরোপীয় মিথ ও ভারতীয় পুরাণের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য এক নয়, পৃথক। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পুরাণে ধর্মীয় প্রতীতি, ইউরোপীয় অর্থের মিথ, কিংবদন্তি এবং বাস্তব ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ একত্র হয়ে থাকে।[১৭] সমালোচকের মতে,

> প্রকৃতপক্ষে পুরাণের জন্ম পুরাঘটিত এবং বর্তমান মুহূর্তের অবিচ্ছেদ্য হৃদ্যতায়। 'পূরণ' কথাটি থেকে 'পুরাণ' কথাটির মৌল সূত্র মিলবে : যা ঘটে গিয়েছে বা ঘটে গেল তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দূরত্ব মনে মনে পূরণ করতে হবে। স্মৃতির শরীরটিকে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণে ঋদ্ধ এবং সম্প্রসারিত করে তোলাই পুরাণের কাজ।[১৮]

পুরাণে ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রাবল্য থাকে কিন্তু অন্তরঙ্গে প্রবহমান থাকে ইতিহাসের বা তৎসমাজের সমাজমানস বা ব্যক্তিমানসের অনুধ্যান। অন্যদিকে, ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতা।[১৯] অধ্যাপক ব্যারাক্লাফের মতে, যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সঠিকভাবে বলতে গেলে তথ্যভিত্তিক নয়, বরঞ্চ এক সারি স্বীকৃত অভিমত।[২০]

পুরাণ ও ইতিহাসের এ ধরনের সংজ্ঞার্থের নির্যাস মেনেই সমরেশ বসু *শাম্ব* উপন্যাসে পুরাণ ও ইতিহাস তথা ইতিবৃত্তের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় আবরণে মোড়ানো পুরাণের অন্তর্গত ইতিহাসের কাঠামোর ওপর আলোকসম্পাত করে তিনি পুরাণকে ইতিবৃত্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টাকে সফল করতে তিনি নানা যুক্তি ও তথ্যের নির্ভরতা টেনেছেন। কালকূট মহাভারতের রচনা থেকেই উদ্ধৃত করেছেন, 'ইতিহাসবিদং চক্রে পূণ্যং সত্যবতীসুতঃ'[২১] – অর্থাৎ মহাভারত একটি ইতিহাসগ্রন্থ। মূল কাহিনিসূত্রে প্রবেশের আগেই রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনার বাস্তব কাল ও স্থান নির্দেশ করে তিনি দেবতার দেবত্বকে মানবীয় করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে 'দিবি আরোহণ' বা মানুষের দেবত্ব লাভের সূত্র ব্যক্ত করেছেন এভাবে –

> উত্তম মানুষ প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতা হন। প্রতিলোম ক্রিয়ার আশ্চর্য সূত্র হল, উত্তম মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজিত হন, তারপরে তিনি দেবতা হন, তারপর তাঁকে জ্যোতিষ্ক রূপে কল্পনা করা হয়।[২২]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের মানুষদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা হতো; তখন কেবল মনুবংশীয়দেরই মানুষ বলা হতো, অন্য জাতিদের দেবতা, অসুর[২৩], গন্ধর্ব, সর্প, নাগ, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদি। সম্ভবত দেবতা বলে অভিহিত করা হতো আর্যবংশীয়দের। এ কারণেই দেবতাদের আবাসস্থল বা স্বর্গের ভৌগোলিক পরিচয় খুঁজেছেন ঔপন্যাসিক মর্ত্যের ভূমিতে। নিজেকে সূত[২৪] বা ইতিবৃত্তের সংগ্রাহক বলে অভিহিত করে তিনি স্বর্গের স্থানিক পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষ্যে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ। আধুনিক পামির পূর্বতুর্কিস্থান বা তুর্কেমেনিস্তান ইলাবৃতবংশের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে আবাসস্থল বসবাস অনুপযোগী হওয়ায় অথবা জনাকীর্ণ অঞ্চলে পরিণত হওয়ার কারণে এখানকার একদল অধিবাসী ভারতবর্ষে গিয়েছিল।[২৫] ঔপন্যাসিকের এ অনুমানের ভিত্তি 'তেত্রিশ কোটি দেবতা'র পৌরাণিক-শ্রুতি। ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে আমরা জানি যে, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল মধ্য এশিয়া থেকে।[২৬] ইতিহাসের পাতা থেকে শ্রমসাধ্য অনুসন্ধানে কালকূট ধাপে ধাপে দেবতার মানবায়নে ব্রতী হয়েছেন।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্র একজন ব্যক্তি নয় বরং ইন্দ্র একটি উপাধি যা একাধিক ব্যক্তি ধারণ করেছে; পুরাণে ইন্দ্রের যে অসামান্য অজস্র কীর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় বা অমরত্বের আখ্যান কীর্তিত হয়, তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সম্ভবত এটাই। মৎস্যপুরাণের একজন ইন্দ্রের কথা উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে, যে বজ্র দ্বারা স্বর্গপথ রোধ করে অর্থাৎ পাহাড় ধসিয়ে দিয়ে যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিঘ্নিত করে, অর্থাৎ কোনো বিস্ফোরক বা কৌশল দ্বারা পাহাড়ধস ঘটায়, কালকূট এ ঘটনায় দেবতার অলৌকিকত্বের বদলে মানবীয় শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে ইন্দ্রকে মানবীয় করে উপস্থাপন করেছেন। দেবতার অলৌকিকত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক 'অতিরঞ্জন' বিশেষণের আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতবর্ষের মানুষ ইতিবাচক ভঙ্গিতে 'হাজার' শব্দটি ব্যবহার করে, আশীর্বাদ করতে হাজার বছরের পরমায়ু কামনা করে। প্রকৃতপক্ষে 'হাজার' হলো উপলক্ষণ প্রয়োগ। কালকূট ভাষ্যে রামের জীবনেতিহাসের প্রায় সবকিছু বাস্তব কিন্তু রামের এগারো হাজার বৎসর রাজত্বের ইতিহাস তাকে দেবতায় পরিণত করে। 'হাজার' শব্দটি বাদ দিলেই রাম হয়ে ওঠেন সাধারণ একজন রাজা। শব্দের অতিপ্রয়োগে বাস্তব হয়ে ওঠে অতিলৌকিক; কালকূট দেখিয়েছেন বর্ণনা বা শব্দের সচেতন প্রয়োগে বাস্তবতার স্থিতভূমিতে আমরা মানুষকে চিহ্নিত করতে পারি দেবতার খোলসে।

পুরাণকে ইতিবৃত্ত বলে প্রমাণের জন্য কালকূট ব্যবহার করেছেন সগর রাজা ও তার বংশধরদের বৃত্তান্ত – যাদের বংশ-পরম্পরায় কঠোর শ্রমে খাল কেটে সুদীর্ঘ পথে গঙ্গার সাগরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দুরূহ কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল। সগর ও তার বংশধর ভগীরথের নাম কীর্তিত হয়েছে গঙ্গার নামকরণে, গঙ্গার আরেক নাম তাই ভাগীরথী, সমুদ্রের অপর নাম সাগর। পুরাণের সূত্র ধরে কালকূট বলেছেন, গঙ্গাকে সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের অভিপ্রায়ে খনিত খালটির কাজ সমাপ্ত হয় প্রায় পাঁচপুরুষব্যাপী কর্মযজ্ঞের ফলে। এত দীর্ঘসময় লাগার কারণ কপিলদেবের অভিশাপ। খননকাজে নিয়োজিত সগর রাজার ছেলে অসমঞ্জ এবং ষাট হাজার কর্মী কপিলের অগ্নিপিঙ্গল বর্ণের দিকে তাকিয়ে অভিশপ্ত হয়ে মারা যায়। কালকূটের মতে, এ কপিলদেব কোনো ব্যক্তি নয় বরং রোগবিশেষ। যকৃতের দোষ, চোখ হলুদ হওয়া এবং বিভীষিকাময় জ্বর – এ সমস্তই ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। সংক্রামক রোগে ষাট হাজার লোকের মৃত্যু একেবারে অবাস্তব নয় – বিভিন্ন সময়ের মহামারিদৃষ্টে এ কথা আমরা সহজেই বলতে পারি। কালকূট অবশ্য পাঠকের বিশ্বাস অর্জনে ব্যবহার করেছেন পুরাণ ও ইতিহাসের একাধিক উদাহরণ। কৃষ্ণ একবার বাণরাজ্যে মহেশ্বর জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বাণরাজ্য যেহেতু আধুনিক আসাম, ম্যালেরিয়া সম্ভবত মহেশ্বর জ্বরের আরেক নাম। এছাড়া আধুনিক কালে মিরজুমলার দুই লক্ষেরও বেশি সৈন্য আসামে গিয়ে জ্বরে মারা গিয়েছিল – ইতিহাসে রক্ষিত এ তথ্য জানিয়ে কালকূট প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এ অঞ্চলে জ্বরে ষাট হাজারের অধিক লোকের মৃত্যু বিশ্বাসযোগ্য একটি তথ্য হতে পারে ।

পৌরাণিক আরেক কাহিনির লৌকিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন ইন্দ্রের অস্থিময় বজ্র তৈরির আখ্যানে। এ অস্ত্র তৈরির জন্য দধীচির অস্থি গ্রহণ করা হয়েছিল। দধীচির বিশাল অশ্বমস্তক সদৃশ করোটি আদিম ডায়নোসর জাতীয় প্রাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৭] প্রসঙ্গত লেখক স্মরণ করিয়ে দেন পূর্বতুর্কিস্থান এবং নিকটবর্তী প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সূত্রে

নিজ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা দাবি করেন তিনি। সেই সঙ্গে এই তথ্যও দেন যে, বজ্রায়ুধ তৈরির কারিগর ত্বষ্টা বারুদ বানানো শিখেছিলেন ইলাবৃতবর্ষের সংলগ্ন ভদ্রাশ্ববর্ষ থেকে। ভদ্রাশ্ববর্ষ মানে আধুনিক চিনে বারুদ তৈরির কৌশল জানা ছিল বহু শতবর্ষ পূর্ব থেকে।

পুরাণের নানান ঘটনাকে বাস্তব আখ্যা দেওয়ার অভিপ্রায় অবশ্য কালকূটের অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত। তবে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক বা ভৌগোলিকসূত্রে ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠার এবং পাঠকমনে স্থির প্রতীতি জন্মানোর সবিশেষ চেষ্টা করেছেন। তবে স্থির সিদ্ধান্ত তিনি দেননি, বরং নানা যুক্তি-তর্কের বিশ্লেষণে পাঠকমনের উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী-শক্তিকে উজ্জীবিত করেছেন। তাঁর এই উপন্যাসপাঠে পাঠক নির্জীব দর্শক নয়, বিচারক্ষম সক্রিয় ভূমিকায় অংশ নিতে পারেন; লেখকের সঙ্গে পাঠকের মেলবন্ধন ঘটানোর এটি কালকূটীয় কৌশল বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

কেবল পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার সূত্রে নয়, কালকূট সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করেও তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন। কৃষ্ণের জন্মকাল নির্দেশ করেছেন তিনি এক হাজার চারশো আটান্ন খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এবং রামচন্দ্রের দুই হাজার একশো চব্বিশ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। রাম অপেক্ষা কৃষ্ণ ছিলেন ছশো ছেষট্টি বছরের ছোট। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজা ছিলেন বৈরোচন বলি; তার রাজত্বকাল ছিল তিন হাজার চারশো সাতান্ন খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এ ধরনের গণনার বেশ কিছু উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে। কুরুক্ষেত্রের কাল নির্ণয় করেছেন তিনি এক হাজার চারশো ষোলো খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। কৃষ্ণের জন্ম ১৪৫৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।[২৮] শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মতে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এ সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স ছিল ৭২, ভীমের ৭১, অর্জুনের ৭০, নকুল ও সহদেবের ৬৯ বছর। কৃষ্ণকে অর্জুনের সমবয়সী বিবেচনা করলে বা এক বছরের ছোট ভাবলে ৬৯ বা ৭০।[২৯] আর ঘটনাস্থানের বাস্তবগ্রাহ্যতার বিষয়ে তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কালকূটের পুরাণ-পাঠ উপরিতলের নয়, পুরাণ-সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে মুক্তা সংগ্রহের ক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি রীতিমতো দীক্ষা নিয়েছেন সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে এবং *শাম্ব* উপন্যাসটি উৎসর্গও করেছেন তাঁর গুরু শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন উৎসর্গপত্রে।[৩০]

কালগণনার বিষয় কীভাবে নির্ধারণ করেছেন লেখক তা সুস্পষ্টভাবে বলেননি, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে ইঙ্গিত করেছেন। তবে সেই সঙ্গে নিজের সন্দেহের কথা জানাতেও ভুল করেননি তিনি।[৩১] স্থানের উল্লেখে লেখক পৌরাণিক নামের পাশে বেশ কিছু বর্তমান নাম ব্যবহার করেছেন; যেমন– ইলাবৃতবর্ষ বা স্বর্গের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করে এটি যে মধ্য এশিয়ার পূর্বতুর্কিস্থান তা উল্লেখ করেছেন।[৩২] এখান থেকে যে পথ দিয়ে দেবনামা জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে তার বিবরণ দিয়েছেন বিস্তৃতভাবে –

> দেবগণ আধুনিক তুর্কিস্থান থেকে কাশ্মীরের পথে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে বিন্ধ্যাচলের উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত অধিকার করেন। তারপরে বিন্ধ্যের দক্ষিণেও অগ্রসর হন। বলতে গেলে, আস্তে আস্তে তাঁরা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আমি এইভাবে ভাগ করি, ইলাবৃতবর্ষ কাশ্মীর বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণপথ পর্যায়ক্রমে স্বর্গ,

> অন্তরীক্ষ, মর্ত, পাতাল নামে পরিচিত। ভারতীয়দের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে এসে বাস করেন তাই তার অপর নাম পিতৃলোক।[৩৩]

এ বর্ণনা আরও কিছুটা দীর্ঘায়িত করে ঔপন্যাসিক পাঠককে জানিয়েছেন –

> ভারতের বিন্ধ্যাচলের উত্তর ভাগের নাম পৃথিবী বা মর্ত। পৃথু রাজার রাজ্যই পৃথিবী। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগ পাতাল। পাতালকে আমি ভূবিবর বলেছি, দক্ষিণদেশও বলেছি। পাতালেরও সাতভাগ আছে।[৩৪]

আমাদের বঙ্গভূমি পাতালেরই একটি ভাগ – সুতলের অংশ। অন্য ভাগগুলো হলো – অতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এই সাত ভাগ পাতাল বহু নদ-নদী, উপবন ও নগর শোভিত। বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত পাতাল মূলত মর্ত্যভূমির অন্তর্গত।

পুরাণে বর্ণিত বিপাশা ও শুতুদ্রী নদীর আধুনিক নাম বিয়াস আর সটলেজ – এ কথা ঔপন্যাসিক ঠিকঠাক পাঠককে জানিয়ে দেন উপন্যাসের বর্ণনাসূত্রে। দ্বারকার অবস্থান তিনি নির্ধারণ করেছেন মথুরা থেকে সাড়ে ছশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ; তবে এ নগর সম্ভবত এখন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে আছে এ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন একই সঙ্গে। সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশের এ অঞ্চলে ভূমিকম্প এবং তার ফলে নগর-ভূমি সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। আঠারোশো উনিশ খ্রিষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশের দুহাজার বর্গমাইল সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছিল – এ সমস্ত তথ্যের সন্নিবেশে কালকূট তাঁর অনুমানকে শব্দরূপ দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন, "সিন্ধুদেশের ভূমিকম্পপ্রবণতাই কৃষ্ণের দ্বারকাকে গ্রাস করেছিল? তা না হলে সম্ভবত কৃষ্ণের কুশস্থলী পুরীর কোনও না কোনও নিদর্শন, কাথিয়াবাড়ে, গিরিনগরে (গিরনারে) বা জুনাগড়ে খুঁজে পাওয়া যেত।"[৩৫] প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং উত্তরে 'সম্ভবত' শব্দের ব্যবহার কালকূটের রচনার একটি অনন্য কৌশল। পুরাণকে বাস্তবগ্রাহ্য ইতিহাস করার প্রচেষ্টায় উৎসাহী কালকূট ভৌগোলিক বিবরণের ক্ষেত্রেও প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার করেছেন; নিজের সংশয়কে প্রকাশ করার জন্য কেবল নয়, কারণ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও তিনি দিয়েছেন। লেখকের এ প্রশ্নবোধকতা পাঠককে সচেতন করে এবং এই প্রশ্নের উত্তর যে লেখকের যুক্তিনির্ভর অনুমান, ঐতিহাসিক বা অন্য কোনো মানদণ্ডে পরীক্ষিত নয়; তা জানিয়ে দেয়। পাঠকের বিশ্লেষণীশক্তিকে উজ্জীবিত করে পুরাণকে বাস্তবগ্রাহ্যদৃষ্টিতে দেখার মানসেই লেখকের এই কৌশল অবলম্বন।

শাম্ব-আখ্যানে যে মিত্রবনের উল্লেখ আছে, সেটি সম্ভবত মুলতান এবং চন্দ্রভাগা নদীর আধুনিক নাম চেনাব। উপন্যাসে উল্লেখ আছে যে মিত্রবনের অবস্থান পঞ্চনদীর দেশ অর্থাৎ পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের মুলতানে প্রাচীন সূর্যমন্দির ছিল, যাকে আদিত্য মন্দির বলেও অভিহিত করা হতো। এ মন্দিরটি রোগনিরাময়ের একটি কেন্দ্র হিসেবেও গণ্য হতো। মুসলিম শাসনের প্রথম শতকেও এ মন্দিরটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী তীর্থযাত্রীরা দর্শনার্থী হিসেবে আসত। দশম শতকে এ মন্দিরের আদিত্য-মূর্তিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তৎকালীন ইসমাইলি বংশের শাসক দ্বারা। ওড্রদেশের লবণদধির তীরে যে মন্দিরটি স্থাপন করা হয়েছে তা সম্ভবত[৩৬] উড়িষ্যার কোণার্ক সূর্যমন্দির। মথুরার সন্নিকটে যমুনার দক্ষিণ তীরে যে মন্দিরটি স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের কাল্পি সূর্যমন্দির; যদিও মুলতান ও

কোণার্ক সূর্যমন্দিরের মাঝামাঝি অবস্থান গুজরাটের মোদহেরা সূর্যমন্দির এবং সেটি যথেষ্ট প্রাচীনও কিন্তু উপন্যাসে উল্লেখিত যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত নয় বলে একে ধর্তব্যের মধ্যে আনা যাচ্ছে না।

শাম্বপুরাণের ২৬শ ও ২৭শ অধ্যায়ে শাকদ্বীপ থেকে ১৮ জন মগ ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষের সূর্য-মন্দিরে নিয়ে আসার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। আলোচ্য উপন্যাসেও এ কাহিনির মূলকাঠামো অক্ষুণ্ন রয়েছে। উপন্যাসে শাকদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনায় বলা হয়েছে – অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে দেবলোক ইলাবৃতবর্ষের নিকটবর্তী কোনও স্থানের নাম শাকদ্বীপ। অন্তরীক্ষ হলো কাশ্মীর এবং ইলাবৃতবর্ষ হলো আধুনিক তুর্কেমেনিস্তান। মধ্য-এশিয়ায় অবস্থিত এ দেশটির দক্ষিণ সীমান্ত মিশেছে পারস্য অর্থাৎ ইরানের সঙ্গে এবং দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে আফগানিস্তান। 'শাকাস্তান' নামে এক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন জনপদের কথা জানা যায়, যার বর্তমান নাম সিস্টান (Sistan)। ধারণা করা যেতে পারে, শাকদ্বীপ বলে যে প্রদেশে মগ ব্রাহ্মণদের বাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা পারস্যে[৩৭] অবস্থিত – ভৌগোলিক অবস্থানের সূত্র তা সমর্থন করে এবং পারস্যে সূর্য-উপাসনার ঐতিহ্যের প্রমাণও মেলে। এছাড়া শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণদের দৈহিক বর্ণনা ও বেশবাসের যে বিবরণ[৩৮] শাম্বর দৃষ্টিকোণে কালকূট দিয়েছেন তাও এ ভাবনার অন্তরায় নয় বরং অনুকূলেই রায় দেয়। ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায় মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাতি ছিল শক[৩৯]; তারা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বোলান গিরিপথ ধরে ভারতে প্রবেশ শুরু করে। শক রাজাদের আনুকূল্যে ভারতে মিহির বা সূর্যের পূজার প্রচলন হয়। এই শকদের একটি শাখা সম্ভবত পারস্যে অবস্থান করেছে এবং তাদের শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কালকূট কেন পুরাণ-নির্ভর রচনা লিখেছেন বা *শাম্ব* উপন্যাসে কেন পুরাণ ও ইতিবৃত্তকে মিলিয়ে দেখার জন্য এমন শ্রমসাধ্য কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন – এ প্রশ্ন সচেতন পাঠকের মনে জাগ্রত হওয়া খুব স্বাভাবিক। পুরাণকে নির্ভর করার অনেকগুলো কারণের অন্যতম হলো – লেখকের স্বদেশপ্রীতি বা স্বাদেশিকতাবোধ। এ সূত্রে উপন্যাসের প্রথমাংশেই ঔপনিবেশিকদের ধারণার খণ্ডন করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্‌বোধন করা হয়েছে। সাহেবদের ধারণায় পুরাণ এবং মিথ একই এবং তা ইতিহাস নয়; এ ধারণার বিপরীতে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন কালকূট। তাঁর মতে, ভারতীয়রা যা প্রাণ ধরে রক্ষা করে, তার সঙ্গে ধর্মের একটি সম্পর্ক রয়েছে। পুরাণ তাই লোকমানুষের ধর্ম পুস্তক। *শাম্ব* উপন্যাসে সর্বলোকগ্রাহ্য ধর্মপুস্তককে ইতিবৃত্ত বলে প্রমাণের প্রচেষ্টায় বহু প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে কিন্তু অশ্রদ্ধা করে নয়, বরং শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভালোবাসায়। লেখকের বক্তব্যেই তাঁর প্রণাম – "এসব শুনলে, তোমার কুসংস্কার ঘুচবে, সত্যকে জানতে পারবে, পুরাণকে বিস্মিত শ্রদ্ধায় প্রমাণ জানাতে শিখবে। এর নাম জ্ঞান।"[৪০] জ্ঞানের আলোকে অন্ধকার কাটিয়ে আলোর পথে অভিযাত্রার আরও একটি কারণ – তিনি তাঁর পাঠককে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে চান নিজস্ব সংস্কৃতির ভূমিতে দাঁড় করিয়ে। ক্যাম্পবেলও এ ধরনের একটি মত দিয়েছেন. তাঁর মতে, মানুষের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে দেয় মিথ বা পুরাণ।[৪১] বস্তুত পুরাণকে পাথেয় করে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়ার নিমিত্তে কালকূট অবতারণা করেছেন শাম্ব-আখ্যানের।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের তিন দশক পরেও সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। ক্ষমতার রাজনীতির ডামাডোলে ব্যক্তি মানুষের

অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার প্রেক্ষাপটে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার সূত্রে স্বকালের মানুষের উত্তরণের পথনির্দেশ করেছেন কালকূট *শাম্ব*-র আড়ালে। এ উপন্যাসে পৌরাণিককালের ইতিহাসকে উপলক্ষ্য করে বর্তমান কালের ইতিবৃত্তকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইতালীয় ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক বেনেদিত্ত ক্রোচে বলেছেন, "সব ইতিহাসই সমকালীন ইতিহাস এবং সব ঐতিহাসিকরা কোন না কোনভাবে দার্শনিক।"[৪২] কালকূট ইতিহাসবেত্তা না হলেও পুরাণ ও ইতিহাস বা ইতিবৃত্তের মেলবন্ধনে জীবনের দার্শনিক সত্যকেই অবলম্বন করেছেন।

শাম্ব উপন্যাসে শাম্বর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত গলিত-বিকৃত দেহ প্রতীকী অর্থে নষ্ট রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের শাসনাধীন সমাজকেই চিত্রিত করে। আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাসকে পাথেয় করে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রোগাক্রান্ত সমাজের রোগমুক্তি সম্ভব বলে কালকূট আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বারবার এ উপন্যাসে মিথ অফ সিসিফাসের উল্লেখ করার কারণ কেবল মানবের অনন্ত দুঃখবোধ নয় বরং নিজ পরিশ্রমে বা কর্মে আত্মতৃপ্ত মানুষের অভিব্যক্তির প্রকাশ। কাম্যু যেমনটা বলেছেন তাঁর 'মিথ অফ সিসিফাস' প্রবন্ধে–

> The Universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that nightfilled mountain, in itself forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart.[৪৩]

বস্তুত ব্যক্তি মানুষের দুর্ভোগ ও একাকী সংগ্রামের অন্তরালে কালকূট সামষ্টিক মানুষের বৈনাশিক যূথবদ্ধ শক্তিকেই তুলে এনেছেন শাম্বর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে। কাম্যুর কথা মান্য করেই যেন শাম্ব তাঁর সংগ্রামের সর্বোচ্চ শিখরে সন্ধান পায় তৃপ্তির মহামুহূর্ত। কেবল নিজের নয়, শাম্ব তার অনুরূপ সত্তর জন কুষ্ঠ রোগাক্রান্তকে সহযাত্রী করে রোগমুক্তির দীর্ঘ দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হয়। শাম্বের এমন ভাবনা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নয়, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্ভাসিত। ব্যক্তিগত রোগমুক্তি তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য, চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজমানসের সুস্থিতি সাধন। শাম্বের কাহিনিবৃত্তে তাই স্বসমাজের হিত ও মুক্তির সাধনাই প্রতীকায়িত হয়েছে।

পুরাণ ধর্মকেন্দ্রিক প্রাচীন জীবনের আখ্যান এবং ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত ব্যক্তির দৃষ্টিকোণে নির্মিত অতীত জীবনের ঘটনাবলি। ইতিহাসে বর্ণিত কাহিনি সন-তারিখ ও স্থানিক পটভূমির উল্লেখে বাস্তবতার শক্ত ভূমিতে স্থিত। পুরাণে তথ্য-প্রমাণের চেয়ে অলৌকিকতা বা ধর্মীয় রহস্যময়তার প্রাধান্য স্পষ্ট। পুরাণ ও ইতিবৃত্তের এই বিভেদকে দূর করে কালকূট ঘটনাকাল ও স্থানের জোরালো প্রমাণ সাপেক্ষে পুরাণ-বর্ণিত কাহিনিকে ইতিবৃত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। পুরাণকে নব-নির্মাণ করে ইতিবৃত্ত হিসেবে প্রমাণ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, উপন্যাসের একাধিক স্থানে তিনি যে ইতিবৃত্ত রচনা করছেন না, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[৪৪] সৃজনীশক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন বা নিছক জনপ্রিয়তা লেখকের মূল অভিপ্রায় নয়, পুরাণ ও ইতিবৃত্তের মেলবন্ধনে তাঁর স্বকাল ও স্বসমাজের প্রতি প্রবল দায়িত্ববোধ নিহিত। সেই লক্ষ্য-অভিমুখে যাত্রায় একনিষ্ঠভাবে *শাম্ব* উপন্যাসে কালকূট পুরাণ ও ইতিবৃত্তের দ্বৈরথে নিজেকে সমর্পণ করেছেন এবং এক বৈনাশিক কালের নেতিবাচকতাকে ঠেলে মানবজীবনের ইতিবাচকতাকে ধারণে সফল হয়েছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, ২০০১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৮
২. *শাম্ব* উপন্যাসের ভূমিকাংশে সমরেশ বসু একথা বলেছেন।
৩. কালকূট: *শাম্ব*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৪৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৫. প্রাগুক্ত, ভূমিকা
৬. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মার্কণ্ডেয় পুরাণ/প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৪, নবপত্র প্রকাশন, ভূমিকা, পৃ. ১৩
৭. কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৮. এম. দেলওয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩
৯. গোলাম কিবরিয়া, *ইতিহাসতত্ত্ব*, ১৯৮৯, দি সানডে পাবিলিকেশনস্, ঢাকা, গ্রন্থের ভূমিকাংশ কে. এম. মোহসীন লিখিত 'ইতিহাসতত্ত্ব সম্পর্কে দুটি কথা' থেকে ইবনে খলদুনের এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে।
১০. মুসা আনসারী, *বিশ শতকের ইতিহাস দর্শনে এডওয়ার্ড হ্যালেট কার*, ২০০৭, বাংলা একাডেমি, পৃ. ২৪
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১২. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বরাহ পুরাণ, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৪, নবপত্র প্রকাশন, ভূমিকা, পৃ. ১৩
১৩. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মার্কণ্ডেয় পুরাণ/প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১৪. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কূর্ম পুরাণ, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৪, নবপত্র প্রকাশন, ভূমিকা, পৃ. ৪
১৫. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মার্কণ্ডেয় পুরাণ/প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১৭. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১৮. আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃ. ২৯৬
১৯. ই এইচ কার ও আর ডবলিউ ডেভিস সম্পাদিত 'কাকে বলে ইতিহাস' (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ন বক্তৃতামালা জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬১) থেকে অধ্যাপক এম ওকশটের উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে। 'কাকে বলে ইতিহাস' বইটি অনুবাদ করেছেন স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত। পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ. ৯৯
২০. ই এইচ কার ও আর ডবলিউ ডেভিস সম্পাদিত 'কাকে বলে ইতিহাস' (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ন বক্তৃতামালা জানুয়ারী-মার্চ ১৯৬১) বই থেকে অধ্যাপক জি ব্যারাক্লাফের উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
২১. কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২৩. বৌদ্ধ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলে লোকেদের ভাষাকে বলা হয়েছে 'অসুর' ভাষা। নীহাররঞ্জন রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, ১৪২০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২১৮
২৪. কালকূট বলেছেন, "পুরাকালে প্রত্যেক রাজার নিজের ইতিবৃত্তকার থাকতেন। এঁদের বলা হত মাগধ। এঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করতেন সূতগণ। সূতগণের বেদে অধিকার ছিল না, কেবল বৃত্তান্ত জানা তাদের অধিকারে ছিল। তাঁরা মিথ্যাকে কাট-ছাঁট করতে জানতেন। তাঁদের বিবরণ পুরাণের মূল ভিত্তি। তাঁরা এক একজন ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার।" কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
২৫. দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি আর্যদের ভারতবর্ষ আগমন সম্পর্কে বলেন, "দেশান্তর যে সঠিক কী কারণে শুরু হয়েছিল তা পরিষ্কার নয় – কেননা বড় ধরনের কোন অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যথেষ্ট কারণ।" দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি, *ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা*, ২০০২, গৌতম মিত্র অনূদিত, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ. ৭০

২৬. রমিলা থাপার জানান, "ইন্দো-ইউরোপীয়রা নির্গত হয়েছিলেন ক্যাস্পিয়ান সাগর ও দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চল থেকে। তারপর এঁরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়লেন পশুচারণ ভূমির খোঁজে। তাঁরা এলেন গ্রীস ও এশিয়া মাইনরে, ইরান, ভারতবর্ষে। তখন এদের বলা হল আর্য।"
রমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ – ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ*, কৃষ্ণা গুপ্ত অনূদিত, ২০০২, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা পৃ. ১৪

২৭. পুরাণে দধীচিকে ঋষি বলে অভিহিত করা হয়েছে – প্রকৃতপক্ষে এটি আর্যসভ্যতার সর্বপ্রাণবাদী ধারণারই ফসল। রমিলা থাপারও এ বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন এভাবে –
"আর্যদের সর্বপ্রথম ধর্মীয় ধারণা ছিল আদিম সর্বপ্রাণবাদী, অর্থাৎ তাদের চারদিকে যে-সমস্ত প্রাণী বা শক্তিকে তারা বুঝতে পারত না বা নিয়ন্ত্রণও করতে পারত না, তাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করে পুরুষ বা স্ত্রী দেবতা হিসেবে গণ্য করা হতো। রমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২৮. কালকূট : *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৯. কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩০. *শাম্ব* উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে কালকূট লিখেছেন –
শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় শ্রীচরণেষু, সংস্কৃত মহাসিন্ধুর অকূলে বসে এই সামান্য বিন্দুকে সাহিত্যে উপস্থিত করা আমার পক্ষে অতি দুঃসাহসের কাজ হয়েছে। আপনার মত সংস্কৃত সিন্ধু বিশারদ থাকতে এই কাজ আমার মনকে প্রতি মুহূর্তে সঙ্কুচিত করছে। তথাপি আমার এই সামান্য রচনা আপনার পাদস্পর্শে ধন্য হোক – এই প্রার্থনা!

৩১. "এইখানটিতে এসে আমার মনে একটা খটকা লাগছে।...ইতিবৃত্ত রচনা আমার লক্ষ্য না। কিন্তু ইতিবৃত্তীয় লক্ষণগুলো আবশ্যক। অতএব উভয়ের মতই বলে রাখলাম। পাঠকদের বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।" কালকূট : *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩২. "এই ইলাবৃতবর্ষ, তোমাদের এখনকার মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। আধুনিক পামির পূর্বতুর্কিস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত।" কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩৩. কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩৪. কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৩৫. কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৬. সম্ভবত বলার কারণ এটি অনুমাননির্ভর তথ্য, যাচাই বাছাই করা তথ্য নয়। ওড্রদেশ বলতে ওড়িশা এবং লবণদধি বা সমুদ্রতীরবর্তী সূর্য-মন্দির হিসেবে পুরী জেলার বিখ্যাত কোণার্ক সূর্য-মন্দিরের নামই সর্বাগ্রে উচ্চারিত হওয়ার কথা। এটি যুক্তিনির্ভর অনুমান, তথ্যভিত্তিক নয়।

৩৭. সঞ্জীব চক্রবর্তী – 'সূর্য ও সূর্য-প্রতিমা লক্ষণ', ৩০ মে ২০২১, *কৌলাল অনলাইন পত্রিকা*, https://www.koulalpotrika.com/) (বিগ্রহে মূর্তিপুজার প্রচলন হলো ইরান থেকে আগত বৈদেশিক প্রভাবে। বহু আলোচিত হয় শাম্বপুরাণের সূত্রে। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব বর্তমান পূর্ব ইরান বা পুরাণে কথিত শকদ্বীপ থেকে আঠারোটি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পরিবারকে ভারতে নিয়ে এলেন।)

৩৮. "দশ ঋতু অতিক্রম করে, শাম্ব শাকদ্বীপে পৌঁছুলেন। দেখলেন, সে স্থানের অধিবাসীদেরও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি। চোখের রং মিশ্রিত, কৃষ্ণ নীল এবং গোমেধ বর্ণ। অন্তরীক্ষের অধিবাসীদের তুলনায় স্বর্গালোকের দেবতাদিগের সঙ্গেই শাকদ্বীপের মানুষদের সাদৃশ্য বেশি। শাম্বকে সর্বাধিক বিস্মিত করল শাকদ্বীপে মগ ব্রাহ্মণদের বেশবাস। পুরুষদের কাঁধ থেকে পায়ের কনুই পর্যন্ত পোশাকের কোমরে অভিয়ঙ্গের বন্ধন। পায়ে পাদুকা। মাথার ওপরে কপাল পর্যন্ত একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা আবৃত। সকলেরই জটা এবং শ্মশ্রু রয়েছে এবং প্রতিদান পুবন্ধ ও বর্ম ধারণ করে থাকেন।" কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৩৯. "খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষার্ধে চিনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণের ফলে চিন আক্রমণকারী যাযাবর জাতি ইয়ে-চি-র একটি ভাগ পশ্চিমে আরাল সাগরের তীরের স্থানীয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে বাস করতে শুরু করল। এই বিতাড়িত অধিবাসীরাই হল সিথিয়ান, ভারতবর্ষে যাদের বলা হতো শক। একজন চীনা ভ্রমণকারী লিখেছেন, ১২৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আরাল সাগর অঞ্চলে শকদের বদলে ইয়ে-চি-রা বসবাস শুরু করে দিয়েছে। দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিসের রাজত্বকালের স্বল্প সময়টুকুর পর পার্থিয়া আর শকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না। ৮৮

খ্রীস্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর শকরা পার্থিয়া দখল করে নিল। তারপর কোয়েটার কাছে বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়ে শকরা সিন্ধু উপত্যকায় হু হু করে এগিয়ে এসে একেবারে পশ্চিম-ভারতে এসে থামল। তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল দিল্লীর কাছে মথুরা থেকে উত্তরে গান্ধার পর্যন্ত।" রমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

৪০. কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪১. জোসেফ ক্যাম্পবেল, *মিথের শক্তি*, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত, ২০১৮, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ৯

৪২. গোলাম কিবরিয়া, *ইতিহাসতত্ত্ব*, ১৯৮৯, দি সানডে পাবিলিকেশনস্, ঢাকা, গ্রন্থে সালাউদ্দিন আহমদ লিখিত ভূমিকা থেকে ক্রোচের এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে।

৪৩. Albert Camus, *The Myth of Sisyphus and Other Essays*, Translated by Justin O'Brien, 1983, Vintage Books, New York. p.123

৪৪. "ইতিবৃত্ত রচনা আমার লক্ষ্য না।" কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭। "আমি ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছি মাত্র। নির্ঘাত ইতিবৃত্ত লিখতে বসিনি।" কালকূট: *শাম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

নিয়োগযোগ্যতার সহিংসতা: একটি শ্রম-নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

আনন্দ অন্তঃলীন*

সারসংক্ষেপ

নিয়োগযোগ্যতার চিন্তার উন্মেষ ঘটে ১৯৫০-এর দশকে। প্রাথমিকভাবে এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক নীতিমালার পরিবর্তনের সাথে সাথে একটা পর্যায়ে নিয়োগযোগ্যতার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ব্যক্তি পর্যায়ে। অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও সেই কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব বর্তায় ব্যক্তির ওপর। জীবনের শুরুতে শিক্ষাজীবনেই ব্যক্তির ওপর নেমে আসে নিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠার চাপ, যা চলতে থাকে তার বাকি জীবন। এর ফলে তৈরি হয় আত্ম-শোষণ (self-exploitation) ও আত্ম-বিচ্ছিন্নতার (self-alienation) একটি বাস্তবতা। নৃবিজ্ঞানী ও অন্যান্য সামাজিক তাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে নিয়োগযোগ্যতার পর্যালোচনার চেষ্টা করেছেন। শ্রমের নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নিয়োগযোগ্যতার ধারণা ও প্রয়োগও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে পুঁজিবাদী প্রেক্ষাপটে এর অন্তর্নিহিত কাঠামোগত সহিংসতা বিশ্বজনীন।

চাবি শব্দ: নিয়োগযোগ্যতা, শ্রম-নৃবিজ্ঞান, শ্রমবাজার।

ভূমিকা

নিয়োগযোগ্যতা (employability) একটি পরিচিত শব্দ হলেও এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলি। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সাথে পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থায় নিয়োগযোগ্যতার বিভিন্ন অর্থ তৈরি হয়েছে এবং বর্তমানেও 'নিয়োগযোগ্যতা' শব্দটির বিভিন্ন রকমের পর্যালোচনা ও সংজ্ঞার্থ বিদ্যমান।[১] নিয়োগযোগ্যতা বলতে একদিকে যেমন বৃহত্তর শ্রম বাজারে শ্রমিকের পছন্দমতো কাজ খুঁজে নেয়ার সুযোগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, অন্যদিকে তা এমন কিছু আচরণবিধি ও জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করে যা শ্রমিককে শ্রমবাজারে চাকরি ধরে রাখতে এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন, শ্রম অধ্যয়ন, সমাজতান্ত্রিক কিংবা নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বসহ অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ড ও তাত্ত্বিক ধারার প্রত্যেকটিতেই নিয়োগযোগ্যতার বিভিন্ন সংজ্ঞার্থ উপস্থাপিত হয় এবং নিয়োগযোগ্যতা বলতে কী বোঝানো হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে আলোচকের তাত্ত্বিক অবস্থানের ওপর। নিয়োগযোগ্যতা

* প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

একদিকে যেমন বেকারের চাকরি খোঁজার চেষ্টা কিংবা চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তির তুলনামূলক ভালো চাকরি পাওয়ার উপায়, অন্যদিকে তা কিছু আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সমষ্টি যেগুলো ব্যক্তির যথাযথ কাজ/চাকরি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতাকে প্রভাবিত করে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে নিয়োগযোগ্যতা বলতে মূলত প্রচ্ছন্নভাবে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া জীবনযাপন ও আচরণ পদ্ধতিকেই বোঝানো হয়েছে।

১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে পূর্ণ কর্মসংস্থান (full employment) নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগযোগ্যতার ধারণা তৈরি হতে থাকে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় জনগণকে যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য করে তোলা। পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধনশীল বেকারত্ব এবং ১৯৮০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী নব্যউদারনৈতিক শ্রমনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ফলে নিয়োগযোগ্যতা রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত ধারণায়; যেখানে নিজের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার দায়িত্ব শ্রমিকের নিজের। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত রাষ্ট্রের দায়িত্বসমূহ থেকে মনোযোগ সরে আসে কোম্পানি ও কর্পোরেশনের পর্যায়ে। পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতায় শ্রমিক বাধ্য হয় নিজের কর্মসংস্থানের দায় বহন করতে। প্রাথমিকভাবে প্রচার করা হয়েছিল, শ্রমিকশ্রেণি নিয়োগযোগ্যতার গুরুত্ব বুঝতে পারলে তারা নিজেরাই নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে চলবে এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। বাস্তবে তা ছিল, কোনো ধরনের নজরদারি ছাড়াই শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি পরিকল্পনা। একজন 'নিয়োগযোগ্য' শ্রমিক তাকেই বলা হয়, যে নিয়োগকর্তার সকল চাহিদা বুঝতে পারে, সেই চাহিদাগুলো মেনে নেয় এবং সে-অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলে। এতে নিয়োগকর্তার সাথে তার একটি অলিখিত 'মনস্তাত্ত্বিক চুক্তি' সম্পাদিত হয়।[২] এই চুক্তি অনুযায়ী ব্যক্তি বাধ্য হয় শ্রমবাজার ও নিয়োগকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিজের দক্ষতা গড়ে তোলার পাশাপাশি 'আকাঙ্ক্ষিত' শ্রমিক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে।

নিয়োগযোগ্যতার ধারণার এরূপ বিবর্তন একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে তৈরি করে এমন একটি সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধগত কাঠামো, যা ব্যক্তির নিয়োগযোগ্যতাকে পরিণত করে একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতায়। প্রতিযোগিতামূলক ও পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের সহজাত অনিশ্চয়তায় শ্রমিক প্রতিনিয়ত নিজের নিয়োগযোগ্যতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়, সবসময় তার চেষ্টা থাকে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য নিজেকে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী রূপ দেওয়া। এর ফলে শুধু পুঁজির সাথেই তার সংঘাত দেখা দেয় না, অন্য শ্রমিকদের সাথেও তার একটি প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তাতে রাষ্ট্র বা সরকারের প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায় নতুন কাজ/চাকরির সুযোগ তৈরির বদলে শ্রমবাজারে ক্রমাগত শ্রমিকের যোগান নিশ্চিত করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তথা শ্রমবাজারের যোগানের দিকটা (supply-side of the labor market) দেখা। এতে করে কেবল একটি শোষণমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোই তৈরি হয় না, পাশাপাশি তৈরি হয় একটি সাংস্কৃতিক আবহ যা ব্যক্তিকে ক্রমশ বাধ্য করে নিজেকে তার শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে এবং নিজ উদ্যোগেই নিজের ওপর শোষণমূলক

আচরণবিধি চাপিয়ে দিতে। ফলত তৈরি হয় এমন একটি ব্যবস্থা যা শ্রমিকের জন্য আত্ম-শোষণমূলক (self-exploitative) এবং আত্ম-বিচ্ছিন্নতামূলক (self-alienating)।

শিক্ষাজীবন ও নিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠার সূচনা

নিয়োগযোগ্যতার ধারণার সাথে ব্যক্তির প্রাথমিক ও অন্যতম তাৎপর্যবহ বোঝাপড়া শুরু হয় শিক্ষাজীবনে। এক অর্থে পুরো শিক্ষাজীবনকেই ধরে নেওয়া হয় নিজেকে যতোটা সম্ভব নিয়োগযোগ্য করে তোলার সময় হিসেবে, যেখান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা পরবর্তী 'কর্মজীবনে' জীবিকা নির্বাহের উপায় হয়ে উঠবে। অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা – যার উৎপত্তি ঘটেছে শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার পাশ্চাত্য ধারণা থেকে – সকল মানুষকে দেখে সম্ভাব্য শ্রমিক হিসেবে যারা তাদের শিক্ষাজীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত করবে নিজেদেরকে বিদ্যমান শ্রমবাজারের জন্য নিয়োগযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে। শিক্ষাব্যবস্থা ও নিয়োগযোগ্যতার সম্পর্ক বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন দেশেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় শ্রমবাজার ও ব্যক্তির নিয়োগযোগতার কথা মাথায় রেখে, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই শিক্ষাজীবন শেষে যথাযথভাবে নিয়োগযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিজ দায়িত্বে শিক্ষাজীবনে নিজেকে নিয়োগযোগ্য করে তুলতে হয়।

জাতিসংঘের তরুণ কর্মসংস্থান নেটওয়ার্ক (Youth Employment Network)-এর ২০০৩ সালের একটি প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়, প্রত্যেক দেশই যেন তাদের শিক্ষাব্যবস্থা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং শ্রমবাজারকে এমনভাবে পুনর্গঠন করে যাতে তা শিক্ষাজীবন থেকে কর্মজীবনে উত্তরণ সহজ করে তোলে। আরো বলা হয়, প্রত্যেক তরুণেরই দায়িত্ব চাকরিক্ষেত্রে আবশ্যক কিছু দক্ষতা আয়ত্ত করে নেওয়া, যাতে তারা আরো বেশি নিয়োগযোগ্য হয়ে উঠতে পারে; একই সাথে বর্তমানের জ্ঞান ও দক্ষতা-ভিত্তিক সমাজে কাজ করে বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। এই প্রতিবেদন মতে সরকারের মুখ্য দায়িত্ব নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা নয়, বরং নিরবচ্ছিন্নভাবে 'দক্ষ' শ্রমিক সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এ ধরনের নব্যউদারনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় এবং শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে শ্রমিক বা চাকরিজীবী উৎপাদনের কারখানা। বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও পরিচালিত হয় অনুরূপ চিন্তা মাথায় রেখে। শিক্ষাজীবন থেকে মানুষকে চাকরিজীবী হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া কেবল আরোপিত নীতিমালার মাধ্যমে ঘটে না, বরং এটি একটি সংস্কৃতি যা মানুষ আত্মস্থ করে নেয়। এবং এই সংস্কৃতি ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব ও সমাজের কাঠামোতে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাথে আর মূল্যবোধ, সহমর্মিতা, সমবায়ের মতো সামাজিক মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক থাকে না; তা প্রতিস্থাপিত হয় বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা দ্বারা।

ক্যারল ব্ল্যাক তাঁর ২০১০ সালের তথ্যচিত্র Schooling the World-এ দেখান কীভাবে পুঁজিবাদী বাজারের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ভারতের লাদাখ অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ক এই তথ্যচিত্রে দেখানো হয়, পুঁজির সম্প্রসারণের ফলে কীভাবে মানুষের আচার আচরণে পরিবর্তন ঘটেছে এবং মানুষের মধ্যে ক্রমশ 'উৎপাদনক্ষম' বা productive হয়ে ওঠার

চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে লাদাখ অঞ্চলে সহানুভূতি, সহাবস্থান, সমবায়, সহযোগিতার প্রথাগত বুদ্ধবাদী শিক্ষার স্থান দখল করে নিচ্ছে অর্থ, বেতন-মজুরি, মুনাফার পুঁজিবাদী শিক্ষা। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ, বিশ্বাসের মতো অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানে পরিবর্তন আসছে, একই সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও পারিবারিক কাঠামোতেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। অধিকাংশ মানুষই শহরের মজুরি শ্রম তথা চাকরির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে উদগ্রীব এবং শিশুকাল থেকেই তাদের তৈরি করতে থাকা হয় মুম্বাই, চেন্নাই বা কলকাতার মতো বড় শহরগুলোতে নিয়োগযোগ্য করে তোলার চিন্তা মাথায় রেখে।

শিক্ষাজীবন থেকেই ব্যক্তিকে নিয়োগযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়া কেবল শিক্ষায়তনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হয় না; পাঠক্রম বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েও ব্যক্তিকে ক্রমশ নিয়োগযোগ্য করে তোলার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা জারি থাকে।[৩] এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে কেবল অ্যাকাডেমিকভাবেই নিয়োগযোগ্য করে তোলা হয় না, তার আগ্রহ, শখ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণসহ সবকিছুকেই তৈরি করতে হয় ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে তাকে খানিকটা এগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। এভাবেই শিক্ষাজীবনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে নিজেকে যথাযথভাবে নিয়োগযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বেকারত্ব কিংবা নিম্ন-মানের, স্বল্প মজুরির পেশা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে বোঝানো হয় যে, যদি তারা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয় তা পরবর্তীকালে তার সিভিতে (CV) নতুন মাত্রা যোগ করবে। এ প্রসঙ্গে অ্যাডর্নোর বক্তব্য স্মরণ করা যায়। তিনি মনে করেন পুঁজিবাদী, মুনাফা-কেন্দ্রিক মানসিকতা সবকিছুকেই একটা পর্যায়ে মজুরি শ্রমের অংশ করে ফেলতে চায় এবং সামাজিক বাস্তবতার চাপে ব্যক্তির অবসর সময় বা উপভোগের সময়টাও ব্যবহার করতে চায় নিজেকে নিয়োগযোগ্য করে তুলতে।[৪] একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তার পছন্দের পাঠক্রম বহির্ভূত কর্মকাণ্ড যেন ভবিষ্যতে চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কর্মজীবনে 'এগিয়ে যাওয়ার' ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী হয়। বারবার তাকে প্রশ্ন করা হতে থাকে যে, তার বেছে নেওয়া কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে তার পেশাগত পরিকল্পনার সম্পর্ক কী; কিংবা সে যে সকল কাজ করছে, সেগুলো কীভাবে তার পেশাগত অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরে নেওয়া হয় বিতর্ক করা একজনকে গড়ে তুলবে সুবক্তা হিসেবে যা চাকরিজীবনে 'যোগাযোগ দক্ষতা' (communication skill) হিসেবে স্বীকৃত হবে; কিংবা খেলাধুলায় আগ্রহ ব্যক্তিকে চাকরিজীবনে দলবদ্ধ কাজ বা টিমওয়ার্কে দক্ষ করে তুলবে। এইভাবে পাঠক্রম বহির্ভূত কর্মকাণ্ডসহ শিক্ষাজীবনের যাবতীয় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সাথে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়, শেষপর্যন্ত যার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে নিয়োগযোগ্য করে তোলা।

সেবাখাতের নিয়োগযোগ্যতা

প্রাথমিকভাবে নিয়োগযোগ্যতার ধারণাকে নির্দিষ্ট কিছু শ্রমের সাথে সম্পর্কিত মনে করা হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিবিধ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের বাস্তবতার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে নিয়োগযোগ্যতার ধারণা সর্বত্রই বিদ্যমান। এলসন ও পিয়ারসন আমাদের দেখান, নারীর

শারীরিক গঠন ও মনস্তাত্ত্বিকতার ব্যাপারে সমাজে কিছু পূর্বানুমান প্রচলিত থাকার কারণে কীভাবে তাদেরকে হালকা শিল্পে (light industry) অধিক নিয়োগযোগ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।[৫] অন্যদিকে, হর্টন দেখান কীভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার ফলের খামারগুলোতে নিযুক্ত তরুণ পুরুষ শ্রমিকেরা নিজেদের পুরুষত্ব জাহির করার মাধ্যমে তীব্র আবহাওয়ায় নিজেদের কাজ করার ক্ষমতা তথা নিয়োগযোগ্যতার জানান দেয়।[৬] আবার দে জেনোভা এটাও দেখান, যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত অবৈধ অভিবাসীদের 'নির্বাসন/বিতাড়নযোগ্যতা' (deportability) তাদেরকে একটি দুর্বল, প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে জিইয়ে রাখে এবং এর ফলে কীভাবে তাদেরকে প্রতিনিয়ত শোষণ, নির্যাতন করে যাওয়া সহজ হয় এবং তারা হয়ে ওঠে অধিক নিয়োগযোগ্য।[৭] অর্থাৎ নিয়োগযোগ্যতার সংজ্ঞার্থ নির্ধারিত হয় প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এবং ব্যক্তির নিয়োগযোগ্যতা একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় শ্রম নীতিমালা, বৈষম্য ও নানাবিধ কাঠামোগত সহিংসতা দ্বারা পরিচালিত, অন্যদিকে তার জ্ঞাতি পরিচয়, লিঙ্গ, বয়স, প্রভৃতিও তার নিয়োগযোগ্যতার ওপর প্রভাব ফেলে।

সকল ধরনের শ্রমেই নিয়োগযোগ্যতার ধারণা থাকলেও, তা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় সেবাখাতে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে পৃথিবীর ৫০% ও বাংলাদেশের ৪১% শ্রমিক সেবাখাতে নিযুক্ত। শিল্প ও কৃষিখাতে প্রযুক্তির অগ্রগতি ও প্রয়োগ বৃদ্ধির ফলে সেবাখাতে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটা বড় অংশই গড়ে উঠেছে এই বর্ধনশীল খাতে শ্রমিক সরবরাহের প্রতি মনোযোগ রেখে। সেবাখাতে কোনো পণ্য বিনিময় হয় না, বরং অর্থের বিনিময়ে শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। গ্রাহককে নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের পাশাপাশি শ্রমিককে তার আচরণ, আবেগ, মনোভাব, বিশ্বাসসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হয় এবং নিয়োগকর্তার ইচ্ছা মাফিক সেগুলোর 'কাঙ্ক্ষিত ও যথাযথ' বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়।

সেবাখাতের বিভিন্ন অংশে নিয়োগযোগ্যতার ধারণা বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় এবং নিয়োগযোগ্যতা সংক্রান্ত সহিংসতার মাত্রাও নির্ভর করে নির্দিষ্ট শ্রমবাজারের গতিপ্রকৃতির ওপর। সেবাখাতে নিযুক্ত শ্রমিক বা চাকরিজীবীদের শ্রমের পর্যালোচনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী হশচাইল্ড আবেগজনিত শ্রমের (emotional labor) ধারণা প্রণয়ন করেন।[৮] আবেগজনিত শ্রম হলো শ্রমের এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শ্রমিক তার চাকরির দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য নিজের ও ক্রেতা/গ্রাহকের আবেগ, অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কর্মক্ষেত্রে (ও গ্রাহকের কাছে) আকাঙ্ক্ষিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বিমানবালা বা রিসেপশনিস্টের হাসিমুখ, দুর্বিনীত গ্রাহকের সঙ্গে একজন কেরানির ধৈর্যশীল আচরণ, রেস্তোরাঁর ওয়েটারের প্রাণবন্ত, অমায়িক কথোপকথন – সবই বিভিন্ন ধরনের আবেগজনিত শ্রমের উদাহরণ। সেবাখাতে মালিকের প্রবৃদ্ধি ও মুনাফা নির্ভর করে শ্রমিকদের সদাচরণ ও গ্রাহকের সন্তুষ্টির ওপর। এখানে নিজেকে নিয়োগযোগ্য করে তোলার অর্থ কেবল কাজে দক্ষতার প্রমাণ দেওয়া নয়, তা একই সাথে নিজের (কখনো কখনো গ্রাহকের) আবেগজনিত বিবিধ বিষয় ও আবেগের বহিঃপ্রকাশের ওপরও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসা।

সিয়ান লাজার সেবাখাতের আবেগজনিত শ্রম বা চাকরিকে দেখেছেন সম্পর্ক নির্মাণের শ্রম হিসেবে – যেখানে চাকরিজীবী বা শ্রমিকের কাজের অংশই হলো ক্রেতা বা গ্রাহকের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করা।[৯] অনেক সময় এই সুসম্পর্ক তৈরির পদ্ধতি হয়ে ওঠে নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন আরেকটি সত্তা তৈরি করা, যা গ্রাহকের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য। অনীশ দেখান, কীভাবে ভারতীয় কল সেন্টারগুলোর কর্মচারীদের শেখানো হয় তাদের ভারতীয় উচ্চারণভঙ্গি ত্যাগ করে একটা 'প্রশমিত উচ্চারণভঙ্গিতে' (neutral accent) কথা বলতে, যা ইংরেজিভাষী গ্রাহকদের কাছে অধিক শ্রুতিমধুর ও গ্রহণযোগ্য।[১০] অন্যদিকে, মানকেকার ও গুপ্ত দেখান, কল সেন্টারগুলোতে কীভাবে প্রতি মুহূর্তে হাসিমুখে থাকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।[১১] কর্মচারীদের শেখানো হয়, গ্রাহকের সকল প্রকারের চাহিদা, আবদার (যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক), প্রশ্ন হাসিমুখে সামলানোর পাশাপাশি ক্রেতার অসৌজন্যমূলক আচরণ, গালিগালাজ, কিংবা যৌন হয়রানিও হাসিমুখে মেনে নিতে। কিম্বার্লি হোয়াং আবেগজনিত শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন – প্রকাশ্য (expressive) এবং অবদমিত (repressive)।[১২] অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত আবেগ, অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো যেমন সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের দায়িত্ব, আবার গ্রাহকের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত আবেগ, অনুভূতিকে চাপা দিয়ে রাখাও তার কাজের একটা অংশ। জাপানের নাইটক্লাবগুলোতে কর্মরত ফিলিপিনীয় নারী কর্মচারীদের ওপর গবেষণায় পারেনিয়াস দেখান, কীভাবে পুরুষ ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠতার ভান করতে পারার ওপর নির্ভর করে তার চাকরির নিশ্চয়তা[১৩] – যা প্রকাশ্য আবেগজনিত শ্রমের একটা উদাহরণ। অন্যদিকে, নিউ ইয়র্কের বিউটি পার্লারগুলোতে কর্মরত কোরিয়ান নারীদের ওপর মিলিয়ান ক্যাংয়ের গবেষণায় উঠে আসে অবদমিত আবেগজনিত শ্রমের বর্ণনা।[১৪] এই পার্লার বা স্যালনগুলোতে কর্মরত নারীদের কাজ করতে হয় তাদের গ্রাহকদের শরীরের ওপর এবং তাও খুব কাছ থেকে। ক্যাংয়ের সাক্ষাৎকারগুলোতে উঠে আসে সেখানে কর্মরত নারীরা কীভাবে তাদের গ্রাহকদের মুখ বা গায়ের গন্ধ, নোংরা হাত-পা ও নখ, ফেটে যাওয়া ত্বক ইত্যাদির প্রতি ঘেন্না সহ্য করে তাদের কাজ চালিয়ে যায় এবং তদুপরি তাদের কাজের অংশ হিসেবে গ্রাহকদের সাথে যথাসম্ভব সৌজন্যমূলক আচরণ করার চেষ্টা করতে থাকে। একটি এয়ারলাইন্সে বিমানবালাদের প্রশিক্ষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে হশচাইল্ড[১৫] দেখান কীভাবে তাদেরকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেওয়া হয়, 'Smile like you mean it'। অর্থাৎ পরিস্থিতি যতোই খারাপ হোক, বিমানবালার ব্যক্তিগত জীবন বা মানসিক অবস্থা যতোই অস্থিতিশীল হোক, কিংবা গ্রাহকের আচরণ যতোই রূঢ় হোক না কেন, বিমানবালাদের প্রতিনিয়তই হাসিমুখ ধরে রাখতে হবে এবং তা এমন ভাবে করতে হবে যেন সে-হাসি প্রতি মুহূর্তেই 'আন্তরিক' মনে হয়।

সেবাখাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আরো যে বিষয়টি রয়েছে, তা হলো অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা। যদিও শ্রমবাজারের সকল খাতই বর্তমানে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার নিষ্পেষণে জর্জরিত,[১৬] সেবাখাতে এই বিষয়টি আরো বেশি প্রকট। এখানে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার চাপ কেবল নিম্নপদস্থ চাকরিজীবী বা শ্রমিকদেরই প্রভাবিত করে না, উচ্চপদস্থ চাকরিজীবীদের জন্যও তা হয়ে উঠেছে একটি সমস্যা। এই চাপ শুধু চাকরিজীবীদেরকে মেনে নিতেই বাধ্য করা হয় না, অনেক সময় তাদেরকে ওভারটাইম কাজের জন্য যথাযথ মজুরি থেকেও বঞ্চিত করা হয়। কর্মক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময়

কাজ করে যাওয়াকে নিয়োগকর্তারা দেখেন 'বাড়তি প্রচেষ্টা' (extra effort) হিসেবে যা চাকরিজীবীর নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রমদানের মাধ্যমে চাকরিজীবীকে প্রমাণ করতে হয় সে তার কাজে যথেষ্ট আগ্রহী এবং নিয়োগদাতার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সে তার চুক্তিবদ্ধ কর্মঘণ্টার চেয়েও বেশি সময় কর্মক্ষেত্রে কাটাতে সমর্থ (এমনকি আগ্রহীও বটে)। প্রতি মুহূর্তে ঊর্ধ্বতনের দাবি, আবদার, বা হুকুম পালনে উপস্থিত থাকাটাকে ধরে নেওয়া হয় চাকরিজীবীর নিয়োগযোগ্যতার একটি মাপকাঠি হিসেবে।[১৭] কেবল নিয়োগকর্তাই নয়, গ্রাহকের সেবায় সবসময় উপস্থিত থাকাটাও হয়ে ওঠে একজন কর্মঠ, মনোযোগী, একনিষ্ঠ চাকরিজীবীর বৈশিষ্ট্য। জনাথান ক্র্যারি তাঁর ২০১৩ সালের বই *24/7: Late Capitalism & the End of Sleep*-এ দেখান কীভাবে '২৪/৭' তথা দিনে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিন সেবা দেওয়ার ধারণা পুরো সেবাখাতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কীভাবে তা ব্যক্তিজীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলছে।[১৮] অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চাকরিজীবীকে অফিসের কাজ বাসায়ও নিয়ে যেতে হচ্ছে, যা একটা পর্যায়ে ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যেকার বিভাজনকে অস্পষ্ট করে ফেলে। অন্যদিকে গ্রাহক ও ক্রেতারাও এই '২৪/৭'-এর ধারণা মাথায় নিয়ে সর্বক্ষণ সর্বোৎকৃষ্ট মানের সেবা আশা করে থাকে এবং ব্যক্তিজীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, আহ্লাদের কথা ভুলে গিয়ে নিয়োগযোগ্যতার চাপে সেবাদানকারীকেও হাসিমুখে তার চাকরি করে যেতে হয়। কারণ অতিরিক্ত কাজের ফলে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়াটাও মালিকের কাছে অনিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠার সমার্থক।

জন মেইনার্ড কেইনস তাঁর ১৯৩১ সালের প্রবন্ধ 'The Economic Possibilities for Our Grandchildren'-এ ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন, যে হারে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটছে তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে মানুষের কর্মসপ্তাহ হবে ১৫ ঘণ্টার এবং তাতেই মানুষের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে ও সকলের জন্য উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।[১৯] কেইনস উৎপাদনক্ষমতার কথা ভাবলেও পুঁজিপতিদের মুনাফা প্রীতির কথা বিবেচনায় নেননি। এর ফলে যদিও উৎপাদনের দিক থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু মানুষের কর্মঘণ্টা কমেনি বরং অনেকক্ষেত্রে বেড়েছে। পুঁজিবাদের সংস্কৃতিতে প্রতিনিয়ত কাজ (চাকরি বা অন্যান্য মজুরি শ্রম অর্থে) করাকে দেখা হয় সভ্যতা, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পরিচায়ক হিসেবে এবং কর্মঘণ্টা হ্রাস করার ধারণা পুঁজিপতিদের কাছে কেবল উদ্ভটই নয়, তা রীতিমতো পাপের সমতুল্য। কর্মঘণ্টা হ্রাস না-করার চিন্তা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক (যেহেতু তা প্রতিনিয়ত মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি করে চলে) একই সাথে তা রাজনৈতিকও বটে।[২০] ডেভিড গ্রেবার তাঁর *Bullshit Jobs* বইয়ে দেখান কীভাবে কর্মঘণ্টা হ্রাস করে শ্রম ও সম্পদের যথাযথ বণ্টন না-করে মানুষকে প্রতিনিয়ত চাকরি করে যেতে বাধ্য করার মাধ্যমে আসলে পুঁজিপতি ও ক্ষমতাসীনেরা ব্যক্তির চিন্তাশীলতা ও সৃষ্টিশীলতাকে অবদমন করতে চায়। কারণ অবসর সময় মানুষকে চিন্তার সুযোগ করে দেবে এবং চিন্তাশীল মানুষ সবসময়ই ক্ষমতাকাঠামোর জন্য ক্ষতিকর। কেইনস যে প্রযুক্তিকে মানুষের মুক্তি ও সমৃদ্ধির পথ হিসেবে দেখেছিলেন, সেই প্রযুক্তিই বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তির ওপর নিয়োগযোগ্যতার চাপ সৃষ্টিতে। ডিজিটাল যোগাযোগ পদ্ধতির ফলে কেউই প্রকৃত অর্থে কর্মক্ষেত্র থেকে নিস্তার পায় না। '২৪/৭'-এর সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ পদ্ধতির তাৎক্ষণিকতা

(instantaneity) ব্যক্তিকে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতে বাধ্য করে – তা মালিকের জন্য হোক কিংবা গ্রাহক/ক্রেতার জন্য। প্রতি মুহূর্তে কাজে উপস্থিত থাকতে পারাটাও (সশরীরে কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে) বর্তমানে সেবাখাতে ব্যক্তির নিয়োগযোগ্যতা বজায় রখার একটি পূর্বশর্ত। জর্জ উডকক[২১] এটিকেই বলতে চেয়েছেন 'ঘড়ির স্বৈরাচার' (tyranny of the clock)। উডকক মনে করেন, এককালে মানুষের সময়জ্ঞান ছিল প্রকৃতি নির্ভর এবং তাদের কর্মঘণ্টা, কর্মসপ্তাহ, এমনকি কাজ করার মৌসুমও নির্ধারিত হতো সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঋতু পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু পুঁজিবাদের উদ্ভব অন্য সবকিছুর মতো সময়কেও একটি পণ্যে পরিণত করে ফেলে যাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায়, অন্যান্য পণ্যের মতোই অর্থের বিনিময়ে কেনা-বেচা করা যায়। এর ফলে মালিক বা নিয়োগকর্তার কাছে সময় হয়ে ওঠে আরেকটি উৎপাদন খরচ যা সে শ্রমিকের থেকে যতোটা সম্ভব আদায় করে নিতে চায়। অন্যদিকে শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে যতোটা সম্ভব সময় দেওয়ার প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে নিজের নিয়োগযোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার একটা উপায়।

সেবাখাতের মূল লক্ষ্যই হলো 'গ্রাহকের সন্তুষ্টির' ওপর জোরারোপ করার মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করে চলা। সেবাদানকারীকে একদিকে যেমন নিজের আবেগ অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হয় ও নির্ধারিত আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়, অন্যদিকে তার সময়ের ওপরও যেন নিয়োগকর্তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে শ্রমিক/চাকরিজীবীদের যেমন গ্রাহক, ক্রেতা ও নিয়োগকর্তার সকল প্রকারের অসদাচরণ, অপব্যবহার ও অনধিকার চর্চা সহ্য করে যেতে হয়, একই সাথে চাকরি প্রাপ্তি ও রক্ষার জন্য তাকে তৈরি করতে হয় নিজের ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সত্তা; যে সত্তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে নিয়োগযোগ্য করে রাখা।

স্থানীয় প্রেক্ষাপটে নিয়োগযোগ্যতার বাস্তবতা

নিয়োগযোগ্যতার ধারণার সাথে অর্থনৈতিক কাঠামো, মূল্যবোধসহ সার্বিক জীবনযাপন পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই পশ্চিমা বিশ্বের নিয়োগযোগ্যতার ধারণা পৃথিবীর সকল সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একইভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা অনেকটাই অকার্যকর হবে। তবে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ যেখানে শ্রমবাজারসহ প্রায় সবকিছুকেই সমসত্ত্বতার (homogeneity) দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাতে নিয়োগযোগ্যতার ধারণার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সব জায়গাতেই লক্ষ করা সম্ভব। যার প্রভাব শ্রমবাজার থেকে শিক্ষাখাত পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়োগযোগ্যতার ধারণার সাথে শ্রমিকের 'দক্ষতা' ও 'দক্ষতা উন্নয়ন' সংক্রান্ত বিষয়াবলি জড়িত রয়েছে। এর ফলে নীতি নির্ধারকেরা এক প্রকারের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রমনীতি ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের ওপর জোরারোপ করে থাকেন। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বিধিমালা, ২০২০ থেকে সেই চিত্রটিই ফুটে ওঠে।

এই আইন বা বিধিমালা তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের' সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা ও একই সাথে দেশে ও বিদেশে সেই জনশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। ২০২০ সালের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বিধিমালায় বিদ্যমান সংকট হিসেবে বেশ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা

হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক অবহেলা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং সেই অভাব মোকাবিলায় শ্রমশক্তির আমদানি। এই সংকটগুলো পারস্পরিক সম্পর্কিত এবং এর সমাধান হিসেবে শ্রমিকের নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির রাষ্ট্রীয় কর্মপরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে এই দক্ষতা বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য সেখানে বেকারত্ব হ্রাস করার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও মজুরির হার বাড়ানো। এখানে মূলত উৎপাদন ও সেবাখাতের শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির কথাই বলা হয়েছে। জাতীয় এই বিধিমালায় দক্ষতা তথা skill-এর সংজ্ঞার্থ হলো[২২],

> Skill includes the knowledge and technique acquired for doing any specific work, or the capability and ability to produce goods and services as per required standard of industrial and professional demand of national and international markets.

এই সংজ্ঞার্থে সেবা ও পণ্য উৎপাদনের দক্ষতা ও যোগ্যতা সংক্রান্ত ধারণা বিবেচিত হলেও ব্যক্তির কর্মসংস্থান ও নিয়োগযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত জৈব-মনস্তাত্ত্বিক, মূল্যবোধগত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো বিবেচিত হয়নি। কেন্দ্রীয়ভাবে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা নির্ণয়ের একটি সর্বজনীন মানদণ্ড তৈরি করা হয় যার মূল চালিকা শক্তি হলো ক্রম-পরিবর্তনশীল বাজার অর্থনীতি। এরূপ প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যায় শ্রমবাজারের নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রমের সরবরাহ বজায় রাখতে। ফলে ব্যক্তি বাধ্য হয় একটি নির্ধারিত মানদণ্ডে নিজের যোগ্যতা যাচাই করতে নয়তো 'অদক্ষ' রয়ে যেতে। বাংলাদেশে শ্রমবাজার সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় আইন, নীতিসমূহে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বাস্তবতা, প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলোর দিকে মনোযোগ সেই অর্থে নেই। প্রযুক্তির কারণে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেলেও তার সুফল ভোগ করে মালিক শ্রেণি, শ্রমিকের কর্মঘণ্টা বা মজুরির ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। ব্যক্তির নিয়োগযোগ্যতার ধারণা ক্রমশ পাল্টাতে থাকে, কিন্তু কর্মজীবনের বাইরে তার পূর্ণ মানবিক বিকাশের ওপর আলোচনা রয়ে যায় অনুপস্থিত। এরূপ বিধিমালা ও আইন ব্যক্তিকে এমন একটি শ্রমবাজারের জন্য নিয়োগযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নেয় যা বৈশিষ্ট্যগতভাবেই শ্রমিকের কল্যাণের প্রতি উদাসীন।

কাগজে-কলমে নিয়োগযোগ্যতার সাথে কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ, শিক্ষাগত যোগ্যতার মতো বিষয় তুলে ধরা হলেও এর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়। বাস্তবে নিয়োগযোগ্যতা এসকল বিষয়ের পাশাপাশি অসংখ্য সূক্ষ্ম, অস্থিতিশীল বিষয়ের ওপরও নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় আইন, বিধানসমূহ শ্রমবাজারের চাহিদা-যোগানের যে ধরনের ভারসাম্য বিধানের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তা পুঁজিপতিদের মুনাফা প্রীতির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বিধিমালা, ২০২০-এর লক্ষ্য বা মিশন স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে,

> People's employability and competitiveness in the national and international labour markets will be increased for better earnings taking into account the importance of adaptability to the technologically changing world of work.

কিন্তু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে যতোই দ্রুতগতির ও কার্যকরী করে তুলুক না কেন, যতোদিন সেই প্রযুক্তি মালিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে রয়ে যাচ্ছে, ততোদিন কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা থেকে শ্রমিকের মুক্তি ঘটা সম্ভব নয়। দিনশেষে শ্রমিকের কাজ ও অনিবার্যভাবে বেঁচে থাকা নির্ভর করে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে যাওয়া পরিস্থিতির ওপর। সেখানে নিয়োগযোগ্যতা গঠন ও বজায় রাখা একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে শ্রমবাজারের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের মতো বাহ্যিক বিষয়গুলোও সেটিকে প্রভাবিত করে চলে।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তি ও নিয়োগযোগ্যতা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের পেছনে সবচেয়ে প্রভাব রাখে আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলোর আরোপিত চিন্তাধারা। তাদের বিধান ও আদর্শ যেমন ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, একই সাথে তাদের ঘরানার চিন্তাধারা এতোটাই ক্ষমতাশালী ও পরিব্যাপ্ত যে তা সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়। নব্যউদারনৈতিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিকে শিক্ষাজীবন থেকেই নিয়োগযোগ্য করে তুলতে চাওয়ার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও দৃশ্যমান। এ ধরনের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুঁজিপতি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর কাছ থেকেই আসতে থাকে। এর সাংস্কৃতিক ভিত্তি এতোটাই শক্তিশালী যে একটা পর্যায়ে নিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠার বিকল্পের কথাও মানুষ আর ভাবতে পারে না। এ দেশের অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্যতার সাথে বোঝাপড়াও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের চিন্তাধারার সমান্তরাল। নিয়োগযোগ্যতা সংক্রান্ত যে সকল অ্যাকাডেমিক গবেষণা পরিচালিত হয়, সেগুলো নব্যউদারনৈতিক বাজার অর্থনীতির ভাবাদর্শের সাথে মিল রেখেই হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিয়োগযোগ্যতার অ্যাকাডেমিক গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দেশনামূলক (prescriptive)।[২৩] যেখানে গবেষকদের মূল বক্তব্য হলো, ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ কিংবা কীভাবে শিক্ষাজীবনের সাথে চাকরি জীবনের সম্পর্ক তৈরি করা যায় তার প্রস্তাবনা।

পুরো বিষয়টি কেবল বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের গাণিতিক হিসাব-নিকাশ নয়। এর সাথে আলস্য, কর্মদক্ষতা, যোগ্যতার মানদণ্ড, কর্মঘণ্টা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার মতো সাংস্কৃতিক বিষয়াবলিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যা বারবার উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বৈশ্বিক পুঁজিবাদী প্রেক্ষাপটের চেয়ে বিশেষভাবে আলাদা কিছু নয়। বরং বিপুল জনসংখ্যা, কর্মসংস্থানের স্বল্পতা, চাকরির সামাজিক মর্যাদার মতো ব্যাপারগুলো বাংলাদেশে নিয়োগযোগ্যতার বিষয়টিকে করে তুলেছে অনেক বেশি গুরুত্ববহ। যেখানে মূলধারার চিন্তা সর্বদাই ব্যক্তি ও শ্রমিকের নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির ওপর মনোনিবেশ করে। এর কাঠামোগত সহিংসতার দিকগুলো বিবেচনার অংশও হয়ে উঠতে পারে না।

আত্ম-বিচ্ছিন্নতা ও আত্ম-শোষণের কাঠামোগত সহিংসতা

যে চিন্তা থেকে নিয়োগযোগ্যতা সংক্রান্ত ধারণাগুলো প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে ছিল জনগণকে উৎপাদনশীল করে তোলা, শ্রমিকের ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। ধারণা করা হয়েছিল নব্যউদারনৈতিক অর্থনীতিতে শ্রমিক নিজ উদ্যোগেই নিজের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে এবং চাকরি করে যাওয়ার 'ফিটনেস' বা যোগ্যতা সে নিজে থেকেই রক্ষা করবে। তবে পরিবর্তনশীল মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতি ও অস্থিতিশীল শ্রমবাজারে কে কোন ক্ষেত্রে কতটুকু

নিয়োগযোগ্য হবে বা হয়ে উঠবে এবং নিয়োগযোগ্যতা বলতে আসলে কী বোঝানো হবে সে-ব্যাপারে কোনো একরৈখিক, সর্বজনীন সংজ্ঞার্থ তৈরি করা একটি জটিল প্রক্রিয়া। ফলে নিয়োগযোগ্যতার প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয়নি, তদুপরি নিয়োগযোগ্যতা শ্রমিকের শোষণে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। মালিক বা নিয়োগকর্তার নজরদারির বদলে শ্রমিক নিজে থেকেই নিজের আচরণ, গতিবিধি ও উৎপাদনশীলতার দিকে মনোযোগ দেয় এবং নিজের নিয়োগযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য সহকর্মীদের ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। এই দিক থেকে নিয়োগযোগ্যতা হলো এক ধরনের আত্ম-নজরদারি (self-surveilance), আত্ম-ব্যবস্থাপনা (self-management), কিংবা আত্ম-শাসনের (self-governance) ব্যবস্থা। মালিক, নিয়োগকর্তা বা ম্যানেজারের এই নজরদারি ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়ে তার ব্যক্তিজীবনেও প্রবেশ করে এবং একটা পর্যায়ে নিয়োগযোগ্যতার চাপে চাকরিজীবী নিজেই নিজের আচরণ, ভাবাবেগ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড তার ঊর্ধ্বতনের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক গড়ে তুলতে থাকে। এর ফলে ব্যক্তির রাজনৈতিক বক্তব্য, শখ, খাদ্যাভ্যাসসহ সবকিছুই হয়ে ওঠে ব্যক্তিকে নিয়োগযোগ্যতা মূল্যায়নের মাপকাঠি, নয়তো তাকে চাকরিচ্যুত করার কারণ। একেই এলিজাবেথ অ্যান্ডারসন অভিহিত করেছেন 'অপ্রকাশ্য শাসক' (private government) হিসেবে।[২৪] এর ইতিহাসও বেশ পুরনো। ফোর্ড মোটর কোম্পানি ১৯১৪ সালে একটি 'সমাজবৈজ্ঞানিক বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করে যার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের বাড়িতে তদন্তকারী পাঠিয়ে শ্রমিকদের বাড়ির পরিচ্ছন্নতা, পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও খাদ্যাভ্যাসের পর্যালোচনা করা। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে ২০১০ সালে প্রণীত Affordable Care Act (ACA) নামক আইনের মাধ্যমে বর্তমানেও শ্রমিক বা চাকরিজীবীদের নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার, নিয়মিত শরীরচর্চা করার ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে পরোক্ষভাবে চাপ দেওয়া হয়।[২৫]

নিয়োগযোগ্যতা বজায় রাখার চাপ শুধু বাইরে থেকেই আসে না। নিয়োগযোগ্যতাকে দেখা যেতে পারে একটি সংস্কৃতি হিসেবে যা মানুষ আত্মস্থ করে নেয়, যা তাকে আত্মস্থ করতে শেখানো হয়। এর শুরু হয় শিক্ষাজীবনে এবং পরবর্তীকালে চাকরিতে প্রতিনিয়ত তাকে শিখে যেতে হয় কীভাবে মালিকশ্রেণির পরিবর্তনশীল চাহিদাকে যথাযথভাবে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে সে চাকরি করে যেতে পারবে। এই দিক থেকে নিয়োগযোগ্যতাকে বলা যেতে পারে আত্ম-নজরদারির একটি কাঠামো। গারাভান (১৯৯৯) নিয়োগযোগ্যতাকে উল্লেখ করেছেন নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যেকার একটি 'মনস্তাত্ত্বিক চুক্তি' (psychological contract) হিসেবে।[২৬] এই চুক্তি অনুযায়ী চাকরি পাওয়া এবং চাকরি ধরে রাখার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব বর্তাবে শ্রমিকের ওপর। একই সাথে এটাও ধরে নেয়া হয়, ব্যক্তি নিজের কর্মজীবন ও নিয়োগযোগ্যতার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করতে আগ্রহী এবং সে তা করতে সমর্থ।[২৭] অন্যদিকে বুম (২০১৩) নিয়োগযোগ্যতাকে দেখেছেন একটি 'সাংস্কৃতিক ফ্যান্টাসি' হিসেবে যেখানে শ্রমিক নিজেকে শোষণ করাকে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে মেনে নেয় এবং মনে করে সে যতো বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারবে ততটাই নিয়োগযোগ্য হয়ে উঠবে।[২৮] পুরো ধারণাটির মূলেই রয়েছে অনিশ্চিত শ্রমবাজারে নিজের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার চিন্তা। নিয়োগযোগ্যতা ব্যক্তিকে বাধ্য করে সমসাময়িক বাজার ও নিয়োগকর্তাদের পরিবর্তনশীল চাহিদার

সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে। স্পষ্টতই এটি ক্ষমতায়নের কোনো রূপ নয়, বরং তা শ্রমিক শোষণের হাজার বছরের প্রথার নতুন কাঠামো। যেখানে একজন ব্যক্তির নিয়োগযোগ্যতা নির্ভর করে বাজারের যৌক্তিকতা (market rationality) ও মুনাফা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ওপর, সেখানে ব্যক্তির পক্ষে কখনোই যথেষ্ট নিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।[২৯] স্বাধীনতা ও স্বশাসনের প্রতি মানুষের অন্তর্নিহিত বাসনাকে নিয়োগযোগ্যতার ধারণা এমন একটি বিভ্রমে পরিণত করে যার ফল হচ্ছে আত্ম-শোষণ এবং আত্ম-বিচ্ছিন্নতা, যেখানে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির নিজের কর্মজীবনের দুর্দশার জন্য নিজেকে দায়ী করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

আমাদের এটাও বুঝতে হবে, নিয়োগযোগ্যতা একটি পুঁজিবাদী, কর্পোরেট পরিকল্পনা ও কৌশল। নিয়োগযোগ্যতার ধারণার মধ্য দিয়ে একটি আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীন শ্রমিক শ্রেণি তৈরি করা হয় যেখানে শ্রমিকেরা কর্মসংস্থান লাভ ও কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। এর পুরোটাই করা হয় শ্রমবাজারে মজুরি খরচ কমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। অনেকের মতেই পুঁজিবাদ একটি অনিশ্চয়তার যুগে (era of insecurity) প্রবেশ করেছে।[৩০] বর্তমানে মানুষ এমন একটি অবস্থায় বসবাস করে যাকে গোর্জ (২০০৩) বলেছেন 'সাধারণীকৃত অনিশ্চয়তা' (generalized insecurity)।[৩১] এমন একটা অবস্থায় ব্যক্তি যেমন নিয়োগযোগ্যতার ধারণায় অভিভূত হয়ে কর্মক্ষেত্রে নিজের 'অসীম সম্ভাবনা' দেখতে পায়, অন্যদিকে সে প্রতি মুহূর্তেই তার সম্ভাব্য বেকারত্বের ব্যাপারেও থাকে চিন্তিত। নিয়োগযোগ্যতার সংস্কৃতিতে ব্যক্তি এমন একটি মানসিক অবস্থার মধ্যে বিচরণ করে যেখানে অদৃশ্য নিয়োগকর্তা সারাক্ষণই যেন তার ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। নব্যউদার শ্রমনীতি ও মুক্তবাজার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে রাজনীতি থেকে ট্রেড ইউনিয়নসহ যাবতীয় শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব (labor agency) ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে ফেলার ফলে পৃথিবীব্যাপী শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মালিকশ্রেণির মর্জিমাফিক নিয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রমিকদের 'দক্ষ' ও 'অদক্ষ' দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করার ফলে শ্রমিকেরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের ঐক্যহীনতা এবং শ্রমিকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মালিকের কথা মেনে চলা ছাড়া অনেক সময় আর কোনো উপায় থাকে না। শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তা ও শ্রমিকশ্রেণির অনৈক্যের ফলে উদ্ভূত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে অনেক সময় বাধ্য হয়েই শ্রমিক বা চাকরিজীবীদের তাদের বর্তমান কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের কথা ভেবে চলতে হয়।

নিয়োগযোগ্যতা শ্রমিকের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বদলে তার শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলার আরেকটি কারণ হলো শ্রমিকের স্বার্থ সর্বদাই পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। যেখানে শ্রমবাজারের গতিবিধি ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় মালিকের মুনাফা বাড়িয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা ও নব্যউদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে, সেখানে শ্রমিকের নিয়োগযোগ্যতা তাকে নিজের মানবীয়, সৃষ্টিশীল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করে।[৩২] ক্রেমিন (২০০৩) মনে করেন, বর্তমানের পুঁজিবাদী সংকটে নিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা একটি অবিরাম প্রয়াস যেখানে শ্রমিকের সর্বশেষ উপলব্ধি হলো সে কোনোদিনই যথেষ্ট নিয়োগযোগ্য হয়ে উঠতে পারবে না।[৩৩] কারণ পুঁজিবাদী

বাস্তবতায় কখনোই ব্যক্তির জন্য বিচ্ছিন্নতাবোধ মুক্ত শ্রমের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে এই কাঠামোগত সহিংসতা নতুন মাত্রা পায় যখন ব্যক্তি নিজে থেকে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ স্বেচ্ছায় নিজের ওপর চাপিয়ে দেয়। এর পেছনে রয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের কাজের সংস্কৃতি (work culture) ও কাজ সংক্রান্ত নৈতিকতা (work ethics)। পুঁজিবাদী সমাজে 'কাজ' বলতে সেটাকেই বোঝানো হয় যা মানুষ মজুরির বিনিময়ে করে থাকে। এই 'কাজের' সাথে ব্যক্তির পরিচয় ও সামাজিক মর্যাদা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ ব্যক্তিকে তার মজুরি শ্রমের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠতে দেয় না। নিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠার চাপ ও বেকারত্বের কলঙ্কায়নের মাঝে মজুরি শ্রমের শোষণমূলক বৈশিষ্ট্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এবং পুঁজিবাদী বাস্তবতায় শোষিত হওয়ার চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে ওঠে শোষিত না হওয়া কিংবা 'শোষণের যোগ্য' না হয়ে ওঠা।

কস্তিয়া এবং তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন নিয়োগযোগ্যতার ডিসকোর্স শ্রমিকের মাঝে 'অসীম সম্ভাবনার' একটি অধীরতা ডেকে আনে।[৩৪] প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্রমাগত মনে করিয়ে দেওয়া হয় তার পক্ষে আরো অর্জন করা সম্ভব। ফলে শ্রমিক যেন নিজের ওপরই একটা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জীবনভর তা চালিয়ে যায়; একটি কাজ-পাগল সমাজে সে প্রতিনিয়ত নিজের অর্জন, যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যায় এবং তার সময় কীভাবে কাটাচ্ছে সে ব্যাপারে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারে না। অর্থাৎ একজন শ্রমিকের আত্ম-বিচ্ছিন্নতা বোধ কেবল অবধারিতই নয়, তাকে আরো বাধ্য করা হয় নিজের বিচ্ছিন্নতাবোধকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে যেতে। এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় এক প্রকারের 'বিকেন্দ্রীকৃত' শোষণমূলক কাঠামো, যেখানে মালিক সরাসরি শ্রমিককে শোষণ করে না বা শোষণের হুমকি দেয় না, আর্থ-সামাজিক চাপে শ্রমিক নিজেই নিজেকে বিচ্ছিন্নবোধে আক্রান্ত করে রাখে ও নিজের ওপর শোষণ চালিয়ে যায়।

আত্ম-বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টির পাশাপাশি নিয়োগযোগ্যতার ধারণা আত্ম-শোষণেও ভূমিকা রাখে যা ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, শারীরিক সুস্থতা, ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব রাখে। মালিক ও শ্রমিকের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের ওপর গুরুত্বারোপ করে শ্রমের দ্বান্দ্বিক চরিত্রের কথা মার্কস উনিশ শতকেই বলেছিলেন।[৩৫] মার্কসের মতে বিচ্ছিন্ন শ্রম (estranged labor) মাত্রই জবরদস্তিমূলক শ্রম (coerced labor)। শ্রমিকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের এই প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে যন্ত্রের পর্যায়ে নামিয়ে আনে এবং সকল প্রকারের মানবিকতাবোধ ও নৈতিকতা, মুনাফা লাভের অনন্ত আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাভূত হয়। নিয়োগযোগ্যতা সংক্রান্ত অধিকাংশ অ্যাকাডেমিক লেখাপত্র বিভিন্নভাবে শ্রমিকের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্যতার গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তা মৌলিক কিছু পূর্বশর্তের ওপর নির্ভরশীল[৩৬]। যে পূর্বশর্ত বা পূর্বানুমানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, শ্রমিকের কর্মসংস্থানের প্রাথমিক দায়িত্ব তার নিজের এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান ধরে রাখার দায়িত্বও তার।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও শ্রমবাজার কেবল ব্যক্তিকে নিয়োগযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য চাপ দেয় না, তাকে হয়ে উঠতে হয় একেবারে যথাযথ মাত্রায় নিয়োগযোগ্য। শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় অতিরিক্ত নিয়োগযোগ্য (অর্থাৎ কোনো বিষয়ে অধিক বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন কিংবা কোনো কাজে

সাধারণের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ হয়ে ওঠা) হয়ে ওঠাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিয়োগযোগ্যতা হ্রাস করতে পারে। নিয়োগযোগ্যতার এরকম অভাব থেকে কাঠামোগত বেকারত্বের (structural unemployment) সূচনা ঘটতে পারে এবং তৈরি হতে পারে একটি অনুৎপাদনশীল কিংবা স্বল্প-উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি। যার ফলে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার গতি মন্থর হয়ে যায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া থেকে অনুমান করা যায় যে, নিয়োগযোগ্যতার ধারণা এবং শ্রমবাজারে এর প্রয়োগ একটি মুনাফাভিত্তিক, অ-টেকসই কাঠামো থেকে উৎসারিত একটি চিন্তা ও প্রক্রিয়া। এর দ্বারা মানুষকে বাধ্য করা হয় নিয়োগযোগ্যতা বজায় রাখতে নয়তো বেকারত্বের গ্লানি বহন করতে। আর যে সমাজে অধিকাংশ মানুষের জন্যই বেকারত্বের আরেক নাম না-খেয়ে থাকা, সেখানে নিয়োগযোগ্যতা অর্জন ও বজায় রাখার কোনো বিকল্প বাস্তবে নেই। নিয়োগযোগ্যতা হয়ে ওঠে পুঁজিবাদী সংকট ও বাস্তবতার একটি মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক উপসর্গ।

নিয়োগযোগ্যতার সহিংসতার সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ সম্ভবত অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা এবং তা থেকে উৎসারিত বিভিন্ন সমস্যা ও শোষণমূলক কর্মকাণ্ড। ফ্রাংক পেগা ও তাঁর সহকর্মীরা ২০০০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ১৯৪টি দেশের কর্মঘণ্টা ও অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা থেকে উদ্ভূত শারীরিক সমস্যার গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কিছু ভয়াবহ তথ্য তুলে আনেন।[৩৭] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) একটি যৌথ গবেষণায় দেখা যায় ২০১৬ সালে পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৪৯ কোটি মানুষ (বিশ্বের জনসংখ্যার ৮.৯%) সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করে, যা ২০০০ সালের তুলনায় ৯.৩% বেশি। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ২০১৫ সালের একটি রিপোর্টে বলা হয় সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করা মানুষদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের আশংকা স্বাভাবিকের চেয়ে ১৩% বেশি এবং তাদের স্ট্রোক করার আশংকাও স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৩% বেশি থাকে। এমন নয় যে সকল ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ও মজুরিবিহীন ওভারটাইম কাজ করে যাওয়া বাধ্যতামূলক। শ্রমিকের সময় যেখানে একটি পণ্য ও লাভজনক ব্যবসা পরিচালনার আরেকটি উৎপাদন খরচ, সেখানে নিয়োগকর্তার মনোযোগ থাকে কীভাবে সেই সময়টাকে মুনাফা বৃদ্ধির কাজে লাগানো যায় সেদিকে। এবং শ্রমিকও চেষ্টা করে অতিরিক্ত সময় কাজ করে নিয়োগকর্তার সুনজরে আসতে ও নিজের নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে। মালিকের দৃষ্টিতে শ্রমিকের সকল সময়ই সম্ভাব্য কর্মঘণ্টা এবং শ্রমিকের কাছে সেই কর্মঘণ্টা হলো মজুরি লাভের উপায়, যা দিয়ে সে নিজের এবং পরিবারের চাহিদা মেটায়। মালিক এটাও মনে করে যে, সে শ্রমিককে চাকরি দেয় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য; শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে মালিকের জন্য মুনাফা উৎপাদন করবে এবং তা নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিককে 'সুপথে' রাখা মালিকের দায়িত্ব। প্রতি মুহূর্তে সময়কে অর্থে পরিণত করতে চাওয়ার প্রবণতা ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর মালিকের একচেটিয়া অধিকার শ্রমিককে ঠেলে দেয় মালিকের দৃষ্টিতে 'আদর্শ শ্রমিক' হয়ে ওঠার দিকে। সময় তথা কর্মঘণ্টাকে ঘিরে মালিক ও শ্রমিকের এই সংঘাত জীবনধারণ ও মজুরি লাভের জন্য দৈনন্দিন শ্রমের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যেই জীবন উপভোগের জন্য মানুষ কাজ করে, সেই জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য সময়ও যখন নিয়োগকর্তা (জবরদস্তিমূলক কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে) কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তখনই সমস্যার

উৎপত্তি হয়; যা ব্যক্তির সামাজিক, পারিবারিক, বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের ওপর চালানো এক ধরনের সহিংসতা।

পুঁজিবাদের উৎপত্তির প্রাথমিক যুগে মার্কস অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মূল দ্বন্দ্বকে দেখেছিলেন মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব হিসেবে। মার্কস মনে করতেন পুঁজির দ্বন্দ্ব যতো বিবর্তিত হবে, শ্রমিকশ্রেণি ততো বেশি সংঘবদ্ধ হয়ে উঠবে এবং একটা পর্যায়ে বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজির উৎখাত ঘটিয়ে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমরা দেখি নিয়োগযোগ্যতার ধারণা ও এর প্রয়োগ শ্রমিককে তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে 'দক্ষ' ও 'অদক্ষ' দুইভাগে বিভক্ত করে। মালিকের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া এ ধরনের শ্রেণি বিভাজন পর্যায়ক্রমে শ্রমিকের মধ্যেও বিভক্তি নিয়ে আসে এবং এক শ্রেণির শ্রমিক তাদের 'দক্ষতার' ভিত্তিতে নিজেদেরকে 'অদক্ষ' শ্রমিকের চেয়ে অধিক নিয়োগযোগ্য মনে করা শুরু করে। শ্রমিকের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হওয়া তাকে শোষণ করার কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। সেখানে হয় একজন শ্রমিক নিজেকে অপর শ্রমিকের চেয়ে বেশি নিয়োগযোগ্য ভাবা শুরু করে, নয়তো মনে করে অধিক নিয়োগযোগ্য হয়ে উঠতে পারলে সে আরো স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে সমর্থ হবে। ফলে অনিবার্যভাবে এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি হয় যেখানে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের সংঘবদ্ধ হওয়ার ধারণাকে প্রতিস্থাপিত করে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার কর্মকাণ্ড।

উপসংহার

নিয়োগযোগ্যতাকে অর্থনীতির গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এর প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। বরং নিয়োগযোগ্যতাকে একটি সার্বিক সাংস্কৃতিক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করার মাধ্যমেই সম্ভব এর প্রায়োগিক দিকগুলোর পর্যালোচনা করা। নিয়োগযোগ্যতার ধারণা মূলধারার অ্যাকাডেমিক চর্চা ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিবেচিত হয় অনেকটা নির্দেশনামূলক (prescriptive) প্রসঙ্গ হিসেবে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি বা শ্রমিকের নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি করার উপায়ের সন্ধান। কিন্তু নিয়োগযোগ্যতার সাথে সামাজিক নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি জড়িত যা শেষ পর্যন্ত শ্রমিক বা চাকরিজীবী হিসেবে ব্যক্তির আইডেন্টিটি নির্মাণ ও নির্ধারণের একটি উপায়। যে সমাজে কাজ মানেই মজুরি শ্রম, সেখানে কাজ একটি অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে ওঠে। নিয়োগযোগ্যতা পরিণত হয় আয় করার ও বেঁচে থাকার একটি পূর্বশর্তে।

নিয়োগযোগ্যতার সহিংসতা প্রোথিত এমন একটি সামাজিক কাঠামোতে, যাকে ক্যাথি উইকস (২০১১) অভিহিত করেছেন 'the work society' হিসেবে[৩৮]। পুঁজিবাদী সমাজে মজুরি শ্রম এতো বেশি স্বাভাবিকৃত এবং এর ফলে একে এতোটাই প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য বিষয় হিসেবে ভাবা হয় যে, এটির ওপর বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপ করা গেলেও তা থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় থাকে না। ফলে যথেষ্ট নিয়োগযোগ্য না হওয়ার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয় ব্যর্থতা হিসেবে। যথেষ্ট কিংবা যথাযথ নিয়োগযোগ্যতাবিহীন ব্যক্তিকে প্রতি মুহূর্তে কলঙ্কিত করা হতে থাকে, তার পরিচয়ের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় 'অদক্ষের' তকমা। কিংবা তাকে স্রেফ অলস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

নিয়োগযোগ্যতা শুধু শ্রম বা চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অ্যাডোর্নো দেখান ব্যক্তির নৈতিকতা ও মূল্যবোধগত পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে কাজ ও অ-কাজের (non-work) মধ্যেকার বিভেদ ম্লান হয়ে যেতে থাকে এবং অ-কাজকেও মজুরি শ্রম ও কর্মসংস্থানের দাবিসমূহের অংশ করে ফেলা হয়[৩৯]। ফলে মানুষের শখ, আহ্লাদ, অবসরসহ সব কিছুই নিয়োগযোগ্যতার গণ্ডির মধ্যে চলে আসে এবং এক অর্থে কোনোভাবেই মানুষের পক্ষে 'কাজ' থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কর্মস্থলের বাইরেও তার জীবন পরিচালিত হতে থাকে নিয়োগকর্তার দাবি-দাওয়া ও প্রয়োজন দ্বারা। নিয়োগযোগ্যতার চাপ ও শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তা একদিকে যেমন শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে অন্তঃবিভাজনের সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি নতুন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির; যাদেরকে গাই স্ট্যান্ডিং অভিহিত করেছেন 'প্রিক্যারিয়েট' শ্রেণি হিসেবে[৪০]। প্রিক্যারিয়েট একটি কৃত্রিম শব্দ যা গঠিত হয়েছে নিরাপত্তাহীনতা (precarious) ও সর্বহারা (proletariat) শব্দ দুটির সমন্বয়ে। স্ট্যান্ডিংয়ের মতে ১৯৭০-এর দশকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক নব্য-উদারবাদী চিন্তাধারা বাজারের নমনীয়তার (market flexibility) ওপর জোরারোপ করার মধ্য দিয়ে শ্রমবাজারের যাবতীয় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এর ফলে একটি বিশাল ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক শ্রেণি তৈরি হয়েছে যাদের কর্মসংস্থান ও মজুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। এর ফলে তৈরি হয়েছে একটি সামাজিক শ্রেণি যারা ক্ষুব্ধ, উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত এবং বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত।[৪১]

নিয়োগযোগ্যতা একদিকে যেমন অর্থনীতির সূত্রজাত হিসাব-নিকাশের অংশ, অন্যদিকে তা একটি সর্বব্যাপী সংস্কৃতি, মূল্যবোধের কাঠামো, একটি বিমূর্ত চিন্তা। সমাজ, নৈতিকতা, দায়বোধ, কলঙ্কায়নসহ প্রভৃতি বিষয় নিয়োগযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। এই বিমূর্ত চিন্তা ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনের অধিকাংশটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে, তাকে শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে পরিচালনা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনে ডেকে আনছে অমানবিক বিপর্যয় ও সহিংসতা। অনিশ্চিত, শোষণমূলক একটি আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক আবহে সামাজিক প্রাণী হিসেবে মুক্ত, সুস্থ, নিরাপদ, সুখী জীবনযাপন করা অধিকাংশের জন্যই অসম্ভব হয়ে উঠছে। নব্যউদারনৈতিক রাষ্ট্র, ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী আইনি প্রক্রিয়াসমূহ এবং শ্রমিক শ্রেণির নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বিভেদ ও সংঘাত শ্রমিকের ওপর নিয়োগযোগ্যতার চাপ বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। আমরা বর্তমানে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এমন একটি যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে অর্থনৈতিক সংকট আর উৎপাদনের সংকট নয় বরং তা বণ্টনের সংকট।[৪২] এমতাবস্থায় নিয়োগযোগ্যতার ধারণা কেবল টিকে আছে পুঁজিপতির অসীম লোভ এবং শ্রম ও কর্মঘণ্টার পুনর্মূল্যায়নের প্রতি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনীহা ও জড়তার কারণে। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এরূপ চিন্তা, যা মানুষকে অনিশ্চয়তা, অভাব ও কাঠামোগত সহিংসতার দিকে ঠেলে দেয়, তা কোনোভাবেই টেকসই হতে পারে না। মানুষের মুক্তি ও সুখী স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন নিশ্চিত করার জন্য যেমন শোষণমূলক কাঠামো উপড়ে ফেলা প্রয়োজন, তেমনি নিয়োগযোগ্যতার মতো সহিংস হয়ে ওঠা বিমূর্ত চিন্তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও আবশ্যক।

তথ্যনির্দেশ

১. Anneleen Forrier and Luc Sels, "The Concept of Employability: A Complex Mosaic," *Human Resources and Development Management* Vol. 3, 2003, pp. 102-124; Ronald W. McQuaid and Colin Lindsay, "The Concept of Employability", *Urban Studies* Vol. 42, No. 2, 2005, pp. 197-219.

২. Jean-Marie Hiltrop, "The Changing Psychological Contract: The Human Resource Challenge of the 1990s", *European Management Journal,* Vol. 13, No. 3, September 1995, pp. 286-94.

৩. Geoffrey William Hinchliffe and Adrienne Jolly, "Graduate Identity and Employability", *British Educational Research Journal,* Vol. 37, No. 4, 2011, pp. 563-84.

৪. Theodor W. Adorno, *The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture*, United Kingdom, Routledge, 2001.

৫. Diane Elson and Ruth Pearson, "'Nimble Fingers Make Cheap Workers': An Analysis of Women's Employment in Third World Export Manufacturing", *Feminist Review*, No. 7, 1981, pp. 87-107.

৬. Sarah Bronwen Horton, *They Leave Their Kidneys in the Fields: Illness, Injury, and Illegality Among U.S. Farmworkers*, United States, University of California Press, 2016.

৭. Nicholas De Genova, *Working the Boundaries: Race, Space, and "Illegality",* In: *Mexican Chicago*, Ukraine, Duke University Press, 2005.

৮. Arlie Russell Hochschild, *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling,* United Kingdom, University of California Press, 2012.

৯. Sian Lazar, *How We Struggle: A Political Anthropology of Labour*, United Kingdom: Pluto Press, 2023.

১০. A. Aneesh, *Neutral Accent: How Language, Labor, and Life Become Global*, United Kingdom, Duke University Press, 2015.

১১. Purnima Mankekar and Akhil Gupta, "Intimate Encounters: Affective Labor in Call Centers", *Positions,* Vol. 24, No. 1, February 2016, pp. 17-43.

১২. Kimberly Kay Hoang, "Economics of Emotion, Familiarity, Fantasy, & Desire: Emotional Labor in Ho Chi Minh City's Sex Industry". In: *Intimate Labors: Cultures, Technologies, and the Politics of Care,* United States, Stanford University Press, 2010.

১৩. Rachel Salazar Parreneas, "Cultures of Flirtation: Sex and the Moral Boundaries of Filipina Migrant Hostesses in Tokyo", In: *Intimate Labors: Cultures, Technologies, and the Politics of Care*, United States, Stanford University Press, 2010.

১৪. Millian Kang, *The Managed Hand: Race, Gender, and the Body in Beauty Service Work*, United Kingdom, University of California Press, 2010.

১৫. Arlie Russell Hochschild, *Ibid.,* 2012

১৬. Will Stronge and Kyle Lewis, *Overtime: Why We Need A Shorter Working Week*, United Kingdom, Verso Books, 2021.

১৭. David Frayne, *The Refusal of Work: The Theory and Practice of Resistance to Work*, United Kingdom: Zed Books, 2015, p. 68.

১৮. Jonathan Crary, *24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep*, United Kingdom, Verso, 2013.

১৯. John Meynard Keynes, "Economic Possibilities for Our Grandchildren", In: *Why Work? Arguments for the Leisure Society*, United States, PM Press, 2018.

২০. David Graeber, *Bullshit Jobs: A Theory*, India, Simon & Schuster, 2019.

২১. Goerge Woodcock, "Tyranny of the Clock," In: *Why Work? Arguments for the Leisure Society*, Ibid., 2018.

২২. *National Skills Development Policy, 2020.* Bangladesh: Prime Minister's Office, Government of People's Republic of Bangladesh, 2020, p. 1.

২৩. উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি–

i) Mohammad Milon, Mohammed Rafiqul Islam, and Md. Atiqur Rahman Khan, "Employability Skills of Business Graduates in Job Markets of Bangladesh: Investigating Weaknesses and Suggesting Improvements" *International Journal of Management and Accounting,* Vol. 2, No. 1, 2021.

ii) Fahmida Khatun *et al*., "Skills Gap and Youth Employment in Bangladesh: An Exploratory Analysis", Bangladesh, Center for Policy Dialogue, 2022.

iii) Kazi Khaled Shams Chisty, Gazi Munir Uddin & Suntu Kumar Ghosh, "The Business Graduate Employability in Bangladesh: Dilemma & Expected Skills by Corporate World", *BRAC University Journal,* Vol. 4, No. 1, 2007, pp 1-8.

iv) A.K. Ziauddin Ahmed & Md. Azim, "Employment Scenario in Bangladesh: A Study on the Gap Between Expectations of Employers & the Quality of Graduates", *International Journal of Entrepreneurship & Development Studies,* Vol. 4, No. 2, 2016, pp. 175-195.

২৪. Elizabeth Anderson, *Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don't Talk about It)*. United Kingdom, Princeton University Press, 2017.

২৫. Ibid, p. 48.

২৬. Thomas N. Garavan, "Employability, the emerging new deal?", *Journal of European Industrial Training,* Vol. 23, No. 1, 1999.

২৭. Marilyn Clarke & Margaret Patrickson, "The New Covenant of Employability", *Employee Relations,* Vol. 30, No. 2, 2008, pp. 127-28.

২৮. Peter Bloom, "Fight for your alienation: The fantasy of employability and the ironic struggle for self-exploitation", *Ephhemera: Theory & Practice in Organizations,* Vol. 13 No. 4, 2013, pp. 785-807.

২৯. Colin Cremin, "Never Employable Enough: The (Im)possibility of Satisfying the Boss's Desire", *Organization,* Vol. 17, No. 2, 2010, pp. 109-128.

৩০. Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*. United Kingdom: Wiley, 2000; Nancy Fraser, *Cannibal Capitalism: How Our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet and What We Can Do About It*, United Kingdom, Verso Books, 2022.

৩১. André Gorz, *The Immaterial: Knowledge, Value and Capital*, India, Seagull Books, 2010.

৩২. Clara Cremin, "Never Employable Enough: The (Im)possibility of Satisfying the Boss's Desire", *Organization,* Vol. 17, No. 2, 2010, pp. 131-149.

৩৩. Ibid.

৩৪. Bogdan Costea *et al.*, "Graduate Employability and the Principle of Potentiality: An Aspect of the Ethics of HRM", *Journal of Business Ethics*, Vol. 111, No. 1, 2012, pp. 25–36.

৩৫. Karl Marx and Friedrich Engels, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844,* Russia, Foreign Languages Publishing House, 1959.

৩৬. Marilyn Clarke and Margaret Patrickson, "The New Covenant of Employability", *Employee Relations,* Vol. 30, No. 2, 2008, pp. 127-28.

৩৭. Frank Pega *et al.,* "Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000-2016: A

systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury", *Environment international,* No. 154, 2021, p. 106595.

৩৮. Kathi Weeks, *The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries,* United Kingdom, Duke University Press, 2011.

৩৯. Theodor W. Adorno, *The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture*. United Kingdom, Routledge, 2001, p. 187.

৪০. Guy Standing, *The Precariat: The New Dangerous Class,* United Kingdom, Bloomsbury Publishing, 2011.

৪১. Ibid, p. 19.

৪২. Murray Bookchin, *Post-scarcity Anarchism*, United Kingdom, Black Rose Books, 1986.

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিঃ নৃত্যের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা

ওয়ার্দা রিহাব*

সারসংক্ষেপ

মনের ভাব প্রকাশ করার একটি অবাচনিক মাধ্যম হচ্ছে নৃত্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে নৃত্য তার বিনোদনের গণ্ডি পেরিয়ে একটি বৃহৎ পরিসরে জায়গা করে নিয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি নামক (Dance Movement Therapy বা DMT) সর্বাধুনিক ধারণাটির মাধ্যমে। ১৮৪০ থেকে ১৯৩০-এর দিকে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি একটি নতুন অভিধা হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এর অনুশীলন দীর্ঘসময় ধরে পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে এই চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোতেও পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিকে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ নতুন কেননা, আমাদের দেশে নৃত্য শুধুমাত্র একটি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বৃহৎ পরিসরে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির রয়েছে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আচরণগত সমস্যাগুলোর সমাধানের সক্ষমতা। এই চিকিৎসা পদ্ধতি হতাশা, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা কমাতে সাহায্য করে। সেইসাথে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, স্থূলতা, কর্কটরোগ, বাত, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগের সমস্যা ইত্যাদির মতো শারীরিক মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসায়ও অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও এই চিকিৎসা পদ্ধতি শিশুদের সমস্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। তাই ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি বাংলাদেশে শারীরিক, মানসিক এবং আচরণগত পরিবর্তনের একটি অন্যতম পরিপূরক চিকিৎসা পদ্ধতি হতে পারে। যেকোনো বয়সের ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে বলে আশা করা যায়। এ প্রবন্ধে DMT বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

চাবি শব্দঃ ডান্স মুভমেন্ট, থেরাপি, শারীরিক, মানসিক, সুস্থতা।

১। ভূমিকা

নৃত্য হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করার একটি অবাচনিক মাধ্যম অর্থাৎ, মনোজাগতিক প্রকাশভঙ্গি। নৃত্যের সাথে মুদ্রা, তাল, ছন্দ এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নৃত্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষেরা বিভিন্ন উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানে নৃত্যের আয়োজন করত। প্রাচীনকালের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেও নৃত্যকলার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিম যুগে ভাষা আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকেই নৃত্যের প্রচলন ছিল, যা নব্য প্রস্তরযুগ, কৃষি বিপ্লব, আগুন আবিষ্কারের যুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে এসে বিকাশ লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০০ শতকের মিশরীয় দেয়ালচিত্রে ও ভারতের গুহাচিত্রে নৃত্যকলার বিভিন্ন

* প্রভাষক, নৃত্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভঙ্গিমা খোদাই করা আছে। ভারতের ৯০০০ বছরের প্রাচীন গুহাচিত্রেও নৃত্যকলার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয় সহস্রাব্দে নৃত্যকলা ছিলো মিশরীয়দের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।[১] সে-সময়ে ধর্মীয় এবং চিত্তবিনোদন উভয় উদ্দেশ্যেই নৃত্যর ব্যবহার হতো। ১৪০০ শতকে ধনী ব্যক্তিদের বিনোদনের জন্য 'ছোট স্কার্ট' (Dance Scantily) পরিহিত মেয়েরা জনসম্মুখে নৃত্য করত এবং রেনেসাঁ শুরুর আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রিক থিয়েটারের জন্ম হয়। পরবর্তীতে মৌলিক 'বৃত্তাকার নৃত্য' (Circle Dance) সমগ্র ইউরোপ জুড়ে প্রচলিত হয় এবং ১৫০০ থেকে ১৬০০ শতক পর্যন্ত ব্যালে নৃত্য (Ballet) ছিলো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ১৮০০ শতকের প্রথমার্ধে ইতালিতে উদ্ভূত বারোক নৃত্য (Baroque), স্পেন, ফ্রান্স এবং সমগ্র ইতালিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যা ফরাসি এবং ইংরেজ আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। সেসময়ে পোলকা (Polka), মাজুরকা (Mazurka), গালপ (Galop), ওয়াল্টজ (Waltz), কটিলন (Kotilon) ইত্যাদি নৃত্যও খুব জনপ্রিয় ছিল।

ফরাসি বিপ্লবের শেষে নতুন ধরনের কিছু নৃত্যের প্রচলন হয় এবং লম্ফঝম্প (Skipping, Jumping)-এর রূপগুলোও ছিলো নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বলরুম নৃত্য (Ballroom Dance) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে-সময়েই প্রথম আধুনিক নৃত্যশালা শুরু হয় 'Vernon and Irene Castle' নামক দম্পতির মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীতে চালর্সটন (The Charleston), দ্য ব্ল্যাক বটম (The Black Bottom) ছিলো অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক নৃত্য যেমন: হিপহপ (Hiphop), ব্রেকডান্স (Break Dance), ট্যাঙ্গো (Tango), সুইং (Swing) প্রভৃতি নৃত্যের প্রচলন হয়। নৃত্যের ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে, ১৮৪০ থেকে ১৯৩০-এর দিকে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি নতুন ধারনা বিকাশ লাভ করে। এখানে শুধুমাত্র একটি অভিব্যক্তিমূলক শিল্প হিসেবেই নয় বরং প্রাথমিক মানব ইতিহাস থেকে শুরু করে উর্বরতা, জন্ম, মৃত্যু এবং অসুস্থতার প্রভাবের এক নিরাময়ের পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] ১৯১৬ সালে জোয়ান কডরো (Joan Chodorow) প্রথমবারের মতো নৃত্যকে একটি সক্রিয় কল্পনাচিত্র (Active Imaginatioin) হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩] এরই সূত্র ধরে ১৯৪০ সালের দিকে টিনা কেলার জেনিসহ (Tina Keller- Jenny) অন্যান্য থেরাপিস্ট ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি (Dance Movement Therapy) অনুশীলন শুরু করেন, যা ১৯৬০-এর দশকে গিয়ে বিকাশ লাভ করে।

এর অগ্রদূত ছিলেন ম্যারি স্টার্ক্স হোয়াইটহাউস (Mary Starks Whitehouse)। বর্তমান সময়ের গবেষণা বলছে, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি একজন ব্যক্তিকে অঙ্গ সঞ্চালনার মাধ্যমে বিভিন্ন অসুস্থতা (শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক), প্রতিবন্ধকতা এবং জীবনে নানারকম সমস্যার সাথে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। নৃত্য হচ্ছে ব্যায়ামের এমন একটি ছন্দময় রূপ, যা ব্যক্তিকে তার আবেগ এবং অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয়। নৃত্যের সাথে একাগ্রতা এবং শারীরিক শক্তি জড়িত, ফলে ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনের চাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পায়, যা ব্যক্তির মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করে। শিশু, যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্কদের জন্যও

রয়েছে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির বিবিধ উপকারিতা। 'Journal of Aging and Physical Activity'র ২০০৯ সালের একটি পর্যালোচনায় এর প্রমাণ মেলে। তারা সে গবেষণায় ১৫টি প্রশিক্ষণ দল এবং ৩টি সংমিশ্রিত বিভাগীয় অধ্যয়নকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। গবেষণাটির ফলাফলে পাওয়া যায়, নৃত্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বায়বীয় শক্তি, শরীরের নিম্নাংশের পেশি সহনশীলতা, শক্তি এবং নমনীয়তা, ভারসাম্য, গতিশীলতা এবং চলনভঙ্গির উন্নতি সাধন করে। তারা এমন কিছু প্রমাণও পেয়েছেন, যা হাড়ের খনিজের ঘনত্ব এবং পেশিশক্তির উন্নতি, একইসাথে শরীরের প্রধান অন্তর্নির্হিত ক্রিয়া (Stroke) এবং হৃৎপেশি সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি কমায়।[৪] Creative Movement Therapy Association of India (CMTAI)-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা 'ত্রিপুরা কাশ্যপ' ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি (Dance Movement Therapy) সম্পর্কে বলেন: "ডিএমটি অনেকটা সাইকোথেরাপির মতোই। কাউন্সেলিং-এর সময় যেমন কথা বলার মাধ্যমে আপনার মনের জট ছাড়ানো হয়, তেমনই মুভমেন্ট থেরাপি শরীরী ভাষা ব্যবহার করে আমাদের মনোভাব, চিন্তা, সমস্যা এবং যাবতীয় অসম্পূর্ণ আশা-আকাঙ্খাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে।"[৫]

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি কীভাবে একজন ব্যক্তিকে শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতাসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সাথে মোকাবিলা করতে শেখায়, তা বিশ্লেষণ করা।

খ. ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং সার্বিক উন্নতি সাধনে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি কীভাবে সহায়তা করে, তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ করা।

গ. ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দক্ষতা অর্জন এবং সৃজনশীলতার প্রকাশে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির কার্যকারিতা উল্লেখ করা।

ঘ. ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি নামক যুগোপযোগী, নতুন এবং ভিন্নধর্মী বিষয়টি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।

১.২ গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতিকে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ, কোনো একটি সৃজনশীল এবং পদ্ধতিগত কাজের জন্য অনেক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজন হয়, যা একটি অনাবিষ্কৃত দিককে উন্মোচন করতে সহায়তা করে। যেহেতু, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির ধারণাটি নতুন, তাই এই গবেষণায় বিভিন্ন গ্রন্থ, বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, জার্নাল এবং ম্যাগাজিনের সহায়তায় বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে, সেগুলোকে সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেন বোধগম্যতা সহজ হয়। এছাড়াও, এই গবেষণায় ৩ জন নৃত্যশিল্পী ও ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্টের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের পাশাপাশি, যারা সরাসরি এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত আছেন, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবান তথ্যের বিশ্লেষণ এই গবেষণাটিকে একটি নতুন মাত্রা প্রদান করতে সহায়তা করেছে। এই বিবেচনায় এটি গুণগত গবেষণা।

১.৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

শিল্প মাধ্যমগুলো সর্বজনীন ভাবে অভিন্ন হলেও, দেশ, কাল পাত্র অনুযায়ী তার প্রয়োগ এবং ব্যবহার ভিন্ন হয়। শিল্প মাধ্যমগুলোকে (যেমন: নৃত্য) শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না করে, পশ্চিমা দেশগুলো নৃত্যের অঙ্গসঞ্চালনকে থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করছেন এবং সফলও হচ্ছেন। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই তারা গবেষণা করে চলেছেন এবং উক্ত বিষয়কেন্দ্রিক তাদের অনেক বই-পুস্তক ও গবেষণাও রয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে, আমাদের দেশে এই ধারণাটি নতুন। তাই, স্বাভাবিকভাবেই এই গবেষণাটি তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। একই সাথে সময়ের এবং পারিপার্শ্বিক কিছু সীমাবদ্ধতা এই গবেষণাটিকে প্রভাবিত করেছে।

২। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি পরিচিতি

ডিএমটি অর্থাৎ, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে শরীরের অঙ্গসমূহের পরিচালনার মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক এবং শারীরিক নানা জটিলতা দূর করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক, সামাজিক, শারীরিক এবং সামগ্রিক জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে মনোজাগতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এটি অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা পদ্ধতির মতো, যা ব্যক্তির বিষণ্নতা, উদ্বেগ এবং হতাশাসহ নানা রকম মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। আমাদের পরিচিত এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা নিজেদের সমস্যা বুঝতে পারেন না, আবার অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো অস্বীকার করেন, যে কারণে চিকিৎসকরা সঠিক রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা দিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি অত্যন্ত উপযোগী এবং কার্যকরী। UCLA-এর একটি অলাভজনক সংগঠনের নিরাময় কেন্দ্র 'Dance From The Heart'-এর নৃত্য শিক্ষক জানেট লো (Janet Loo) ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি সম্পর্কে বলেছেন: 'Anxiety and depression can cause people to disassociate and disconnect from their bodies, but conscious dance allows them to get in touch with all their senses. There's things that I cannot express with words that I feel, that come out in movement.'[৬]

অর্থাৎ মানসিক আঘাত, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা একজন ব্যক্তিকে তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, কিন্তু নৃত্যের মাধ্যমে পুনরায় ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাথে তার শরীরের যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্ত করা যায় না, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিকে মানসিক আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। কেটি বোন (Katie Bohn), আমেরিকান বোর্ড কর্তৃক সত্যায়িত একজন ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট, তিনি ডিএমটি সম্পর্কে বলেন: 'DMT is a creative art psychotherapy that utilizes movement and dance to support the physical, intellectual and emotional health of an individual.'[৭] অর্থাৎ, ডিএমটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিদ্যার এমন একটি সৃজনশীল কৌশল, যা নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি ও চলনকে ব্যবহার করে ব্যক্তির শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে। অন্য একজন

থেরাপিস্ট এরিকা হর্নথাল (Erica Hornthal)-এর মতে, ডিএমটি ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক এবং আচরণগত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে অবাচনিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়, কেননা উক্ত সমস্যাগুলো শুধুমাত্র শব্দের দ্বারা সমাধান করা যায় না।[৮] ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও কার্যকরী যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, একই সাথে তিনি ব্যক্তিভেদে আচরণের ধরণ ও পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হোন। সমস্যা মোকাবিলার বিকল্প পথ তৈরি এবং পুনরায় বিকাশ লাভে চিকিৎসকরা চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, গবেষণা, চিকিৎসাবিদ্যাগত মিথস্ক্রিয়া এবং ব্যক্তিপর্যায়ে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সর্বত্র সহযোগিতা করে থাকেন। চিকিৎসকরা সাধারণত নার্সিং হোম, স্কুল-কলেজ, মনোরোগকেন্দ্র, পুনর্বাসন এবং চিকিৎসা সুবিধাকেন্দ্র, ঔষধ চিকিৎসাকেন্দ্রসহ বিভিন্ন পরিসরে কাজ করে থাকেন।

২.১ ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির ইতিহাস

১৯৬৬ সালে 'ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট' পেশাকে সমর্থন করার প্রয়োজনে আমেরিকা একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা 'American Dance Therapy Association' (ADTA) নামে পরিচিত। এটি একমাত্র মার্কিন সংস্থা, যা ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্টদের কাজের অগ্রগতির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৯] তবে এডিটিএ (ADTA) প্রতিষ্ঠার আরো ২০০ বছর আগে থেকেই থেরাপিস্টরা এই বিষয়ের ওপর কাজ করে চলেছেন। ১৮৪০ থেকে ১৯৩০ শতকের দিকে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ভাবনাটি বিকাশ লাভ করে, যা নৃত্যকে অভিব্যক্তিমূলক শিল্প মাধ্যমের বাইরেও একটি নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। এখানে উর্বরতা, জন্ম, মৃত্যু এবং অসুস্থতার প্রভাবের নিরাময়ের পদ্ধতি হিসেবে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিকে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৬ সালে জোয়ান কডরো (Joan Chodorow) প্রথমবার নৃত্যকে একটি সক্রিয় কল্পনাচিত্র (Active Imagination) হিসেবে উল্লেখ করেন এবং সেই সূত্র ধরে ১৯৪০ সালের দিকে টিনা কেলার জেনি (Tina Keller-Jenny) সহ অন্যান্য চিকিৎসক এ প্রক্রিয়ার অনুশীলন শুরু করেন।

১৯৬০-এর দশকে গিয়ে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি বিকাশ লাভ করে, যার অগ্রদূত ছিলেন ম্যারি স্টার্ক্স হোয়াইটহাউজ (Mary Starks Whitehouse)। ডান্স মুভমেন্টকে একটি থেরাপি এবং পেশা হিসেবে বিবেচনা করে নৃত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটেছিলো ১৯৫০-এর দশকে। যুগান্তকারী এই থেরাপির প্রতিষ্ঠাতা হলেন আমেরিকান নৃত্যশিল্পী, নৃত্য প্রশিক্ষক, অভিনয়শিল্পী এবং জার্নালিস্ট ম্যারিয়ান চেস (Marian Chace)। পরবর্তীতে একে কেন্দ্র করে ADTA প্রতিষ্ঠিত হয়। ADTA সংস্থার মতে, নৃত্যের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবহার একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক মিশ্রণকে লক্ষণীয় মাত্রায় অগ্রগতি প্রদান করে।

ম্যারিয়ান চেস (Marian Chace) 'নৃত্যের ভঙ্গি ও গতিশীলতাকে' থেরাপির একটি রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এবং চিকিৎসক মহলের মধ্যে এর পরিচিতি, প্রচার ও প্রসার ঘটাতে নিরলস কাজ করে যান। ১৯৪২ সালে তার কাজের মাধ্যমে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি প্রথম পশ্চিমা চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে পরিচিত হয়। ওয়াশিংটন ডিসিতে তিনি নিজের নাচের স্কুল করেন এবং

তার শিক্ষার্থীদের ওপর নাচ এবং এর গতিশীলতার প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান। তার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক রিপোর্টগুলো ক্রমাগত চিকিৎসক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে এবং পরীক্ষামূলকভাবে কিছু স্থানীয় ডাক্তার তাদের রোগীদেরকে তার ক্লাসে পাঠাতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তার কাজের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ওয়াশিংটন ডিসি'র সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে (St. Elizabeths Hospital, Washington D.C) কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অন্য একজন থেরাপিস্ট ট্রুডি স্কুপ (Trudi Schoop) ১৯৪৭ সালের দিকে ভগ্নমনস্ক রোগীদের (Schizophrenic) নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি হাস্যরসাত্মক এবং ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির সংমিশ্রণে যৌথভাবে কাজ করার পথপ্রদর্শক ছিলেন।[১০] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে 'American Dance Therapy Association' (ADTA) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ম্যারিয়ান চেস (Marin Chace) এর প্রথম সভাপতি হন। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০-এর দশকে যখন আমেরিকার অন্যান্য চিকিৎসক ডিএমটি দ্বারা আকৃষ্ট হতে শুরু করেন, তখন এ প্রক্রিয়া একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। একে ডিএমটির দ্বিতীয় তরঙ্গ বলেও উল্লেখ করা যায়। চিকিৎসকরা নৃত্য এবং অঙ্গসঞ্চালনার ওপর মনোজাগতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। তাদের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ডিএমটিকে 'মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি রূপ' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং এরপর থেকেই ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি নতুন মাত্রায় বিকাশ লাভ করতে শুরু করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯১৬ সালে কার্ল গুস্তাভ জং (Carl Gustav Jung) সর্বপ্রথম মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি অংশ হিসেবে নৃত্যের ধারণাকে উল্লেখ করেছিলেন। তার মূল লেখাটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল কিন্তু ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তা অপ্রকাশিত ছিল।[১১] তার এই ধারণাটি পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে গিয়ে প্রমাণিত হয়। ১৯৯৩ সালে NCCAM এডিটিএ'কে (ADTA) প্রথম অনুদান প্রদান করে কেননা তারা চিকিৎসা রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিকে[১২] সংযুক্ত করে চিকিৎসা ও অনুসন্ধান করেছিল।

২.২ ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির ভিত্তি

'শরীর এবং মন পরস্পর ক্রিয়াশীল' এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মূলত ডিএমটি তত্ত্ব গঠিত। শরীর, মন এবং আত্মার ঐক্যের মাধ্যমে এ চিকিৎসা পদ্ধতি একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণতার অনুভূতি প্রদান করে। শরীর বলতে মস্তিস্ক দ্বারা প্রাপ্ত উদ্দীপনার জন্য পেশী-কঙ্কালের প্রতিক্রিয়ায় শক্তির নিঃসরণকে বোঝায়। মন বলতে বোঝায় মানসিক ক্রিয়া, যেমন: স্মৃতি, চিত্রকল্প, উপলব্ধি, মনোযোগ, মূল্যায়ন, যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অন্যদিকে আত্মা বলতে বোঝায়, নৃত্যের সাথে জড়িত বা সহানুভূতিশীলভাবে পর্যবেক্ষণ করার বিষয়গত অভিজ্ঞতার অনুভূতি।[১৩] দ্বৈতবাদী মন ও শরীরের ওপর ভিত্তি করে, ব্যক্তির সচেতন এবং অচেতন উভয় গতিময়তাই ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে এবং তার ব্যক্তিত্বকেও প্রতিফলিত করে। যেহেতু, শরীর এবং মন একে অপরের সাথে সংযুক্ত, তাই একটির পরিবর্তন অন্যটিকে প্রভাবিত করে। ডিএমটি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দিকগুলিকে প্রকাশ করে এবং চিকিৎসা গ্রহণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অমৌখিক

উপায়ে যোগাযোগ করে। সুতরাং, চিকিৎসক ও চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির সম্পর্ক মূলত অমৌখিক বা শারীরিক ভাষার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়। নৃত্যের ভঙ্গিমা এবং এর গতিশীলতার একটি প্রতীকী ভূমিকা আছে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং এটি নিজেকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। ডিএমটি ব্যক্তির সামাজিক দক্ষতা উন্নত করতে কাজ করে, সেইসাথে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে, যা পুনর্বাসনমূলক চিকিৎসার অন্যান্য রূপ থেকে আলাদা। কারণ, এটি ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে তার সৃজনশীল অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয়।

২.৩ ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির কার্যপদ্ধতি

ডিএমটি মনস্তাত্ত্বিক রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসার এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে মনোজাগতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যবহার করা হয় এবং গতিশীল অঙ্গসঞ্চালনার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার বহিঃপ্রকাশকে সহায়তা করে। ডিএমটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত কিছু তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকতে হবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জগৎকে সহজেই বাইরে জগতের সাথে চিকিৎসা ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। ডিএমটিতে মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা তত্ত্ব (Psychodynamic theory), মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞান (Humanistic Psychology), সমন্বিত নিরাময়িক চিকিৎসা (Integrative theory) এবং জ্ঞানীয় আচরণীয় নিরাময়িক (Cognitive behavioral therapy) চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে এর কয়েকটি তত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

১। মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা তত্ত্ব (Psychodynamic theory): এই তত্ত্ব মূলত মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল এবং এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক নিরাময়িক পদ্ধতি। এ তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবচেতন বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করে তার মানসিক উত্তেজনা দূর করা। চরম মানসিক চাপের কারণে ব্যক্তির যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, সে দ্বন্দ্ব নিরসনে এই তত্ত্ব কাজ করে থাকে।

২। মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞান (Humanistic Psychology): এই মনোবিজ্ঞান মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব এবং বিএফ স্কিনারের (B.F. Skinner) আচরণবাদ তত্ত্বের সমন্বয়ে উদ্ভূত হয়েছিল। ১৯৫০-এর দশকে ব্যক্তির সক্ষমতা, সৃজনশীলতার উপলব্ধি এবং তা প্রকাশ করার প্রক্রিয়া হিসেবে এ মনোবিজ্ঞান জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এ মনোবিজ্ঞান নিজেকে এবং অন্যকে একটি সম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে বুঝতে সহায়তা করে এবং জীবনের বাঁধা-বিপত্তিকে স্বীকার করে তার সমাধানের প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়।

৩। সমন্বিত নিরাময়িক চিকিৎসা (Integrative therapy)**:** এক্ষেত্রে অনেকগুলো মনোজাগতিক তত্ত্বকে একত্র করে সমন্বিত চিকিৎসা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির কার্যকরী, জ্ঞান কেন্দ্রিক, আচরণগত এবং শরীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে তার সমস্ত সত্তাকে একত্র করার ইতিবাচক প্রচেষ্টা চালানো হয়। তারা কেন এবং কীভাবে কাজ করছে, তাও এখানে বিশ্লেষণ করা হয়।

৪। জ্ঞানীয় জ্ঞানকেন্দ্রিক আচরণীয় নিরাময়িক চিকিৎসা (Cognitive behavioral therapy): একজন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে জ্ঞানীয় আচরণীয় নিরাময়িক চিকিৎসা পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে তার বিষণ্নতা এবং উদ্বেগজনিত ব্যাধি কমাতে এ পদ্ধতি সহায়তা করে। এই থেরাপি ব্যক্তির সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তার ওপর ভিত্তি করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একইসাথে, ব্যক্তিকে তার মানসিক ব্যাধির সাথে মোকাবিলা করতে, তার ব্যাধির লক্ষণগুলি খুঁজে বের করতে এবং কার্যকরী কৌশল অনুসরণ করতে সহায়তা করে। কিছু কিছু ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট কতগুলো নির্দিষ্ট নৃত্যধারার (যেমন: ব্যালে, লোকনৃত্য, প্রভৃতি) মধ্য দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং উল্লেখিত তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। সৃজনশীল এবং অভিব্যক্তিমূলক এই নৃত্যগুলোর মধ্য দিয়ে মনোজাগতিক বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যবহার করে চিকিৎসা করলে, তা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হয়। উল্লেখ্য যে, কতগুলো ধাপ অনুসরণ করে এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পন্ন হয়। বেশিরভাগ ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি স্নাতক কার্যক্রমে সাধারণত অঙ্গসঞ্চালনা বিশ্লেষণ, পটভূমি ও রূপরেখা, মানব উন্নয়ন এবং উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞান অনুধাবনে প্রয়োজন।

বনি মিকুমস (Bonnie Meekums) নামক একজন থেরাপিস্ট তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির চারটি ধাপ বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো–

১। প্রস্তুতি (Preparation): ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির সর্বপ্রথম ধাপ হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব। এ পর্বে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে তৈরি করা হয়, যেন তিনি কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই চিকিৎসা নিতে সক্ষম হোন। এ পর্বে সাধারণত প্রাথমিক ব্যায়াম, শরীরকে সচল করা, লাফঝাঁপ, সীমিত পরিসরে দৌড় এবং নৃত্যের কিছু প্রাথমিক অঙ্গভঙ্গি করা হয়। যার মাধ্যমে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর সাথে ব্যক্তির একটি নিরাপদ জায়গা তৈরি হয় এবং সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠলে, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে একটি আনন্দদায়ক প্রক্রিয়া বলে মনে হয়।

২। উন্মেষপর্ব (Incubation): এ চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে উন্মেষপর্ব। এ পর্বে চিকিৎসক অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে তাদের অর্ন্তনিহিত মনের ভাষা উন্মেষ করার দিকে ধাবিত করেন। তিনি মৌখিকভাবে তাদেরকে অবচেতন মনের কল্পনায় যেতে উত্তেজিত করেন। ফলে ব্যক্তির মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ পরিবেশ তৈরি হয়, যা তার মনের ভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করার উপায়কে ত্বরান্বিত করে। ফলে একজন ব্যক্তি সহজেই তার চিন্তাভাবনা এবং মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়।

চিত্র ১: শিশুদের মানসিক বিকাশে ডিএমটির অভিনব কৌশল।
মাধ্যম: শ্রাবন্তী ঘোষ, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি অনুশীলনকারী, অভিনয়শিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও গবেষক।
Barrow-in-farness School, UK

৩। উদ্ভাসন (Illumination): উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতির তৃতীয় ধাপ হচ্ছে উদ্ভাসন। এই ধাপে ব্যক্তি নিজেকে নতুন করে জানতে এবং বুঝতে সক্ষম হোন এবং তার মনের ভাব প্রকাশ এই ধাপে আরো বেশি সহজ হয়। এই ধাপটি ব্যক্তির সচেতন কল্পনার সাথে সম্পর্কিত। অন্যান্য সঙ্গীর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি তার আত্মার প্রতিফলন ঘটান। যার দ্বারা তার অবচেতন মনের কল্পনাকে সহজেই উন্মোচন করা যায় এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সহজতর হয়। ফলে ব্যক্তির মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তবে লক্ষণীয় যে, এর প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই রকমই হতে পারে।

৪। মূল্যায়ন (Evaluation): ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে মূল্যায়ন। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিয়ে চিকিৎসক তার প্রতিক্রিয়া এই ধাপে ব্যক্ত করে থাকেন। বিশেষ এই চিকিৎসা পদ্ধতি কীভাবে একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং তার মানসিক দ্বন্দ্বকে ভেঙে নতুনভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে, চিকিৎসক সেসব দিকের তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক আলোচনা করেন। সুতরাং বলা যায়, এই পর্বটি মূলত ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির অর্ন্তদৃষ্টি এবং তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে।

৩। ডিএমটি যেভাবে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত

বর্তমানে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি (Dance Movement Therapy) শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়। যা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য, দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা দূরীকরণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শরীরের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সাথে ডিএমটি মোকাবিলা করে, যেমন: দুশ্চিন্তা, বাত, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, যোগাযোগের সমস্যা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মানসিক আঘাত পরবর্তী পীড়নমূলক মনোবিকৃতি ইত্যাদি। ব্যক্তি বিশেষে ডিএমটির প্রয়োগ আলাদা হতে পারে কেননা, প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তার অনুভূতি এবং অভিব্যক্তি আলাদা। ফলে সবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক

চিকিৎসার একই পদ্ধতি কার্যকরী হয় না। ক্যারোলিন কিন্সলে (Caroline Kinsely) নামক একজন ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট এ বিষয়ে বলেছেন, এ প্রক্রিয়াটি মৌখিক থেকে অমৌখিক বা নৃত্যের অঙ্গসঞ্চালনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় একজন চিকিৎসক চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে তার সমস্যা খুঁজে বের করতে, তার আবেগের সাথে সংযোগ ঘটাতে এবং শরীরের নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে সহায়তা করবেন।[১৪] এছাড়াও, ডিএমটি শারীরিক সংবেদন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করে, একইসাথে ব্যক্তির স্ব-অভিব্যক্তিপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালনার মাধ্যমে তাকে নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করে।

৩.১ ডিএমটিতে বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালনার প্রয়োগ

ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিতে বিভিন্ন রকম অঙ্গসঞ্চালনা করা হয়। মুক্ত অঙ্গভঙ্গি থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট যেকোনো নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি (যেমন: লোকনৃত্য, সমসাময়িক নৃত্য) অথবা শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন হস্তমুদ্রা, শারীরিক এবং মৌখিক অভিব্যক্তি ডিএমটিতে সফলভাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে ব্যক্তির অবচেতন বা মনের অভ্যন্তরীণ ভাব সহজেই তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে ওঠে। যেমন–

১। হস্তমুদ্রা (হাত দ্বারা পরিচালিত ভাষা): ব্যক্তির মনের ভাব প্রকাশে, কোনো কাহিনী বর্ণনায়, কোনো কিছুর ইঙ্গিতে অথবা, ব্যক্তির জীবন কাহিনী বর্ণনার একটি হাতিয়ার হিসেবে হস্তমুদ্রার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন পশুপাখি নির্দেশ করতে এবং দূর-দূরান্তের কোনো কিছুকে ইঙ্গিত করতে হস্তমুদ্রার ব্যবহার করা হয়।

২। নবরস: নয়টি রসের সমষ্টিকে একত্রে নবরস বলে। মানুষের মনের যেকোনো সময়ের এবং যেকোনো অবস্থার অনুভূতি এই নবরসের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। নবরস ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশের মাধ্যমে তাকে মানসিক মুক্তি দিতে সহায়তা করে। নবরসে প্রতিটি রসের ভাব এবং প্রকাশের অভিব্যক্তি আলাদা। ভারতীয় রসশাস্ত্রে নয়টি রস হলো: শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং শান্ত রস। শৃঙ্গার রস দ্বারা ভালোবাসা প্রকাশ পায়। হাস্যরসের মাধ্যমে আমোদ এবং হাস্যরসাত্মক ঘটনার উপস্থাপন করা হয়। করুণ রস দ্বারা দুঃখভাব, রৌদ্ররসে ভয়ানক ভাব, বীর রসে সাহসিকতা, ভয়ানক রসে ভয় এবং আতঙ্ক, বীভৎস রসে ঘৃণা এবং কদর্যভাব এবং অদ্ভুত রসে বিস্ময়ভাব প্রকাশ পায়। পরিশেষে, শান্ত রস দেহ ও আত্মার প্রশান্তি ভাবের প্রকাশক।

৩। মৌখিক অভিব্যক্তি: মৌখিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে মুখের পেশির ব্যায়াম হয়। মৌখিক অভিব্যক্তির সাথে হস্তমুদ্রা, দৃষ্টির সংযোগ এবং তাদের সমন্বয় করে কাজ করার যে বাহ্যিক অনুশীলন, তা ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিতে প্রয়োগ করা হয়। ফলে ব্যক্তির মনোযোগ এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মুখের পেশির ব্যায়ামের ফলে ত্বকও মসৃণ থাকে।

৪। ছন্দ: ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিতে একজন ব্যক্তি শাস্ত্রীয় অথবা আধুনিক নৃত্যের ছন্দে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অনুশীলন করে থাকেন। যার মাধ্যমে ব্যক্তির দুই বা একাধিক কাজের সমন্বয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেমন: হাত, পা, দৃষ্টি এবং অভিব্যক্তির দিকে একইসাথে খেয়াল রাখতে

হয়, ফলে মস্তিস্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এই অনুশীলন মানসিক চাপ কমাতে এবং সামগ্রিক সুস্থতা অর্জনেও সহায়তা করে।

৫। শারীরিক অঙ্গভঙ্গির প্রকৃতি: নৃত্যের শারীরিক অঙ্গভঙ্গির প্রকৃতি ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণ গড়ে তুলতে এবং তার চর্চা চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। যেমন: ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে 'মণিপুরী নৃত্যের' কোমল এবং ঢেউ খেলানো অঙ্গভঙ্গি ব্যক্তির মধ্যে করুণা, শান্তভাব এবং কোমলতার বহিঃপ্রকাশে সহায়তা করে। কত্থক নৃত্যের দ্রুতলয়ের পদচারণা একজন ব্যক্তির মধ্যকার রাগ এবং জেদ কমাতে সহায়তা করে। আবার ভরতনাট্যমের হাত, পা এবং শরীরের যে জ্যামিতিক অবস্থান ও ভঙ্গিমা, তা ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

চিত্র ২: বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা গ্রহণকারী দল।
মাধ্যম: শ্রাবন্তী ঘোষ, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি অনুশীলনকারী, অভিনয়শিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও গবেষক।
Barrow-in-farness-এ ইউকে সভাকক্ষের সদস্যরা।

৮। বৃত্তাকার অঙ্গসঞ্চালনা: একটি দলের বৃত্তাকার অঙ্গভঙ্গি, কোমর বেঁধে নাচ করা, বিশেষ করে দলগত যে নৃত্যগুলো রয়েছে তার মধ্য দিয়ে সকলের একত্রে কাজ করার ক্ষমতা, দক্ষতা এবং একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এ নৃত্যদৃশ্য বেশি দেখা যায়। যেমন: সাঁওতালদের 'দশাই ও লুঙ্গিপাঁচি নৃত্য, চাকমাদের ঝুমুর ও মারমাদের বাঁশনৃত্য, গারোদের ওয়ানগালা ও জুম নৃত্য উল্লেখযোগ্য। এসব নৃত্যে তাদের একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং ছন্দসমতা লক্ষ করা যায়।

৯। স্বাধীন ও মুক্ত শারীরিক অঙ্গভঙ্গি: এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো তার অভ্যন্তরীণ ধ্যান-ধারণা এবং কল্পচিত্রকে আশ্রয় করে অনবরত অঙ্গসঞ্চালন করে থাকেন, যা তৎক্ষণাৎ তার শরীরের জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে অভ্যন্তরীণ মুক্তি ঘটাতে সহায়তা করে। একইসাথে তার

একটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তৈরি হয় এবং সে নিজের মুক্তির আনন্দ লাভ করে।

১০। নির্দেশিত চিত্রসহ ধ্যান: চিকিৎসক এক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে কোনো একটি চিত্র কল্পনা করতে উদ্দীপিত করেন, ফলে ব্যক্তি তার নিজ কল্পনা এবং চিকিৎসকের সহায়তায় একটি কল্পনাচিত্র অঙ্কন করেন এবং ধ্যানের অনুশীলন করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসক ব্যক্তির কল্পনার ওপর ভিত্তি করে, তার সমস্যা খুঁজে বের করেন এবং তাকে কার্যকরী চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

চিত্র ৩: প্রশিক্ষণের সহায়তায় চিকিৎসা গ্রহণকারীদের ভিন্নধর্মী দৃশ্য।
মাধ্যম: শ্রাবন্তী ঘোষ, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি অনুশীলনকারী, অভিনয়শিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও গবেষক।
St Xavier's College, Burdwan

১১। নিরাময়: চিকিৎসক একজন ব্যক্তির সমস্যার ওপর ভিত্তি করে তার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। যা ব্যক্তিকে তার সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে এবং নিরাময় লাভের পক্ষে সহযোগী হয়। রোগীদের চাহিদা এবং লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে শারীরিক, মানসিক, জ্ঞানীয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। কেননা, প্রতিটি ব্যক্তির চ্যালেঞ্জ আলাদা এবং তাদের প্রয়োজনানুসারে চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগও আলাদা। যেমন: সামাজিক সমস্যাজনিত কোনো ব্যক্তি এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করার পাশাপাশি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং দক্ষতার অনুশীলন করে যেতে পারেন।

৩.২ ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির উপকারিতা

২০১৯ সালের একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি হতাশাগ্রস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসার জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ, যা উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা কমাতে সাহায্য

করে। একইসাথে আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, জ্ঞানীয় দক্ষতা এবং জীবনের সামগ্রিক গুণমানকেও উন্নত করে। 'Journal of Eating Disorders'-এ ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি ছোট পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের খাবারে অরুচি বা খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে, ডিএমটি তাদের জন্য একটি পরিপূরক চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ গবেষণার জন্য গবেষকরা একটি বেসরকারি চিকিৎসালয় থেকে ১৪ জন রোগীকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তারা ৭ জন রোগীকে একটি সাধারণ চিকিৎসালয়ে এবং অন্য ৭ জন রোগীকে ডিএমটি দলে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। চিকিৎসার ১৪ সপ্তাহ পরে, অন্য দলের তুলনায় ডিএমটি দলের সদস্যদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছে।[১৫] এছাড়াও–

১। ডিএমটি মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি বিষণ্নতা, একাকিত্ব, অবসাদ, খাবারের প্রতি অরুচি, কথা বলার সমস্যা, মানসিক আঘাত পরবর্তী পীড়নমূলক মনোবিকৃতি ইত্যাদি দূর করতে সহায়তা করে। শরীরের ওপর জোর দেওয়া, শারীরিক এবং মানসিক সংবেদন শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা বিকাশে এই চিকিৎসা পদ্ধতি সহায়তা করে।

২। বিভিন্নভাবে যারা হয়রানির শিকার বা কোনো মানসিক আঘাত দুঃস্বপ্নের মতো বহন করে চলেছে, তাদের জন্য ডিএমটির চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী। এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এমনকী, ব্যক্তির দক্ষতা, জ্ঞান এবং জীবনের সামগ্রিক মানকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

৩। ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেকে অন্বেষণ করা যায়। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের আবেগের সাথে একটি সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সংযোগ শরীরের সংবেদন এবং শ্বাসক্রিয়াকে সঞ্চালিত করে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট এমন একটি কৌশল ব্যবহার করেন, যা অন্যান্য ব্যক্তির গতিবিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে এই প্রক্রিয়ার সাথে সকল বয়সের মানুষ সহজেই সংযুক্ত হতে পারে।

৪। ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতি একজন ব্যক্তির জীবনকালের বিকাশকে সহজ করে; স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যাকে প্রতিরোধ, নির্ণয় এবং কার্যকরী চিকিৎসা গ্রহণে সহায়তা করে; চিকিৎসা লক্ষ্যগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা এবং পেশিবহুল ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। এটি ছোট বাচ্চাদের আগ্রাসন অস্থিরতায় বিশেষভাবে উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।[১৬]

৫। শারীরিক সমস্যা যেমন: দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, স্থূলতা, কর্কটরোগ, বাত, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগের সমস্যা, আঘাত পরর্বতী মানসিক চাপ, আত্মসংবৃতি বা আত্মলীনতার মতো মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসায়ও এই চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ, যা ব্যক্তির মনে সাহস জোগায় এবং প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করতে সহায়তা করে।[১৭]

চিত্র ৪: চিকিৎসক এবং চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ডিএমটির দিকনির্দেশনার দৃশ্য।
মাধ্যম: শ্রাবন্তী ঘোষ, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি অনুশীলনকারী, অভিনয়শিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও গবেষক।
Barrow-in-farness এ ইউকে সভাকক্ষের সদস্যরা।

তবে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা, স্বাস্থ্যের সীমাবদ্ধতা, সংবেদনশীল অনুভূতি এবং পারিপার্শ্বিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টিপাত করতে হবে। আবার, কিছু কিছু শর্তের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার করা উচিত নয়। যাদের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যাভ্যাস জনিত সমস্যা যেমন: অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা (Anorexia Nervosa)-র মতো গুরুতর সমস্যাগুলো রয়েছে, তারা মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।

৪। সাক্ষাৎকার

এই গবেষণার জন্য তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যারা একইসাথে নৃত্যশিল্পী, ডিএমটি প্রশিক্ষক এবং চিকিৎসক। তাদের বাস্তবিক ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা, চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সাথে সামাজিক ও মানসিক মিথস্ক্রিয়া, ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতি, কার্যপ্রণালি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবান তথ্যের বিশ্লেষণ এই গবেষণাটির মান বৃদ্ধি করেছে বলে আমরা মনে করি। একই সাথে এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে নতুনভাবে প্রসারেও সহায়তা করবে।

৪.১ সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ১

ফারজানা মিতা, তিনি একজন নৃত্য প্রশিক্ষক এবং ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট। লিঙ্গ পরিচয়ে তিনি একজন নারী, বয়স ৩০। তিনি বাংলাদেশের একজন অগ্রগামী ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম ডিএমটির উদ্বোধনী ক্লাস শুরু করেন। তিনি 'নির্বাণ (Nirvana): দ্য থেরাপিউটিক এরা অব ডান্স' এবং 'IHSB Dance Studio'-এর স্বপ্নদর্শী প্রতিষ্ঠাতা।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি আশ্রয় কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন। সম্প্রতি তিনি BNWLA (Bangladesh National Women Lawyers' Association)-এর Shelter Home-এর সাথেও কাজ করেছেন। এই গবেষণার সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ২০০৯ সালে পায়ের অস্থিবন্ধনীতে আঘাতের সম্মুখীন হয়ে প্রথমবারের মতো তিনি পরোক্ষভাবে ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হন। অস্ত্রোপচারের বিকল্প হিসেবে তিনি শরীর প্রসারিতকরণ এবং কত্থক নৃত্যের পায়ের কাজের অনুশীলনকে বাছাই করে নিয়েছিলেন। যা তাকে সফলভাবে পুনরুদ্ধারের দিকে পরিচালিত করেছে। পরবর্তীতে তিনি বলেন, ডিএমটিতে নাচের গতিবিধি আবেগের প্রকাশকে সহজ করে তোলে, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়ায় এবং দেহের অভ্যন্তরে শিথিলতা ছড়িয়ে দেয়।

ডিএমটির চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ চিকিৎসা পদ্ধতি রোগীদের চাহিদা এবং লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে শারীরিক, মানসিক, জ্ঞানীয় এবং সামাজিক পর্যায়ে বিভক্ত করে। যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির চ্যালেঞ্জ আলাদা এবং তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলো মোকাবিলা করার জন্য কতগুলো পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। যেমন: সামাজিক সমস্যাজনিত কোনো ব্যক্তি ডিএমটির মাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও দক্ষতা অনুশীলন করতে পারেন। তবে তিনি এটিও বলেন যে, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্টরা সাধারণত রোগীদেরকে কঠোর পর্যায়ে বিভক্ত করেন না, কেননা চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এখানে মূলত ব্যক্তির সমস্যা এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন: বিষণ্নতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে মানসিকভাবে সুস্থতা প্রদানের জন্য চিত্তবিনোদনমূলক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। আবার যে ব্যক্তির রাগ সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, তার মানসিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এবং রাগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট নৃত্যভঙ্গিমা প্রয়োগ করা হয়। ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গির প্রয়োগ বিষয়ে তিনি বলেন, চিকিৎসকরা সমসাময়িক, ঐতিহ্যবাহী, শাস্ত্রীয়সহ বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গিকে এ চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন, যা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হয়। এছাড়াও এই চিকিৎসা পদ্ধতি শাস্ত্রীয় নৃত্যের মুদ্রা, ভঙ্গিমা, এমনকি যোগব্যায়ামকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। রোগীদের সাথে চিকিৎসকদের সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি রোগী স্বতন্ত্র ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে পারে। গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বা মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের ক্ষেত্রে নিবিড় এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

একজন রোগীর স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছানোর সময়কাল তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার তীব্রতা, তার ব্যক্তিগত প্রস্তুতি, বাহ্যিক সহায়তা এবং ব্যবহৃত নিরাময়িক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এছাড়াও ডিএমটিতে প্রতিফলন পদ্ধতি (Mirroring), কল্পনাপ্রসূত পদ্ধতি (Guided Imagery Technique), উদ্ভাবনামূলক পদ্ধতি (Improvisation), ঐতিহ্যবাহী, লোকজ এবং শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলীর অঙ্গভঙ্গিও অনুশীলন করা হয়। ব্যক্তিগত চাহিদা এবং লক্ষ্যগুলিকে পূরণ

করার জন্য এসব পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। তিনি বলেন, মনোযোগের ঘাটতির রোগ (ADHD-Attention-deficit/hyperactivity disorder), আত্মলীনতা (Autism), বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সংক্রান্ত বিভাগ (Geriatrics), স্নায়ু-অধঃপতনজনিত রোগসহ (Parkinson's Disease) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছেন এবং তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক্ষত্রে অবিশ্বাস্যভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে, কেননা তিনি প্রত্যক্ষভাবে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং মানসিক অভিব্যক্তির দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ডিএমটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, চিকিৎসক এবং চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে মনোজাগতিক সম্পর্কের ওপর জোর প্রদান করা। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা প্রদান করার লক্ষ্যে পরিবেশ তৈরি করার ভিত্তি হচ্ছে আস্থা, সহানুভূতি, গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা। ব্যক্তির সাথে তার আবেগের সংযোগ, মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পদ্ধতি হচ্ছে ডিএমটি।

৪.২ সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ২

শ্রাবন্তী ঘোষ, তিনি একজন অভিনয়শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, গবেষক এবং ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি অনুশীলনকারী। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিম-উর্ধ্ব এবং লিঙ্গ পরিচয়ে তিনি একজন নারী। তিনি কলকাতার বাগবাজারের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি কলকাতা সানভেদের 'ডকুমেন্টেশন এসোসিয়েটের' পরামর্শদাতা। দেশেবিদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি জড়িত এবং তাঁর কাজের জন্য তিনি বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন। এই গবেষণার সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকে তাঁর ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির যাত্রা শুরু হয়। 'Kolkata Sanved' এবং 'Tata Institute of Social Sciences' থেকে ডিপ্লোমা শেষ করে তিনি বিভিন্ন সংস্থা, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুলের বাচ্চাদের নিয়েও দীর্ঘসময় কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি ডিএমটি কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। এর কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, ডিএমটি মূলত শরীর ও মনের সংযোগ স্থাপন করে। এই পদ্ধতি শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্যই নয়, বরং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত কার্যকরী।

এটি যেমন ব্যক্তির দেহকে চিনতে শেখায়, তার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানায়, তেমনি মনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতি সম্পর্কেও তাকে সচেতন করে। এই পদ্ধতি যেমন নিজের প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন গড়ে তোলে, তেমনি পারিপার্শ্বিক দেখার, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করার দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে দেয়। তিনি আরো বলেন, ডিএমটির জন্য নাচের কোনোরকম পূর্ব প্রশিক্ষণ থাকা জরুরি নয় এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ডিএমটির বিভিন্ন কাজ প্রচলিত রয়েছে। ড. সোহিনী চক্রবর্তী ও কলকাতা সানভেদ দ্বারা গড়ে ওঠা ডিএমটি প্রক্রিয়াটিতে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে মনোসামাজিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের কথা বলে। এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিরা বিভিন্ন পেশার বা বয়সের হতে পারে কেননা, যেকোনো ব্যক্তি তার সার্বিক সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির সংস্পর্শে আসতে পারেন।

এছাড়াও যারা বিভিন্ন দৈহিক বা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভুগছেন, তারাও এই চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। বয়স এক্ষেত্রে কোনো প্রকারের বাঁধা সৃষ্টি করে না।

এছাড়াও তিনি বলেন, এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যক্তির সমস্যার প্রাবল্য অনুযায়ী একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। রোগীর প্রয়োজনানুসারে চিকিৎসকরা কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তার চিকিৎসা প্রদান প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করেন। কখনো কখনো এই প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়সীমাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে আবার পূর্বেও শেষ হতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য যারা চিকিৎসাধীন, তাঁদের জন্য ডিএমটি একটি অন্যতম বিকল্প হতে পারে। এর কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি না থাকলেও, এখানে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে চিকিৎসা পদ্ধতি বাছাই করে নেয়া হয়, যা চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য কার্যকরী হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে মুদ্রার ব্যবহারে বিভিন্ন চিকিৎসা বিদ্যাগত উপাদান লুকিয়ে আছে। ডিএমটি যেহেতু অনুভূতি প্রকাশের পথ, তাই অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব ইচ্ছার ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়, ব্যক্তি যে ধরনের অঙ্গভঙ্গি করেন তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ চিকিৎসা পদ্ধতি মন ও শরীরের জড়তা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। আত্মোপলব্ধি, নিজেকে জানা, মনঃসংযোগ ঘটানো, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, দেহ ও মনের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ব্যক্তির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জগতের সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে তার ভালো থাকার জন্য পথ খুঁজে পেতে ডিএমটি সহায়তা করে। এছাড়াও, বিভিন্ন উচ্চতা, গতি, তাল-লয়-ছন্দের মাধ্যমে শরীর ও মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ করে দেয় এ চিকিৎসা পদ্ধতি। তিনি এই সাক্ষাৎকারে একটি শিশুর প্রত্যক্ষ পরিবর্তন বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিশুটি শ্রেণিকক্ষে এসে প্রতিদিন কান্না করত এবং শুরুর দিকে সে নিজেকে একেবারেই প্রকাশ করেনি। কিন্তু বেশকিছু কর্মশালায় যোগ দেওয়ার পর সে নিজেকে ধীরে ধীরে মানিয়ে নেয়। তারপর থেকে সে নিজেই অনেক গল্প করত।

তার জড়তা কাটিয়ে উঠতে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে ডিএমটি তাকে সর্বোচ্চ সহায়তা করেছে। পরিশেষে তিনি বলেন, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি একটি চমৎকার এবং নিরাপদ স্থান তৈরি করে, যেখানে চিকিৎসক ও চিকিৎসা গ্রহণকারী সমান মর্যাদার সাথে অবস্থান করেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতি এটি নিশ্চিত করে যে, কোনোরকম বাঁধা ব্যতীত একজন ব্যক্তি যেন তার নিজের মতো করে স্বাধীন অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে তার জড়তা এবং সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

৪.৩ সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ৩

নোয়েল দত্ত, তিনি একজন মণিপুরী নৃত্যশিল্পী এবং ডান্স মুভমেন্ট সাইকোথেরাপিস্ট (Dance Movement Psychotherapist)। তার বয়স পঁয়ত্রিশ এবং লিঙ্গ পরিচয়ে তিনি একজন নারী। তিনি লন্ডনের বোর্ড দ্বারা প্রত্যয়নকৃত ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট (Board Certified Dance Movement Therapist) এবং 'প্রাপ্তবয়স্ক এবং যৌন নির্যাতন সহায়তা কেন্দ্র'-এর পরামর্শদাতা। একইসাথে তিনি 'মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমিক চিকিৎসা অনুশীলনকারী (Psychological first aid practitioner)'। তিনি ভারতের ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিস্ট সংস্থার পেশাদার সদস্য। ছয় বছর যাবত ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি নিয়ে কাজ করছেন তিনি।

ডিএমটি সম্পর্কে তিনি বলেন, ডিএমটির প্রধান চিকিৎসাবিদ্যাগত অস্ত্র হচ্ছে মানুষের শরীর এবং তার অঙ্গভঙ্গি। অবাচনিক মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুব সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করি, যেমন– একটি শিশু জন্ম গ্রহণ করার পর থেকেই তার মা-বাবার সাথে হাত-পা ছুঁড়ে বার্তা দেয়, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যোগাযোগ করে এবং তার মা-বাবা কিন্তু সে-কথা বুঝতে পারে। তিনি আরো বলেন, যেকোনো ভাষাই কিন্তু আমাদের শিখতে হয়, তবে অঙ্গভঙ্গির ভাষা হচ্ছে আন্তর্জাতিক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ৭৫% যোগাযোগ আমরা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে করে থাকি। আমরা যা ভাবি তা আমাদের অঙ্গভঙ্গি, কথা বলা, আচার-আচরণে প্রভাব ফেলে এবং প্রকাশ পায়। আমরা কথা না বলেও আমাদের পাশের মানুষটিকে বোঝাতে পারি যে, আমার মন খারাপ বা আমার রাগ হচ্ছে, যা মূলত আমাদের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, অনেক কিছুই থাকে যেটা আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, আমরা মনের মধ্যে চেপে রাখি। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি হচ্ছে এমন একটি ফর্ম, যা আমাদের শরীর এবং মনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং আমরা আমাদের চাপা দুঃখ, কষ্ট এবং অভিমান বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। তিনি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানান, এখানে কথাটা কিন্তু ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি। আমাকে অনেকে এসে প্রশ্ন করে, আমরা তো নাচ করতে পারি না, তাহলে কি আমরা এখানে অংশগ্রহণ করতে পারব না? আমি তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি নিঃশ্বাস নেন? আপনি কি হাই তোলেন? আপনি কি হাঁটাচলা করেন? তাহলে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি আপনার জন্য। কারণ এখানে নাচের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আলাদা। আপনি যেভাবে শরীরকে নাচাবেন, সেটা আপনার নাচ। এখানে কোনো ঠিক বা ভুল নেই। আপনার চিকিৎসক কখনোই আপনাকে বলবে না 'হাত টা আরো বড় করুন! শরীরের ভঙ্গিমাটা আরেকটু বাঁকা বা সোজা করুন!' এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা। মঞ্চে আমরা মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য নাচ করি, এখানে নাচ করি নিজেদের প্রকাশ করার জন্য।

ডিএমটি চিকিৎসাগ্রহণ সংক্রান্ত রোগীর সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা অন্যান্য সমস্যার রোগীরাও রয়েছে। তবে, মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে একাধিক ভাগ থাকতে পারে এবং এর প্রধান হলো মানসিক (Psychotic) এবং স্নায়বিক (Neurotic) রোগী। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তব জীবনের সাথে তাদের কোন পরিচিতি নেই, অন্যদিকে স্নায়বিক রোগীরা তাদের মানসিক অসুস্থতার সাথে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত এবং সমাজের ও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আরেকটি ভাগ হচ্ছে পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার (Personality disorder) বা ব্যক্তিত্বের রোগ। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। ডিএমটি রোগীদের সুস্থতার অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি জানান, রোগীদের সুস্থতার ক্ষেত্রে আমরা 'স্বাভাবিক বা পরিপূর্ণ সুস্থ' শব্দগুলো খুব কম ব্যবহার করি কারণ, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সুস্থ হওয়ার পুরোটাই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতার ওপর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুস্থতা যখন খুব চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে যায়, তখন সারাজীবনই কমবেশি থেরাপি এবং ঔষধের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। কখনো কখনো অসুস্থতা পুনরায় ফিরে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে থেরাপি আবার শুরু করতে হয়।

তবে আশার কথা হচ্ছে, মানুষের সমস্যা যেহেতু দৈনন্দিন জীবনযাপন সংক্রান্ত, যাকে বলা হয় 'মাইল্ড টু মডারেট কনসার্নস (Mild to Moderate Concerns)', সেখানে রোগীদের তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে ডিএমটির চিকিৎসা প্রয়োগ করা সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ নতুন বইয়ের মতো এবং প্রত্যেকের সমস্যা আলাদা। চারজন ব্যক্তির মানসিক সমস্যা এক হলেও, তাদের সমাধান আলাদা আলাদা হতে পারে কারণ কোন ব্যক্তিকে কোন অঙ্গভঙ্গির দ্বারা নিরাময় চিকিৎসা দিতে হবে, সেটা তার থেরাপি সেশন (Therapy Session) থেকে বোঝা যায়। মানুষের চিন্তা-ভাবনা প্রতিনিয়ত পাল্টায়, তার সাথে সাথে মানুষের অঙ্গভঙ্গি এবং শব্দভাণ্ডারও পাল্টে যায়। তাই ডিএমটির চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যক্তির মানসিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে অঙ্গভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়। এরকম ভাবলে চলবে না যে, এই অঙ্গভঙ্গি আগে সাহায্য করেছিল এখন কেনো করছে না। ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটা ঔষধের মতো, ঔষধ যেমন বারবার পরিবর্তন করতে হয়, তেমনি অঙ্গভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি।

ডিএমটি রোগীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, ডিএমটিতে একজন রোগীকে কোন নির্দেশ ছাড়াই অঙ্গভঙ্গি করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতি বা নিয়মকানুন নেই, যা ব্যক্তিকে সহজভাবে প্রকাশ করতে এবং তার নিরাময়ে সাহায্য করে। শাস্ত্রীয় কত্থক নৃত্যের দ্রুতলয়ের পায়ের কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, ডিএমটিতে মাটি একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। তার কারণ মাটি আমাদের দেহের ভার বহন করে। মাটিতে আমরা যেভাবে আঘাত করি, পা ফেলি সেটা অনেক ভাবে আমাদের মানসিক স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। দ্রুতলয়ের পায়ের কাজে পায়ের প্রতিটা পেশিকে শরীর অনুভব করে, যা ব্যক্তির রাগ কমাতে সাহায্য করে, তেমনি সমতা ফিরিয়ে আনতে ও বজায় রাখতে সাহায্য করে। ডিএমটিতে একে বলা হয় 'গ্রাউন্ডিং টেকনিক্স' বা মুভমেন্ট।

সাক্ষাৎকারের শেষ পর্যায়ে নোয়েল দত্ত বলেন, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি সবার জন্য, এটি উন্মুক্ত। যার একটা শরীর এবং মন আছে সেই পারে ডিএমটির সাহায্য নিতে। বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি আমাদের সহজভাবেই আসে। আমরা মায়ের পেটের ভেতর থেকেই অঙ্গভঙ্গি শুরু করি। তিনি আরো বলেন, We Are Born With Movements, তাই যেটা আমাদের সহজভাবে আসে সেটা নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে! তাহলে মানেটা দাঁড়ায় যে, আমরা যেভাবে নিজেদেরকে সুস্থ করে তুলতে পারি সেটা প্রথম থেকেই আমাদের শরীরের মধ্যে বিদ্যমান, আমরা এখানে বাইরের কোন জিনিস ব্যবহার করছি না। আমাদের যখন মন খারাপ হয় বা দুশ্চিন্তা হয়, তখন পেটে ব্যথা, ঘাড় বা মাথা ব্যথাও হতে পারে, তাই প্রথমেই উচিত শরীর দিয়ে শরীরের ওপর কাজ করা। ডিএমটিতে এই কাজটাই করা হয়। পরিশেষে তিনি বলে, 'We use the body and its movement as the main therapeutic tool and that gives us ownership into our healing process.'

উপসংহার

প্রত্যেকটি কলাই নিজ গুণে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শিল্প মাধ্যমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হচ্ছে নৃত্যকলা। বর্তমান সময়ে নৃত্য শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শিল্প বা বিনোদনের গণ্ডি পেরিয়ে একটি বৃহৎ পরিসরে অবস্থান করে নিয়েছে। একালে আধুনিক গবেষণা বলছে, নৃত্যের মাধ্যমে নিজেকে আবিষ্কার করা যায়, ফলে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের চিকিৎসকরা ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর জোর দিচ্ছেন। নৃত্য যেহেতু আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে সাহায্য করে, তাই নৃত্যের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। ১০০০ জন নৃত্যশিল্পীর ওপর একটি সমীক্ষা করে দেখা গেছে, নৃত্য তাদের স্বাস্থ্য এবং মানসিক উন্নতিকরণে সর্বত্র সহায়তা করেছে। এই গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণেও দেখা যায়, ডিএমটি একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রদানে সহায়তা করে। চিকিৎসকদের ভাষ্যমতে, এ চিকিৎসা পদ্ধতি একটি যৌক্তিক এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে যা ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর। নৃত্য যেমন ব্যক্তির শরীর ও মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ায় তেমনি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে তুলতেও সহায়তা করে। 'The New England Journal of Medicine' নৃত্য, ব্যায়াম এবং শারীরিক বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন এমন কিছু মানুষের ওপর একটি গবেষণা করেছে। তারা ৭৫ বছরের বেশি বয়সী ৪৬৯ জন মানুষের মধ্যে অবসর, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং সময়ের সাথে স্মৃতিশক্তি হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনার একটি সংযোগ পরিমাপ করেছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যারা ডিএমটি নিয়েছেন তাদের কাউকেই স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।[১৮]

তাই বলা যায়, ডিএমটি সকল বয়সের মানুষের জন্য সুস্থ এবং শারীরিকভাবে সক্ষম থাকার একটি উপায় হতে পারে, যা ব্যক্তির হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসের উন্নতি ঘটায়, পেশিশক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে, ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করে, হাড়ের ক্ষয়রোধ করে, শারীরিক আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার সাথে সাথে সামাজিক দক্ষতার বিকাশেও সহায়তা করে।

একটি অস্ট্রেলিয়ান সমীক্ষা, ৪৮,০০০ ব্রিটিশ লোকদের তথ্য সংগ্রহ করেছে। উক্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা মধ্যম গতিশীলতার নৃত্যের সাথে সংযুক্ত তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম। যারা কখনো নৃত্যচর্চা করেন না, তাদের তুলনায় যারা নৃত্যশিল্পী বা নিয়মিত নৃত্যচর্চা করেন, তাদের হৃদপিণ্ডজনিত রোগ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৪৬% কম। নৃত্যের যে সামাজিক দিক এবং শিথিলতা রয়েছে, তাকে উক্ত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণ হিসেবে গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] এছাড়াও অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব রোগী স্তন ক্যান্সারের জন্য ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি নিয়েছেন, তাদের ওপর নৃত্যের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করার মতো। আত্মমগ্নতা রোগে আক্রান্ত (Autism) অথবা অতিরিক্ত ক্রোমোজোমজনিত সমস্যায় আক্রান্ত (Down Syndrome) শিশুদের জন্যও এই চিকিৎসা পদ্ধতি ভীষণভাবে সাহায্য করে। ২০২০ সালের একটি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ডিএমটি আত্মমগ্নতা রোগের নেতিবাচক লক্ষণগুলিকে কমায় এবং তার মধ্যে সহানুভূতি, শারীরিক সচেতনতা এবং আচরণের অন্যান্য দিকগুলোকে উন্নত করে। যেসব শিশুর মৃগীরোগ

আছে, ডিএমটির সাহায্যে তাদের চলাফেরা বা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। শিশুর ঔষধ গ্রহণের পাশাপাশি এ চিকিৎসা পদ্ধতি চালিয়ে গেলে, তার মস্তিষ্ককে আরো বেশি সক্রিয় ও সজাগ করে তোলা সম্ভব, যা শিশুর কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক। বর্তমান চিকিৎসকরা বলছেন, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মানসিক রোগ সম্পূর্ণ না সারানো গেলেও, এটি রোগীকে অনেক বেশি কর্মক্ষম করে তুলতে সক্ষম। যা তার শারীরিক, মানসিক এবং অন্যান্য আচরণগত পরিবর্তনের পরিপূরক চিকিৎসা হতে পারে।

সর্বোপরি বলা যায়, একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর নৃত্যের একটি কার্যকরী প্রভাব রয়েছে এবং যেকোনো বয়সের ব্যক্তির জন্য ডিএমটি একটি ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল ও বেসরকারি সংস্থার প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র পরিসরে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি কর্মশালা করানো হচ্ছে, ফলে মানুষ এর উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। আগামীর দিনগুলোতে এর কার্যকারিতা বৃহৎ পরিসরে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়, কেননা এই চিকিৎসা পদ্ধতি সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রেই এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে খুব সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে, যা আনন্দদায়ক উপায়ে এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে-কোনো বয়সের ব্যক্তির জন্য উপযোগী এবং সমানভাবে কার্যকর। তাই বলা যায়, ডিএমটি চিকিৎসা পদ্ধতি সমাজের পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধিতে, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে একইসাথে শারীরিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সানজিদা রুমি, *নৃত্যকলার ইতিহাস*, ২০১৭, আলোকরেখা (ব্লগ)। https://www.alokrekha.com/2017/08/blog-post_29. html (Accessed: March 7, 2024)

২. H. Schwartz, J. Crary, S. Kwinter (Ed.), 'Torque: The New Kinaesthetic of the Twentieth Century', *Incorporations: Zone 6*, Zone Books, New York, 1992, p. 70.

৩. Joan Chodorow, *Dance Therapy and Depth Psychology: The Moving Imagination,* Routledge Publication, London 1991, pp. 16- 23.

৪. Deborah Lee, What are the benefits of dancing?, 2020, Open Access Government (Website), https://www-openacessgovernment-org.translate.goog/benefits-of-dancing/127275/?_x_tr_sl=en&x tl_tl=bn&x tr hl=bn&x_tr_pto=rq#:text= Dancing%20exercises%20th%20heart%C%20lungs.requires%20cognitive%20skills%20and%20memory (Accessed: March 7, 2024)

৫. মুভমেন্ট থেরাপি, ডিসেম্বর ২৯, ২০১৫, হোয়াইট সোয়ান ফাউন্ডেশন (ব্লগ)। https://bengali.whiteswanfoundation.org/amp/story/mental-health-matters/understanding-mental-health/understanding-movement-therapy (Accessed: March 7, 2024)

৬. 'Free Moving' Dance has healing benefits for mental health, 2021, UCLA Health (Website), htts://www.uclahealth.org/news/free-moving-dance-has-healing-beneftis-for-people-with-mental-health-concerns (Accessed: March 7, 2024)

৭. Sara Lindberg, What is Dance Therapy? 2023, Verywell Mind (Website), https://www.verywellmind.com/dance-therapy-and-eating-disorder-treatment-5094952 (Accessed: March 7, 2024)
৮. তদেব।
৯. Christina Devereaux, Susan Kleinman, Grace Marie Mangino Johnson, Kelsey Witzling, 'American Dance Therapy Association Historical Timeline: 1966-2016', *American Journal of Dance Therapy,* 2016, pp. 437-454 (Accessed: March 7, 2024)
১০. John Chodorow, *Dance Therapy and Depth Psychology: The Moving Imagination,* Ibid, pp. 16-23.
১১. তদেব, পৃ. ১
১২. Emily Sexton, History of Dance and Movement Therapy, 2014, AroundtheO (Website), https://blogs.uoregon, edu/esextonw14/timeline/ Accessed: March 7, 2024)
১৩. Judith Hanna, 'The Power of Dance: Health and Healing, *'The Journal of Alternative and Complementary Medicine,* Vol. 1, No. 4, 2007, pp. 323-331, (Accessed: March 7, 2024)
১৪. Sara Lindberg, What Is Dance Therapy? 2023, Verywell Mind (Website), https://www.verywellmind.com/dance-therapy-and-eating-disorder-treatment-5094952 (Accessed: March 7, 2024)
১৫. M. Savidaki, S. Demirtoka, Rodriguez-Jimenez R-M, 'Re-inhabiting one's body: A pilot study on the effects of dance movement therapy on body image and alexithymia in eating disorders,*' Journal of Eating Disorders,* 2020, p. 22, (Access: March 7, 2024)
১৬. Anahita Khodabakshi Koolaee, Mehrnoosh Sabzian, Davood Tagvaee, 'Moving Toward Integration: Group Dance/Movement Therapy with Children in Anger and Anxiety. *'Middle East Journal of Nursing*, 2014, pp. 3-7. (Accessed: March, 7 2024)
১৭. Sara Lindberg, What is Dance Therapy? 2023, Verywell Mind (Website), Ibid.
১৮. 6 reasons to dance your way to health, 2018, British Heart Foundation (Website), https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/activity/6-reasons-to-dance-your- way-to-health (Accessed: March 7, 2024)
১৯. তদেব।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসের শৈলীবিচার

বেগম শারমিনুর নাহার*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শহীদুল জহির একটি স্বতন্ত্র স্বর। তাঁর *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি অনন্য দলিল। তিনি এই উপন্যাসে বাংলাদেশ জন্মের সময় থেকে পরবর্তী ১৫ বছরের রাজনৈতিক বাস্তবতা, পুরান ঢাকার লক্ষীবাজার এলাকার মানুষের মধ্য দিয়ে তুলে এনেছেন। প্রধানত অস্তিত্বের সংকট উপন্যাসের প্রধান অনুষঙ্গ হলেও লেখক প্রতীক, ইমেজ এবং স্বতন্ত্র বয়ানরীতি ব্যবহার করে উপন্যাসটি কালজয়ী করে তুলেছেন। এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস হলেও নিজস্ব স্টাইল, স্বতন্ত্র ভাষাভঙ্গি পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের দৃষ্টান্তবহ। ঢাকাইয়া ভাষা, যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, মানুষের বিপন্ন বিস্ময়, নায়ক আবদুল মজিদের সাহসী হতে না পারার প্রসঙ্গ মূলত রাজনীতিকে নয়, জীবনকে মনোস্তাত্ত্বিকভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন লেখক। কেন মানুষ রাজনীতির কাছে হেরে যায়? কেন সময়ের বদলের সঙ্গে মিথ্যার বদল ঘটে আবার কোনো কোনো সত্য মানুষ বংশানুক্রমে লালন করে, সেখানে সে পরাজিত হয় না। এমন কিছু চিরন্তন সত্য উপন্যাসটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বল্প আয়তনের এই উপন্যাসকে বিশ্বের যুদ্ধকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলোর সঙ্গে তুলনাও করেছেন সমালোচকরা। আমাদের আলোচনার বিষয় উপন্যাসটির ভাষাশৈলী বা স্টাইল। *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখকের ভাষিক স্বকীয়তা তুলে ধরাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

চাবি শব্দ: শহীদুল জহির, রাজনৈতিক বাস্তবতা, শৈলীবিচার, উপন্যাস।

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে শহীদুল জহির একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তিরিশোত্তর সাহিত্যধারার পথ পেরিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে আন্তর্জাতিক তত্ত্ব ও নির্মাণ শুরু হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র[১] মধ্য দিয়ে। সেই পথ অনুসরণ করেন প্রতিথযশা কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস[২]। শহীদুল জহির তার পরের প্রজন্ম। পূর্বতন দুই কথাশিল্পীর পথ অনুসরণ করেই দেখা যায় শহীদুল জহিরের রচনার সংখ্যা কম; মাত্র ৩টি ছোটগল্পের বই এবং ৪টি উপন্যাস। আমাদের আলোচ্য *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* লেখকের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাস শুরু হয় ১৯৮৫ সনের একদিনের বর্ণনা থেকে কিন্তু আদতে উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরের ঢাকা শহর। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটের পর কেবল ঢাকা নয় ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলাদেশ পাক বাহিনীর দখলে চলে যায়। আর তাদের সহযোগিতা করেন এ দেশীয় দালাল, ধর্মের ধ্বজাবাহী কতিপয় রাজাকার। তাদের তাণ্ডবলীলা এই উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসটি শুরু হয় একটি তারিখ দিয়ে, 'উনিশ শ পঁচাশি সনে একদিন'[৩] নায়ক আবদুল মজিদ একটি মাইকিং শুনে রায়সা বাজারে যাবার পথে ধমকে দাঁড়ান। 'তখন নবাবপুরের মানুষ আর

* জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ঢাকা

যানবাহনের শব্দ ও চাঞ্চল্যের ভেতর সে আরো অধিক কিছু অনুভব করে'[৪]। কখনও বাস্তব, কখনও রূপক আবার কখনও স্মৃতি এমনইভাবে উপন্যাসটির জমিন গড়ে ওঠছে।

এটি কোন বীরের কাহিনি নয়। এটি একজন পরাজিত মানুষের কাহিনি। যে মানুষ বারবার নিজের ভেতরে তাগিদ অনুভব করে তাকে সাহসী হতে হবে। তাকে প্রতিশোধ নিতে হবে। উঠে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সে পারে না। বাস্তবতা বদলে যায়। ক্ষমতাবানরা একত্র হয় আর সাধারণ মানুষ নিজেদের ভেতরে পরাজিত, নির্লিপ্ত, অসহায়, ভীতু হতে হতে একসময় নিজেদের পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে চলে যায়। তারা বুঝতে পারে সবার কথা ভেবে আর কিছুই সে করতে পারবে না। অবশেষে নিজের সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বার্থপর হয়, একলা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

২

শহীদুল জহির[৫] ব্যতিক্রমী ছিলেন, তেমনি লেখালেখির ক্ষেত্রেও হেঁটেছেন ভিন্ন পথে। তাঁর জন্ম ১৯৫৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকার নারিন্দার ৩৬নং ভূতের গলিতে (ভজহরি সাহা স্ট্রিট)। শহীদুল হক তাঁর মূল নাম, শহীদুল জহির তিনি লেখক নাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাবা এ কে নুরুল হকের সরকারি চাকরি সূত্রে ছোটবেলা থেকেই দেশের নানা জায়গায় বসবাসের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। বাবার পৈতৃক বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলারর হাশিল গ্রামে। শহীদুল জহিরের মা জাহানারা খাতুন, গৃহিনি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ৪ ভাই ও ৪ বোন। শহীদুল জহিরের পড়াশুনা শুরু পুরান ঢাকার সিলভারডেল কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে, এরপর ঢাকার কলিজিয়েট স্কুল, ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়ায়, পরে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়াশুনা শেষ করে ১৯৭৮ সালে অর্থমন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। ১৯৯০ সালে ফরাসি ভাষায় ডিপ্লোমা নিয়ে মার্কিন মুলুকে পড়তে যান। শুরুতে সহকারী সচিব, প্রধানমন্ত্রীর (২০০১) দফতরের উপসচিব, এবং শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

পঞ্চান্ন বছরের জীবনে শহীদুল জহিরের সাহিত্য সৃষ্টির পরিসর খুব দীর্ঘ নয়। তিনটি ছোটগল্প গ্রন্থ ও চারটি উপন্যাস লিখেছেন সবমিলিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের পরিবর্তন, বিশেষ করে মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এবং সেই স্বপ্ন পূরণের ব্যর্থতা শহীদুল জহিরকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। যদিও সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন না। তবে ঢাকা কলেজে পড়ার সময় 'মেননগ্রুপ' ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

> আমি মেননগ্রুপ করতাম। মেনন তো তখন ছাত্র ছিলেন না, তখন মাহবুবুল্লাহ বা অন্যরা ছিলেন। আমি পোস্টার লিখেছি, মিছিল-মিটিংয়ে গেছি, বিশেষ করে মাওলানা ভাসানীর মিটিংয়ে।[৬]

তাঁর প্রথম দিকের লেখায় বামপন্থি ভাবাদর্শ লক্ষ করা যায়। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পারাপার' (১৯৮৫)-এ প্রবল মার্কসীয় ভাবনার ছাপ রয়েছে। প্রথম উপন্যাস *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৮), *সে*

রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৫), *আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু* (২০০৯) এবং *মুখের দিকে দেখি* (২০০৬)– এই চারটি উপন্যাস। *পারাপার*-সহ আর দুটি গল্পগ্রন্থ হলো *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৯), *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪)।

ব্যক্তিগত জীবনে শহীদুল জহির আত্মমগ্ন মানুষ ছিলেন। তাঁকে কখনই কবি সাহিত্যিকদের আড্ডায় পাওয়া যেত না। কেউ ডাকলেও তিনি এড়িয়ে যেতেন। আবার কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। অকৃতদার ছিলেন। সরকারি বাসভবনে বসবাস করলেও মোটেও বিলাসী জীবন নয় বরং পরিমিত এবং পরিশীলিত জীবন ছিল তাঁর–

> গ্রন্থের প্রতি শহীদুল জহিরের ছিল তীব্র আকর্ষণ। কোনো বিষয়েই তাঁর উৎসাহের কমতি ছিল না। অধিকাংশ সময়ই তাঁর হাতে কোনো-না-কোনো বই থাকতো। বিশ্বের উঁচু মানের সাহিত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্রিকা বা ম্যাগাজিনও তাঁর হাতে দেখা যেত।[৭]

বিশ্বসাহিত্য প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন –

> জ্যাক লন্ডন আমার প্রিয় লেখক। তাঁর 'ট্যু বিল্ড এ ফায়ার' আমার পড়া গল্পগুলোর ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে মনে হয়। টলস্টয়, গোর্কি, হেমিংওয়ে, হেমিংওয়ের ছোটগল্প, শলোকভ, সিঙ্গার, সিঙ্গারের গল্প 'বোকা গিম্পেল'-এর কোনো তুলনা দেখি না, কাফ্কার কথা আর কী বলব, একটা 'মেটামরফোসিস' লেখাই তাঁর অবিস্মরণীয়তার জন্য যথেষ্ট ছিল। চেখভ খুব ভালো লাগে, তুর্গেনিভের লেখা আমার প্রিয়, কত যে লেখক আছেন এবং কত যে ভালো লেখা আছে পৃথিবীতে।[৮]

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসটি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি ১৯৭১ সালে পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার এলাকার শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন মহল্লার বাসিন্দাদের জীবন বাস্তবতা তুলে এনেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং এলাকার বদু মওলানা কীভাবে এখানকার মানুষের ওপর নির্যাতন করেছে, সেই চিত্র এই উপন্যাসে অভিনব গঠনরীতিতে বর্ণিত হয়েছে। বদু মওলানা একাত্তরে কাককে মাংস ছিটিয়ে ছিটিয়ে খাওয়াতো। এগুলো ছিল মানুষের মাংস। 'কাকের চিৎকার এবং উইপোকার নিঃশব্দ পলায়ন'কে 'নিরব সন্ত্রাস' বলে উপমার মাধ্যমে লেখা শুরু হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক আবদুল মজিদ। একাত্তরে সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়া একজন কিশোর। পরে ১৯৮৫ সনের একদিন একটি মাইকিংকে কেন্দ্র করে আবদুল মজিদের একাত্তরের স্মৃতি আবার ফিরে আসে। তার বোন মোমেনাকে নানা চেষ্টা করেও যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি, আজকে হরতালের মাইকিং আবার বোনের সেই বীভৎস, নৃশংস মৃত্যু মনে করিয়ে দেয়। কারণ স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি এবং স্বাধীনতা বিরোধীরা এখন এক হয়ে দেশের ক্ষমতায় এসেছে। তাই আবদুল মজিদ আবার ভয় পায়। সে জানে সাহসী সে হতে পারবে না। ইয়াসমিনের গলা জড়িয়ে ধরে সে বড়আপা-বড়আপা বলে কাঁদতে থাকে। পরে উপন্যাসের শেষে দেখা যায় আবদুল মজিদ স্ত্রী, কন্যা এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে লক্ষ্মীবাজার এলাকা ছেড়ে চলে যায়। উপন্যাসের নায়ক আবদুল মজিদ এতে খুব অনিরাপদ বোধ করে। মজিদ তার কন্যা সন্তান হলে বোনের নামে নাম রাখে মোমেনা। যে মোমেনাকে তারা নানা চেষ্টার পরেও একাত্তরে বদু মওলানার হাত থেকে রক্ষা

করতে পারেনি। পরে নিজের কন্যার নাম মোমেনা রাখায় বদু মওলানা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'কি বোনডিরে ভুলতে পারো নাই?' তখন আবদুল মজিদের মনে হয় মানুষ কেউ কিছু ভোলে না। সেটা যেমন আবদুল মজিদ ভোলেনি তেমনি যে নির্যাতন করেছে সেও ভোলেনি।

৩

শৈলী বা স্টাইল হচ্ছে লেখকের নিজস্ব ভাষাগত অবয়ব সংস্থানের ভিত্তি। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনসৃষ্টির সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কথাসাহিত্য তথা উপন্যাসের বর্ণনা, পরিচর্যা, পটভূমিকা, উপস্থাপন ও চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে স্বতন্ত্র ভাষাশৈলীর প্রয়োজন অনিবার্য। তাই যেকোনো উপন্যাসের লিখন শৈলী বা স্টাইল, যা নিঃসন্দেহে যে কোনো লেখকের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও সৃজনশীলতার পরিচয়কে তুলে ধরে।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে পুরান ঢাকার এক মহল্লার কথা বলা হয়েছে। যে মহল্লার বাসিন্দারা যুদ্ধের সময়কালে নির্মমতা, খুন ও ধর্ষণের শিকার হন। তারা বাস্তুহারা হয়ে পড়েন। মহল্লায় ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন বদু মাওলানা। তিনি পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেন। আর রাজনৈতিক দলের অন্য নেতারা ভারতে পালিয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাবর্তনের শক্তি হারিয়ে যায়। তারা ক্রমাগত নিজেদের সাহস হারায়, যদিও তারা বুঝতে পারে তাদের এখন সাহসী হওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যেক সৃষ্টিকর্মের একটি নিজস্ব শৈলী থাকে। লেখকের মানসগঠনের ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে তিনি তাঁর ভাষাশৈলীকে কীভাবে অর্থবহ ও নান্দনিক করবেন। রচয়িতার জাগতিক অস্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, বাগভঙ্গি আর সঞ্চিত বিশেষ শব্দমালা যখন শিল্পরসে জারিত হয়, তখনই তা শৈলী হয়ে ওঠে। লেখকের সচেতন মস্তিষ্কে থাকে ভাষা আর বিকশিত মানসলোকে থাকে শৈলী।

ইংরেজি Style শব্দের পারিভাষিক ও পরিপূরক হিসেবে বাংলায় 'শৈলী' শব্দের প্রচলন যা মূলত রচনার ভাষিক বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করে। অনেক ভাষাবিশেষজ্ঞ Style-এর বাংলা সমার্থক হিসেবে 'রীতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'সংস্কৃতে 'রীতি' ও ইংরেজি Style-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সংস্কৃত রীতি হচ্ছে স্বীকৃত শিল্পগুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বহিরাঙ্গগত রচনা পদ্ধতি যা একান্তভাবে বস্তুগত। অপরদিকে Style হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন।'[৯] এককথায় লেখকের শব্দ, বাক্যগঠন ও ভাষাকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে সাহিত্যের শৈলী। আধুনিক শৈলী ধারণা ও চর্চার সূচনাকাল ধরা হয় বিশ শতক। পাশ্চাত্যে এর প্রসার ঘটলেও মূলত শতাব্দীর শুরুতে ফরাসি দেশেই 'শৈলী' চর্চার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সোঁসুর, শৈলীর ভাষাবৈজ্ঞানিক আলোচনার পথিকৃৎ। এরপর মধ্যপর্যায়ে এসে আমেরিকাতেও 'শৈলী' ধারণার প্রসার ঘটে। এর পেছনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে নোআম চম্স্কির *Syntactic Structures* (১৯৫৭) বইটি। ভারতবর্ষে 'শৈলী' বিষয়ক ধারণাটি শুরুতে 'রীতি' অর্থে বিশ্লেষিত হতো। পরে চর্চার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে 'স্টাইলিসটিকস' বা 'শৈলীবিজ্ঞান'

ধারণার সৃষ্টি। প্রত্যেক লেখকেরই একটি নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ও রচনারীতি আছে, যা দ্বারা তার স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। এই ভঙ্গিই হচ্ছে শৈলী আর শৈলীর প্রয়োগ, সাফল্য-ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে শৈলীবিজ্ঞান। জনাথন সুইফট বলেছেন, 'সহজাত জ্ঞান এবং স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি বলে মানুষ যখন কোনো কিছু প্রকাশ করে তখনই সেখানে শৈলী প্রকাশ পায়।'[১০]

বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরা শৈলীকে নতুন করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। এরমধ্যে অন্যতম Lesley Jeffries, তিনি শৈলী সম্পর্কে বলেছেন–

> Stylistics' main strength has been to remain open to new theories of Language and literature, and to evolve by incorporating these new insights into its practice.[১১]

প্রত্যেক সৃষ্টকর্মেরই একটি নিজস্ব শৈলী থাকে যা উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই শৈলীকে উপন্যাস থেকে আলাদা করা যায় না। করলেও তা হয়ে যায় আবেদনহীন কোনো জড় বস্তু। মানুষ কেবল সৃষ্টিশীল প্রাণীই নয় তার সৃষ্টি প্রতিভায় রয়েছে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য তথা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় তার রচনার ভাষায়। যে কারণে একজন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লেখার ভাষাবৈশিষ্ট্য যেমন ভিন্ন তেমনি একই বিষয়ে রচিত ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার ভাষার মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক রচয়িতার নিজস্ব একটি ভাষিক ঢঙ রয়েছে, যা তার মুখের ভাষা কিংবা লেখায় আভাসিত হয়।

কথাসাহিত্যের শৈলী নিয়ে আধুনিক সময়ে নানা বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন:

> Stylistics is crucially concerned with excellence of technique, traditionally, its attention has been directed to such excellence of craft in worka of literatury, but clearly there is no intrinsic reason why it can not equally be used in the study of excellence (and, conversely, of mediocrity of craft) in other field such as adverstising, political discure legal pleading and pop music lyrics.[১২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। তারপরই একটি দুটি সাময়িক পত্র বাংলার সামাজিক ও সাহিত্যিক বির্বতনের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। 'উপন্যাস' একটি সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের কাব্যে শব্দটির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

উপন্যাস হলো এমন সাহিত্যকর্ম যা লেখকের জীবনাদর্শ ও অনুসন্ধান কাহিনি অবলম্বন করে শৈল্পিকভাবে বর্ণিত হয়। এ শিল্প পদ্ধতিই হলো শৈলী। উপন্যাসের চরিত্র আদর্শ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করাই হলো শৈলী। লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে ভাষিক স্বাতন্ত্র্য শৈলীতে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে লেখকের শৈলীবিচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪

শহীদুল জহির এক সাক্ষৎকারে বলেছিলেন *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসটি লেখার সমস্ত উপাদান জোগাড় করার পরও সেটি লিখে উঠতে পারছিলেন না। কারণ কাঠামো খুঁজে

পাচ্ছিলেন না। বিষয় তৈরি কিন্তু আঙ্গিকের সন্ধান পাননি। সে সময় দৈনিক সংবাদে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের 'অলস দিনের হাওয়া' লেখাটি তাঁকে সেই আঙ্গিকের সন্ধান দেয়।[১৩]

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসটি 'ফরাসি নব্য উপন্যাস রীতি'তে লেখা বলে কোনো কোনো সমালোচক মন্তব্য করেছেন। যেখানে সময় কথা বলে। নির্দিষ্ট করে চরিত্ররা প্রভাব ফেলে না। সময় গল্পকে টেনে নিয়ে যায়। আবার বেশিভাগ সমালোচক এই উপন্যাসকে জাদুবাস্তবতার প্রতিনিধিত্বকারী উপন্যাস বলেও মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রভাব রয়েছে। আবার অস্তিত্ববাদী উপন্যাসের অবস্থান থেকেও উপন্যাসটিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপরেও দাঁড় করানো যায়। লেখক নিজেই উপন্যাসটি সম্পর্ক মন্তব্য করেছেন–

> যখন উপন্যাসটি লিখছি তখন দেশে স্বাধীনতাবিরোধীরা ভয়ংকরভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত ছিলাম, আমি মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়ংকর সময়টির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেলাম, নাম নিয়ে কোনো কাব্য আর রস করবার মানসিকতা ছিল না।[১৪]

জাদুবাস্তবতার কথা শহীদুল জহির আগেই জেনেছিলেন। যেসময় তিনি গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ পড়েছেন তখন পশ্চিমের অনেক দেশেই জাদুবাস্তবতা বা মার্কেজ এত গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়নি। 'অলস দিনের হাওয়া' লেখাটি পড়ে তিনি আশ্বস্ত হলেন যে জাদুবাস্তবতার বিষয়টি সর্বদেশের বিষয়, এর অনুসঙ্গ ও উপস্থাপনার একটা দেশ নিরপেক্ষ ব্যাপার আছে। 'কোন অধ্যায়, পরিচ্ছেদে ভাগ না করে মাত্র একটি অনুচ্ছেদে পনেরো হাজারের কম শব্দে তিনি উপন্যাটি লিখেছিলেন।[১৫]

উপন্যাসটি সম্পর্কে দেবেশ রায় বলেছেন–

> যেন মনে হয়, ষোল হাজার মতো শব্দ একেবারে সরু শীতলপাটির মতো ঠাসা বুনট। 'বুনট'– এই কাজটার ভিতর কল্পনা, দক্ষতা, কুশলতা সব মিশে আছে। সূক্ষ্মতম বুনেট যেমন সারল্য বোনা হতে থাকে, যেমন সারল্য খুলে যেতে থাকে গুটানো পর্দার মতো, এই লেখাটির গল্প তেমনি সরল। সে সরলতা গিয়ে শেষ হয় মারাত্মক ভয়ঙ্করে।[১৬]

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক লেখেন, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা একেবারে প্রদীপ্ত যৌবনের রচনা। না কোন বোকামি, না কোন বালখিল্যতা, প্রখর পরিণত লেখকের লেখা উপন্যাস।[১৭] শহীদুল জহিরের অন্য লেখার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বলতে ইচ্ছে হয় এই লেখাকে তিনি আর অতিক্রম করতে পারেননি। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসের ভাবনা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন, 'আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশের রাজনৈতিক আবহ এবং এই সময়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রকাশিত 'একাত্তরের দালালরা কে কোথায়' পড়ে আমার মনের এমন একটা অবস্থা হয় যে আমাকে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* বইটি লিখতে হয়। আমার কাছে এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ভালো লাগে নাই। যখন আমি বইটি লিখি, মার্কেজের 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড' পড়ে ফেলায় তাঁর কাছ থেকে জাদু বাস্তবতার রচনা পদ্ধতি

নিই। আমার মনে হয়, আমি আমার কাহিনী তৈরীর অনেক দূর পর্যন্ত স্বাধীনতা নিতে পারি, আমার কল্পনাকে সম্ভব্যতার প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি।[১৮]

উপন্যাসে দেখা যায়, বদু মওলানা ফিরে আসবার পরে এলাকার মানুষ কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। কেউ গালি দিয়েছে, কেউ মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কেউ রান্না ঘর থেকে খুন্তি ছুঁড়ে দিয়েছে। এরপর সে আজিজ ব্যাপারির কাছে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছে। যে আজিজ ব্যাপারি আবার একাত্তরের সময় সাড়ে সাত মাস ভারতে পালিয়ে ছিলেন। 'রাজনীতিতে চির শত্রু এবং চিরবন্ধু বলে কিছু নেই'- এটাই ক্ষমতাবানদের দর্শন। যা সাধারণ মানুষকে কোনো আশার কথা শোনায় না। তারা ক্রমাগত ভীরু হতে হতে একসময় পলায়ন করে।

৫

শহীদুল জহিরের অনন্য কৃতিত্বের জায়গা তাঁর ভাষার ব্যবহার। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে এক আলাপে তিনি বলেছেন–

> ভাষা নিয়ে আমাদের মানসে একটা সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ ছিল। এখনো না থাকার কারণ নাই। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের একটা বড় সমস্যা। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ভাষার মুসলমানিকরণের কোনো অবকাশ নেই। ... ভাষা গ্রহণ- বর্জনের মাধ্যমে টিকে থাকে, প্রয়োজনে বদলায়। কারো কথা অনুযায়ী না, প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়।[১৯]

কবি শামীম রেজার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন–

> আমি যখন লিখি– কাহিনী, চরিত্র এবং বর্ণনা কৌশল সব কিছুই আমার মাথায় থাকে। তবে লেখায় প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর বিষয় (বিষয়হীনতাও কখনো বিষয় হতে পারে), বর্ণনা কৌশল হচ্ছে প্রকাশের মাধ্যম, এই প্রকাশের মাধ্যমকে অবশ্য উপযুক্ত হতে হবে, একে অবহেলা করার উপায় নাই। ...আবার আমার লেখার বিষয়টা পানির উপরে খড়কুটার মত ভাসিয়ে দেয়া কোন বস্তু না, একে খুঁজে নিতে হয়; আমি পাঠকের মনোযোগ এবং পরিশ্রম প্রত্যাশা করি।[২০]

এই উপন্যাসে তিনি কুশলী শিল্পীর মতো ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে দেয়া হলো–

> "কুত্তা তো মুখ দিয়া খায়বি, আপনে অখনথন হোগা দিয়া খায়েন"[২১]
>
> 'মহল্লার ভিতরে আপনেগোই অখনও সাহস আছে।'[২২]
>
> 'হারামির পোলা আমারে কয় কি, মাগি ডিম পারবার যাও।'[২৩]
>
> 'কন্দিচ না আপা, মান্দারপোর থোতা ফাটায়া দিয়া আমুনে।"[২৪]
>
> "তুই এমুন করছ! তোর উপরে মার কত আশা, তই পইড়া শুইনা কত বড় হবি।"[২৫]
>
> 'কেমুন লাল পিঁপাড়ার লাহান লাগে এক একটারে।'[২৬]
>
> 'থুক দেই মুখে।'[২৭]
>
> 'তুই ব্যাটা গাবগাছ আলী, তরে পিটায়া লাশ বানামু।[২৮]
>
> 'বইনের নামে নাম রাখছো, বইনেরে ভুলো নাইকা।'[২৯]

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যত উপন্যাস লেখা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, সেলিনা হোসেন, মাহমুদুল হক, রশীদ হায়দার, হুমায়ুন আহমেদ, মঞ্জু সরকার প্রমুখ উপন্যাসিক কখনও মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত, কখনও বর্ণনাত্মক ভাষ্যে এবং বিপুল কলেবরে যুদ্ধকালের নানা খুঁটিনাটি চিত্র তুলে ধরেছেন। সেসবের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসটি ছোট এবং এতে যুদ্ধকালীন পটভূমির বিশদ কোনো বর্ণনা নেই। পরিবর্তে একটি অবরুদ্ধ মহল্লার কয়েকটি চরিত্রের মনস্তত্ত্বিক জগৎ, চরিত্রসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ঘটনার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা এসবই প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া উপন্যাসে পনের বছর আগের ও পরের দুই বাস্তবতাকে গাঁথা হয়েছে একসূত্রে। এখানে পরের বাস্তবতা আগের বাস্তবতার বিশেষ পরিণাম। সে-অর্থে এই উপন্যাসটি একই সময়ে দুই ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার উপস্থাপন– দুই বাস্তবতা পরস্পর সমান রেখায় অগ্রসর হয়েছে। শহীদুল জহির এমনভাবে তাঁর ভাষাকে ব্যবহার করেন যা একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গের, বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন চরিত্রের একত্র উদঘাটন সম্ভব করে তোলে। যেমন–

> বদু মওলানা ডিসেম্বর মাসে পালিয়ে যাওয়ার পর, যেদিন লোকেরা তার বাড়ির সব মালামাল এনে আজিজ পাঠানের বাসায় জড়ো করে সেদিন আজিজ পাঠানের স্ত্রী সব দেখে বলেছিল যে, শুধু একটি আলখাল্লা আর একটি কাঁধের স্কার্ফ ছাড়া সব তাদের। মহল্লার লোকেরা তখন বহুদিন পর বদু মওলানার সেই ধূসর রঙের আলখাল্লাটি দেখতে পায়, তাদের তখন মনে পড়ে যে, পকিস্তানী ক্যাপ্টেন বদু মওলানার এই কাপড়ে পেশাব মুছেছিল আর তাতে সে, সেই অপার্থিব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল।[৩০]

এই বর্ণনাংশে লক্ষ করা যায়, একটা বাক্যের মধ্যে তিনি অতীত ও বর্তমানকে একাকার করে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে বাক্যে 'সব' শব্দটা তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'তাদের তখন মনে পড়ে যে' এই বাক্যের মধ্যে সবাইকে সংযুক্ত করবার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

শহীদুল জহিরের ভাষিক স্বাতন্ত্র্যের একটা দৃষ্টান্ত 'কথার পৌনঃপুনিক' ব্যবহার। তিনি শব্দ নিয়ে, বাক্য নিয়ে খেলা করেন। নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন–

> আমার বর্ণনায় যে সামষ্টিক বর্ণনাভঙ্গির ব্যবহার সেটা যে কিভাবে হয়েছে, তা ঠিক বলতে পারবো না! 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' লিখতে গিয়ে এটা হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল এর দায়দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। আমি জানতাম, আমি অনেক পুশ করবো, অতএব আমি যদি এটা জনশ্রুতির উপর ছেড়ে দেই, তাহলে বলতে পারবো যে, এইটা তো আমি করি নাই মানুষ এরকম মনে করে তাই লিখেছে। এই সুবিধা নেবার জন্যই ওটা করেছিলাম।[৩১]

বাক্যগঠনে শহীদুল জহিরের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ লক্ষণীয়। উপন্যাসের শুরুর বাক্যাংশটি যদি দেখি–

> "উনিশ'শ পঁচাশি সনে একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের যুবক আবদুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়।"[৩২]

এই বাক্যে কয়েকটি শব্দ লক্ষণীয়: 'শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের যুবক', পায়ের স্যান্ডেল, 'পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান' এবং 'ফট' করে 'ছিঁড়ে' যায়। লেখক কিছু শব্দ বলার মধ্য দিয়ে

পাঠকের মনস্তত্ত্বে ঘা দিচ্ছেন। তার মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। শব্দের মধ্য দিয়ে পুরো বাক্যের গঠনগত অবস্থান এবং চিন্তার ঐকের সূত্র অনুসন্ধান করছেন।

উপমার ব্যবহার

দুটি বাক্য ব্যবহার করে লেখকের উপমার ব্যবহার দেখানো যেতে পারে—

> ক. সেই বিকেলে মাংসটুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি দেখেন যে, সেটার গায়ে ছোট্ট মুসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল।[৩৩]
>
> খ. আঙুলটির নখ খুব বড় এবং শক্ত ছিল এবং নখের ওপর ঘন এবং মোটা লোম ছিল। নখে লাগানো ছিল টকটকে লাল নখরঞ্জক।[৩৪]

প্রথম বাক্যে 'ছোট্ট মুসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল', 'মুসুরের ডাল' এবং 'পাথরের ফুল' এই ইমেজ দ্বারা লেখক পাঠকের সঙ্গে একটি সংযোগ সাধন করেছেন। চিরায়ত এবং নিত্য ব্যবহার্য শব্দের উপমা ব্যবহারের কারণে খুব বেশি পাঠকের মনোজগৎকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। আবার দ্বিতীয় বাক্যটি দ্বারা 'নখ খুব বড়', 'শক্ত', 'ঘন ও মোটা লোম'— এই একটা নখের স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু পরেই দেখা যায় সেখানে নখরঞ্জক লাগানো। এটা পাঠকে ভাবায়। পাঠকও মনে মনে একটা নখের ছবির সঙ্গে নখঞ্জকের রং কেমন তা কল্পনা করেন। যদিও লেখক কিন্তু রংয়ের কথা আমাদের বলেননি। এই যে লেখকের মুন্সিয়ানা এটাই ঔপন্যাসিক শহীদুল জহিরের ভাষাশৈলী।

যুদ্ধের বর্ণনা, মানুষের বীভৎসতার ইমেজ

> সে তখন তার বোনকে দেখে। তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে উরু পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, ডান উরু কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মতো হাঁ করে রাখা; সে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো দেহের নিচে চাপা পড়ে ছিল, মুখটা ছিল আকাশের দিকে উত্থিত। সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল, তার বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠেছিল, আর সে বিকারগ্রস্তের মতো শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল।[৩৫]

এই বর্ণনা, যেখানে খণ্ড খণ্ড ছবি পাঠকের মনে ভেসে ওঠে। ভীষণ প্রভাববিস্তারী এই বর্ণনা যেমন যুদ্ধের নৃশংসতার ছবি পাঠকের মনের মধ্যে তৈরি করে তেমনি একটা বিপন্নবোধ কেবল ব্যক্তি মানুষ নয় সমগ্র মানবজাতির সংগ্রামকে মনে করায়। লেখক শব্দ, বাক্য ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এমন একটা ইঙ্গিত পাঠকের সামনে হাজির করেন যাতে পাঠকের মনে ভাবাবেগের উদয় হয়। তার চোখ অশ্রুসজল হয়।

স্মৃতি জাগরণ, কল্পনা, তীব্র আঘাতের স্মৃতি

> আবদুল মজিদ দেখেছিল, আধোচৈতন্যের ভেতর অবস্থানকারী তার মায়ের মুখের ফেনায় বদু মওলানার পাম্প শু ভিজে যাচ্ছিল।[৩৬]

পাকিস্তানি সেনাদের ভাষা

কেয়া আপ আওরাতকা সাথ নেহি সাকতা?

ইয়ে এলাজ হায়।

ইংরেজি শব্দ/ বাক্য

লেটস সি দি হেরোইন ফাস্ট। এছাড়া নানা ইংরেজি শব্দ যেমন, কারফ্যু, ক্যাপ্টেন, ভিটাকোলার স্ট্র, ব্লিচিং পাউডার, প্যারেড, থ্রি নট থ্রি রাইফেল,

আরবি/ ফারসি শব্দ

হাজং, মুনাফেক, আল্লাহ, ফেরেশতা, আজান।

৬

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে শহীদুল জহির স্বতন্ত্র ভাষিকরীতির পাশাপাশি কাক ও উইপোকার একটি ইমেজ তৈরি করে উপন্যাসটি শুরু করেছেন। 'কাক' ক্ষমতাবানদের প্রতীক আর 'উইপোকা' ক্ষমতাহীনদের প্রতীক। পুরো উপন্যাস জুড়েই এমন পারস্পরিক ইমেজ-স্মৃতি আমাদের কখনও বাস্তব কখনও অতিবাস্তব আবার কখনও স্মৃতিতে নিয়ে যায়। আমরা পুনরায় আমাদের ইতিহাসকে অনুসন্ধান করি ভাষা, বাক্য ও শব্দের দ্যোতনার মধ্য দিয়ে। নিজেদের দিকে ফিরে তাকাই এবং ইতিহাস ও সময়ের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিই। পৌনঃপুনিক ভাষার ব্যবহার শহীদুল জহিরের আর একটি কৃতিত্ব। বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তিনি সচেতনভাবেই এটা করে থাকেন। উপন্যাসটিতে লেখকের ভাষিক স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও জীবনদর্শনের এক ভিন্ন রূপ উঠে এসেছে। সেই জীবনদর্শনকে ভাষিক রূপ দিতে গিয়ে তিনি সামাজিক মানুষের জীবনাচারণের সংগ্রাম ও অসংগতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রগুলো চিরচেনা সামাজিক মানুষের প্রেক্ষাপট হিসেবে গড়ে উঠেছে। পুরান ঢাকার ভাষা শহীদুল জহিরের আগে কেউ এত নিখুঁত করে আমাদের সাহিত্যে আনতে পারেননি। লেখকের আনতে পারার বড় কারণ তিনি পুরান ঢাকার আলো বাতাসে বেড়ে উঠেছেন। সেখানকার মানুষের জীবনাচারণ, সংস্কৃতি, সফলতা ব্যর্থতা সবটাই তার নিজের।

জাদুবাস্তব পদ্ধতিকে গ্রহণ করে শহীদুল জহির উপন্যাসের সময়কাঠামো ভেঙে দিয়েছেন। মানুষের জীবনের যে দ্বন্দ্বময় জটিলতা সেই জটিলতায় কোনো কিছুই ভালো ভাবে চলে না। কোনো ধারাবাহিকতা মেনেও আসে না। শহীদুল জহির সেই দ্বন্দ্বময়তাকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর লেখনীতে আছে বহুত্বের প্রবণতা। তিনি চিন্তা করেন বহুবচনে, সংকটেও পড়েন বহুবচনে। তাই তার আখ্যান আর ব্যক্তির আখ্যানে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে যায় সামষ্টিক মানুষের আখ্যান। আর সেই আখ্যান তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন স্বতন্ত্র এক ভাষা-শৈলীর মধ্য দিয়ে। তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষিক কারুকাজের এই তুলনা তিনি নিজে।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, জন্ম ১৯২২ - মৃত্যু ১৯৭১। কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি অস্তিত্ববাদ ও চেতনাপ্রবাহরীতিকে অসাধারণ রূপক ও শিল্পকুশলতায় তাঁর নাটক ও উপন্যাসে তুলে এনেছেন। *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জন্ম ১৯৪৩ - মৃত্যু ১৯৯৭। এদেশে প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর পরোক্ষ সমর্থন ছিল। তাঁর লেখায় সমাজবাস্তবতা ও কালচেতনা গভীরভাবে প্রতিফলিত। স্বকীয় বর্ণনারীতি ও সংলাপে কথ্যভাষা ব্যবহারে তিনি অনন্য।

৩. শহীদুল জহির, *নির্বাচিত উপন্যাস*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১।

৪. প্রগুক্ত, পৃ. ১১

৫. শহীদুল জহির, (১৯৫৩-২০০৮)। বিংশ শতাব্দির প্রভাবশালী লেখক। তিনি বাংলা সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার অন্যতম রূপকার। স্বতন্ত্র রীতি-পদ্ধতি-ধারা যা 'শহীদুল জহিরীয়' ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

৬. শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, ওবায়েদ আকাশ (সম্পাদিত), 'শালুক', বর্ষ ৯, সংখ্যা ১০, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৭. মিশু, শায়লা শিরীন, *শহীদুল জহিরের উপন্যাস বিষয় ও আঙ্গিক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। পৃ. ২৭

৮. শহীদুল জহিরে সাক্ষাৎকার, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, ওবায়েদ আকাশ (সম্পাদিত), 'শালুক', বর্ষ ৯, সংখ্যা ১০, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৯. সৌরভ সিকদার, *স্টাইলিস্টিকস্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য*, সানন্দ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৪০৩, জুলাই ১৯৯৬, পৃ. ১০

১০. সৌরভ সিকদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

১১. L. Jeffries and D. Mclntyre, *Stylistics*, Cambridge Textbooks in Linguistice, 2020, p. 36.

১২. G. N. Leech and M. H. Short, *Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose* (2nd edn.), 2007. p. x

১৩. শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার, 'ছোট কাগজই হল সাহিত্যের যথার্থ উৎসভূমি', প্রথম প্রকাশ: দৈনিক আজকের কাগজের সাহিত্য সাময়িকী, ২০ জানুয়ারি ২০০০। দ্বিতীয় প্রকাশ: 'লোক', ৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৪৪।

১৪. শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, ওবায়েদ আকাশ (সম্পাদিত), 'শালুক', বর্ষ ৯, সংখ্যা ১০, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৫. হামীম কামরুল হক, 'জীবনের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও একটি উপন্যাস', 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে', সনজিদা খাতুন সম্পাদিত, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

১৬. দেবেশ রায়, এখনো অপেক্ষা: শহীদুল জহিরের মৃত্যু, 'লোক', শহীদুল জহির সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর ২০০৮।

১৭. হাসান আজিজুল হক, "সোনায়-মোড়া কথাশিল্প: শহীদুল জহির", ওবায়েদ আকাশ (সম্পা.), 'শালুক', বর্ষ ৯, সংখ্যা ১০, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৮. শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত।

১৯. প্রাগুক্ত

২০. শামীম রেজা, 'যে নিঃসঙ্গ নয়, সে হতভাগ্য', 'লোক', *শহীদুল জহির সংখ্যা*, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর ২০০৮।

২১. শহীদুল জহির, *নির্বাচিত উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২২. প্রগুক্ত, পৃ. ১৫

২৩. প্রগুক্ত, পৃ. ১৬

২৪. প্রগুক্ত, পৃ. ১৬

২৫. প্রগুক্ত, পৃ. ১৭

২৬. প্রগুক্ত, পৃ. ২৩
২৭. প্রগুক্ত, পৃ. ১৫
২৮. প্রগুক্ত, পৃ. ১৫
২৯. প্রগুক্ত, পৃ. ৫১
৩০. প্রগুক্ত, পৃ. ২৭
৩১. ইমতিয়ার শামীম, "শহীদুল জহির: গ্রহণপর্ব এবং অতঃপর", অনিকেত শামীম (সম্পাঃ), 'লোক', বর্ষ ৯, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৪৯
৩২. শহীদুল জহির, *নির্বাচিত উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৩৩. প্রগুক্ত, পৃ. ১২
৩৪. প্রগুক্ত, পৃ. ১৩
৩৫. প্রগুক্ত, পৃ. ৫২
৩৬. প্রগুক্ত, পৃ. ৫২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

নজরুলের নাটকবিচারে সমস্যা এবং ভিন্ন পাঠের প্রস্তাব

মো. নাজমুল হোসেন*

সারসংক্ষেপ

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সবচেয়ে কম আলোচিত সাহিত্যকর্ম তাঁর নাটক। যদিও দ্রোহে-প্রতিবাদে তাঁর কবিতা অনন্য কিন্তু নাটকে নজরুলের রোমান্টিক হৃদয়াবেগের উৎসারণই কেবল ঘটেছে, তাঁর নাটক সম্পর্কে এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো নাটক পদমর্যাদা থেকেও অনেকাংশে বঞ্চিত। কিন্তু বাংলা নাটকের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক প্রবণতা, নজরুলের নাট্য-প্রতিভার উৎস এবং তাঁর নাট্যভাবনা অনুসন্ধানসূত্রে নজরুলের নাটকের স্বকীয়তা দৃশ্যমান। নজরুল বাল্যবয়সেই লেটোদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার সংস্পর্শ লাভ করায় পরবর্তীকালে রচিত তাঁর নাটকে সেই ঐতিহ্যের উপযুক্ত প্রয়োগ ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলা নাট্যের আঙ্গিক ও বিষয় অনুসরণে তিনি উপনিবেশিত নিম্নবর্গের চৈতন্যকে ধারণ করে যে নাট্যাঙ্গিক উপস্থাপন করেন, তা হয়ে ওঠে উপনিবেশ বিরোধিতার হাতিয়ার। উপনিবেশিত বাঙালির মনোজগতে আলোড়ন তৈরির জন্য পাঠ্য, শ্রুতি এবং নাট্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তিনি সকল স্তরের মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য পৌঁছানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

চাবি শব্দ: নাট্যরীতি, লেটো, ফোকলোর, নজরুল, উপনিবেশবিরোধিতা

কবি হিসেবে পরিচিতির আড়ম্বরে কাজী নজরুল ইসলামের ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার সত্তা অনেকাংশে আবৃত আর নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিচিতি নেই বললেই চলে। তাঁর কবিতায় ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে যেখানে ঔপনিবেশিক সময় ও সংকটকে ধারণ করে একই সঙ্গে কবি-কর্মী নজরুল হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী এবং প্রেমিক। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য তাঁকে ভিন্ন শৈলী নির্মাণ করতে হয়েছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর চেতনায় উপনিবেশবিরোধী প্রবণতাই প্রাবল্য লাভ করেছে, ফলে তাঁর নাটক বিষয় এবং আঙ্গিকগত দিক দিয়ে গতানুগতিক নয়। তবে কবিতায় ঘটনাগত দিক থেকে তিনি যতটা সমকালস্পর্শী, নাটকে ততটা নন– এমন অভিযোগ নজরুল সম্পর্কে হর-হামেশাই শোনা যায়। এ প্রবন্ধে নজরুলের নাটক প্রসঙ্গে উত্থাপিত এসব অভিযোগ খণ্ডনসাপেক্ষে তাঁর নাটক কোন অর্থে কতটা নাটক হয়ে উঠেছে সেই তদন্ত করার প্রয়াস থাকবে। এছাড়া নাট্যাবয়ব বিচারে উদ্ভূত সংকট নিরসনের পাশাপাশি নজরুলের নাটকের ভিন্নমাত্রিক পাঠ-প্রস্তাবেরও প্রয়াস থাকবে।

১. নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করার সমস্যা

নজরুলের নাটক বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই যে সমস্যাগুলো উত্থিত হয়, তা হলো নজরুলের নাটক কোনো নির্দিষ্ট ফর্মে ধরা যায় না, ফলে প্রচলিত নাট্যরীতি অনুযায়ী তা বিশ্লেষণ করা দুরূহ। এই

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন স্পষ্টতই ইউরোকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্য প্রভাবিত। ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেদেফ কলকাতায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন, সেখান থেকেই শুরু হয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের, যা উনিশ ও বিশ শতকে কলকাতার নাগরিকজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই থিয়েটারের দর্শক ছিল মূলত উপনিবেশউদ্ভূত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদের রস ও রুচির যোগান দেবার জন্য প্রথম পর্যায়ের নাট্যকারদের নির্ভর করতে হয়েছে অনুবাদ নাটকের ওপর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ই সর্বপ্রথম মৌলিক নাটক উপহার দিয়ে বাংলা নাটকের ইতিহাসে বাঁক বদল করলেন, একই সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নাটকেও তার প্রভার পড়ে, ফলে ওই সময় প্রচুর পরিমাণে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনা শুরু হয়।

বাংলা নাট্যচর্চার এই ধারাবাহিক ইতিহাসে ইউরোপীয় নাট্যরীতি অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে। গ্রিকদেবতা দিওনিসাসের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তৈরি হওয়া এই নাট্যরীতি ইউরোপে নানারূপে বিকশিত হয়েছিল, ফলে পাশ্চাত্য নাটকে গুরুত্ব পেয়েছিল ক্রিয়াত্মক ঘটনা, নাটকীয় দ্বন্দ্ব, ত্রিবিধ ঐক্যের সংস্থান, সংলাপ এবং অঙ্কবিভাজনের রীতিপদ্ধতি। পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুযায়ী প্লট বা আখ্যানবস্তু ক্রিয়াত্মক ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রসৃষ্টি এবং চরিত্রের সংলাপ অবলম্বনে নাটকীয় দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে ক্লাইম্যাক্সের দিকে যাত্রা করে। ঘটনার এই ঊর্ধ্বমুখী গতি হলো নাটকের বিকাশ এবং ক্লাইম্যাক্সের পর ঘটনার গতি হয় নিম্নমুখী বা পরিণামমুখী, সবশেষে ঘটে পরিস্থিতি বিপর্যাস ও গ্রন্থিমোচন বা সিদ্ধান্ত বা সমাপ্তি। এ প্রসঙ্গে নাট্যতাত্ত্বিক Gustav Freytag বলেন, "What the drama present is always a struggle, Which is strong, perturbation of soul the hero wages against opposing forces."[১] অর্থাৎ পাশ্চাত্যরীতির নাটকের "মূল লক্ষণ দ্বন্দ্ব বা Conflict ।... দ্বন্দ্ব-সংঘাতের তীব্রতার এই ঘনীভবনই হলো নাটকীয়তা।"[২] এখানে নাটকের যে লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে ইউরোপের জীবনপদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের প্রকরণেও বৈচিত্র্য আসে। পাশ্চাত্যরীতির অনুসরণে বাংলা নাট্যচর্চায়ও সেসব আঙ্গিকের প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবিদ্যার তৎপরতায় ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সংস্কৃত নাটকের আদর্শও ১৯-২০ শতকের বাঙালি নাট্যকারদের প্রভাবিত করে। যদিও ওই সময়ে ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবিদ্যার তৎপরতার কারণেই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে এদেশের নাট্যকারদের নতুন করে পরিচয় ঘটেছিল। ইউরোপীয়দের প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে সাধনকুমার ভট্টাচার্য জানিয়েছেন–

> ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক 'শকুন্তলা' নাটকের অনুবাদ ইয়োরোপীয় জাতিদের চোখে ভারতবর্ষের একটি নূতন পরিচয় তুলে ধরেছিল, সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের দিকে প্রতীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল– হিন্দু-থিয়েটার বিষয়ে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছিল।[৩]

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায় ভরত কথিত দশরূপকের প্রথমটি হচ্ছে নাটক। এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয় বিষয়বস্তু, নায়ক, অঙ্কবিভাজন, রস এবং কার্যের ওপর। এখানেও বৃত্ত বা কার্য ও বৃত্তের মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি প্রভৃতি পঞ্চসন্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এক সন্ধি থেকে নাট্যঘটনার পরবর্তী সন্ধিতে উত্তরণের অর্থ হলো দর্শকমনের ঔৎসুক্যের বৃদ্ধি, এছাড়া "নাটকের প্রাণ অভিনেয়ত্ব এবং অভিনেয়ত্বের বড় প্রমাণ যে সজ্জনের মনোরঞ্জন-ক্ষমতা সে বিষয়ে ভরত খুবই সচেতন।"[৪] ভরত বলেন,

উদাত্তমপি যৎকাব্যং স্যাদঙ্গৈঃ পরিবর্জিতম্
হীনত্বাত্তু প্রয়োগস্য ন স সতাং রঞ্জয়েন্মনঃ।।

অর্থাৎ যে কাব্য উত্তম, তা-ও অঙ্গহীন হলে অভিনয়ের হীনতাবশত সজ্জনগণের মনোরঞ্জন করে না।[৫]

অবশ্য *নাট্যশাস্ত্রে* উল্লিখিত 'সজ্জনগণের মনোরঞ্জন' নিশ্চিতভাবেই অভিজাত শ্রেণির রস-রুচির সন্তোষ বিধানের প্রয়াসকেই চিহ্নিত করে।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, উনিশ শতকে বাংলা নাটকের কাঠামো গঠনে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি এবং (প্রাচ্যবিদ্যার প্রভাবে পুনরাবিষ্কৃত) সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু বাংলা নাটকের কোনো বিশেষ কাঠামো সন্ধানের আগ্রহ তেমন কারও মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠেনি।[৬] এই পরিস্থিতিতে রচিত, নজরুলের নাটককে আখ্যানবস্তুর গঠনে শিথিলতা, নাটকীয় ঘটনাগতির বিকাশহীনতা, ঔৎসুক্যহীনতা ও দ্বন্দ্বের অভাব এবং সর্বোপরি পঞ্চাঙ্ক বিভাজিত না হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে দেখা যায়।

ঔপনিবেশিক নাট্যতত্ত্বের ছকে ফেলে নজরুলের নাটক বিচার করতে গিয়ে দ্বিতীয় যে গুরুতর সমস্যায় পড়েছেন নাট্যসমালোচকগণ, সেটা হলো বাস্তববোধের অভাব। নজরুলের সমকালীন ইব্রাহীম খাঁ বলেন,

> নাটক লিখতে আঁকতে হয় সমাজের ছবি; বর্তমান অতীত বা ভবিষ্যৎ ও সমাজের বাস্তব জীবনের কাহিনী। ... কাজী নজরুল ইসলাম কল্পনার পাখা মেলে তারায় তারায়, গ্রহে-উপগ্রহে বিহার করেছেন, তিনি খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উর্ধ্বলোকে উঠে গেছেন। তাঁর সুরের আবেশে বুলবুল তার দোল ভুলে গিয়ে ফুল-শাখায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর রচনায় সর্বহারারা নিঃসন্দেহে স্থান লাভ করেছে, কিন্তু সে তাঁর কাব্যে, তাঁর নাটকে নয়।[৭]

অর্থাৎ নজরুলের নাটক সম্পূর্ণরূপে ভাবজগতের সামগ্রী, বাস্তবজীবন সেখানে স্থান পায়নি, রোমান্টিক হৃদয়ধর্মই কেবল প্রাধান্য লাভ করেছে। নীলিমা ইব্রাহীম এই অভিযোগ আরও তীব্রভাবে উত্থাপন করেন, আবেগ-অনুভূতিজাত অতীন্দ্রিয় প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে নজরুলকে ভাবাবেগের আতিশয্যে দুষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি।[৮]

নজরুলের কিছু কিছু নাটককে কোনো কোনো সমালোচক পাশ্চাত্যরীতির রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে প্রতীকাশ্রয়ী বা রূপকাশ্রয়ী হিসেবে নজরুলের নাটক বিচার করতে গিয়ে সেখানে সমালোচক অনুভব করেন নজরুলের আড়ষ্টতা। তাঁর বাস্তবজীবন অথবা লোককাহিনি আশ্রিত নাটকে সম্ভাবনা থাকলেও পূর্ণাঙ্গতা না-থাকায় হতাশা ব্যক্ত করেন সমালোচক

আবদুল হক। তাঁর মতে, অভিনয়-সাফল্য বা সাহিত্যগুণ কোনো মানদণ্ডেই নজরুলের নাটক সফল নয়।[৯] একই কথা ইব্রাহিম খাঁ-ও বলেন, "নজরুল ইসলামের এই কবিত্ব-প্রধান সৃষ্টিধর্মিতার ফলে তাঁর নাটক কয়টি হয়ে উঠেছে নাট্যকাব্য। সাধারণ অর্থে আমরা নাটক বলতে যা বুঝি, তা হয় নাই। মঞ্চে তার সাফল্য একান্ত অনিশ্চিত।"[১০] এছাড়া নজরুলের নাটককে রূপক নাটক হিসেবে বিচার করতে গিয়ে অনেকে তাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, আবদুল কাদির তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আবদুল মান্নান সৈয়দও মনে করেন, "নাটকে রূপক ব্যবহারের পাঠ তিনি নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।"[১১]

বিভিন্ন সময় একই কারণে নজরুল প্রশংসা বা সমালোচনার শিকার হলেও, নাটকের ক্ষেত্রেই একমাত্র ব্যতিক্রম। নাট্যকার হিসেবে তিনি কোনো সমালোচকেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পারেননি। কোনো কোনো সমালোচক সপ্রশংসদৃষ্টিতে নজরুলের নাটক বিচারের প্রয়াস পেলেও তাঁরা প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করতে পারেননি। আমরা পরবর্তী আলোচনায় নজরুল সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনের প্রয়াস পাবো।

২. নজরুলের নাট্যপ্রতিভার উৎস

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো বলে অনেকে অভিহিত করেন, কিন্তু নজরুলের সাহিত্যরচনার ইতিবৃত্ত ভিন্ন কথা বলে। কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বেই নজরুল নাটক রচনার অনুশীলন করেছেন। ১০-১২ বছর বয়সেই নজরুল লেটো দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পালা রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রান্তিক বাঙালি মুসলমান পরিবারের সন্তান নজরুল যাপিত-জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যেই লোকজীবনঘনিষ্ঠ নাট্য-সংরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। 'লেটো' মুসলমান সমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ আঙ্গিক। সেলিম আল দীন একে অন্যতম প্রাচীন বাংলা নাট্যরীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। 'নাটুয়া' শব্দ থেকে কালক্রমে 'নেটো' বা 'লেটো' শব্দের আবির্ভাব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ আবার লড়াই থেকে 'লেটো' শব্দের উৎপত্তি চিহ্নিত করেন। বিনয় ঘোষের বরাত দিয়ে সেলিম আল দীন জানান, "ধারণা করা হয় যে, হিন্দু গায়েন-বায়েন সম্প্রদায় 'কীর্তন', 'পাঁচালি', ও 'যাত্রা'য় ঝুঁকে পড়লে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'নেটো'র প্রচলন শুরু হয়।"[১২] বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত এই ক্ষুদ্রাকৃতি নাটক 'সঙ' নামেও পরিচিত।

ক্ষয়িষ্ণু লেটো গান অশ্লীলতামুক্ত হয়ে নজরুলের বাল্য বয়সের সৃজনীপ্রতিভার স্পর্শে অভিনবত্ব লাভ করে, লোকসাহিত্যের এই আঙ্গিকে নজরুল নিজস্ব ভাব ও মেজাজ অনুপ্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, ফলে পুরাণ ও ইতিহাসের বদ্ধ বয়ানে সুপ্ত সম্ভাবনা পুনরাবিষ্কৃত হয়। এ সময় নজরুল চাষার সঙ, রাজপুত্রের সঙ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, কবি কালিদাস, দাতাকর্ণ, মেঘনাদবধ, শকুনিবধ, আকবর বাদশা প্রভৃতি পালা রচনা করেন। লেটো গান রচনার সূত্রেই নজরুলকে পরিচিত হতে হয় পৌরাণিক কাহিনি, পালাগান, কবিগান, কীর্তন পাঁচালির বিষয়বস্তু ও রচনারীতির সঙ্গে। আর এ জন্যই নজরুলকে আরবি-ফারসি-উর্দু-ইংরেজি ভাষার ব্যবহার আয়ত্ত করতে হয়েছিল[১৩], পড়তে

হয়েছিল কোরান, পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সারাবলী, ইসলামি পুথি অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতিকে সম্যকভাবে জানতে হয়েছিল।[১৪] নজরুল চৈতন্যে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যে মিথস্ক্রিয়া দেখা যায় তার সূত্রপাতও এখান থেকেই এবং "উত্তরকালে নজরুল যে নাটকের রূপপ্রকল্পে আত্মনিবেদন করবেন, তার প্রারম্ভবিন্দু ছিল ঐ লেটো-দলের পালা-নাটকগুলি।"[১৫]

সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক নির্মাণে নজরুল ঔপনিবেশিক আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসাননি, বরং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কাঠামোর নবায়ন করেছেন। তাই লেটো গানের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই কলকাতার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলেও তিনি লোকজীবন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। লেটো দলের সঙ্গে সংযুক্তির ফলেই নজরুল পরিচিত হয়েছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের –যে নন্দনতত্ত্ব ঔপনিবেশিক কাঠামোর চাপে খারিজ হয়ে গিয়েছিল। এ নন্দনতত্ত্বের সম্ভাবনা তিনি যেমন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনই মধ্যযুগের বাংলা পদ্যসাহিত্যে কাব্য, সংগীত ও নৃত্যের মিশ্রণে আসরকেন্দ্রিক উপস্থাপনারীতিতে বিপুল পরিমাণ নাট্য-সম্ভাবনা দেখেছেন সেলিম আল দীন-ও[১৬]। তাঁর বিবেচনায়–

> নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ– তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেই বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে।"[১৭]

অর্থাৎ ইউরোপীয় নাট্যরীতির অনুসরণে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক কাল থেকেই বাংলা নাটকের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ নাটক আসরে পরিবেশনাত্মক অর্থাৎ গেয়। বাংলা সাহিত্যের এই সংরূপ গান-নাচ ও বর্ণনার সমবায়ী আঙ্গিক।[১৮] এর মধ্যে আবার বর্ণনাধর্মিতাকে মধ্যযুগের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ বর্ণনার বিষয় হলো গল্প, আর গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের চিরকালই ছিল, এই গল্পের মাধ্যমেই জীবনসম্পর্কিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ দেওয়া হতো। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ গল্প থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের জীবনে প্রয়োগ করতো। আসর, পরিবেশনা, গান প্রভৃতি সূত্রে সহজেই অনুমিত হয়, এই নাট্যরীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ দর্শক-শ্রোতা, যারা শাস্ত্রীয় অনুশাসনাবদ্ধ নয়, একান্তই নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষ; যাদের অধিকার আর প্রত্যাশা পূরণের সাধনাই ছিল নজরুলের প্রতিশ্রুতি। তাই মানসগঠনের ক্ষেত্রে–

> ঐতিহ্যের লঙ্ঘন তিনি করেননি–পুরাতন পুঁথি সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সহজ আত্মীয়তা। ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল ইসলামের কাব্যে যে বিপ্লবধর্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে।[১৯]

তাহলে দেখা যাচ্ছে নজরুল-সাহিত্যের মূলপ্রেরণা ফোকলোর। আর এজন্যই তিনি লোকমানসের ভাষা ও ভাববিশ্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙালির দীর্ঘদিনের লোকভাবনা উৎসারিত সংগীতনির্ভর নাট্য-ঐতিহ্যের প্রতি নজরুল বিশ্বস্ত ছিলেন বলে তাঁর পরবর্তী নাটকগুলোতে সংগীতের অবাধ প্রয়োগ ঘটেছে, সমালোচকের দৃষ্টিতে যা ছিল নাটক হয়ে ওঠার বড় বাধা।

৩. নজরুলের নাট্যভাবনা

নজরুল প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২২ সালে *অগ্নি-বীণা* কাব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যে বছর পাশ্চাত্যে এলিয়ট প্রকাশ করছেন *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* কাব্য এবং জেমস্ জয়েস প্রকাশ করছেন চেতনা-প্রবাহরীতির উপন্যাস *ইউলিসিস*। পরের বছরই কল্লোল পত্রিকার যাত্রা শুরু, যার মধ্য দিয়ে আবির্ভাব ঘটে আধুনিকতাবাদের ধ্বজাধারী লেখকদের। এঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতে গিয়ে বাংলায় আমদানি করলেন আকাঁড়া ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব, অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হলেন বোদলেয়ার-পাউণ্ড-এলিয়টের ক্ষয়িষ্ণু নগর-নান্দনিক জ্ঞানভাষ্যের। শুধু তাই নয় "এরা পশ্চিমা নন্দনতত্ত্বকে জায়গা করে দিতে গিয়ে তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার বদলে বরঞ্চ তাঁরাই এই নন্দনতত্ত্বের দখলে চলে গিয়েছিলেন।"[২০]

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় আরোপিত জীবনবাস্তবতার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে দেশজ ঐতিহ্য থেকে শিকড়বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এঁরা। এই শিকড়বিচ্ছিন্নতা নজরুলের দৃষ্টি এড়ায়নি, তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন–

> আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীতি সবই টবের গাছ। মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জনসাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কী করে চলে?"[২১]

সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তি দেশী জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার, ন্যূনপক্ষে বিকৃতি সাধন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ফলে দেশজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি শক্তি হারিয়ে কোণঠাসা হতে বাধ্য হয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বাঙালি নাট্যকার এবং নাট্য-সমালোচকবৃন্দ বিস্মৃত হলেন যে, ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেদেফ নাটক দেখানোর আগেও বাঙালি নাট্যচর্চা করেছে। কিন্তু উপনিবেশের চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা যখন কিছুটা ম্লান, তখন সুযোগ বুঝে ঔপনিবেশিক নাট্যরীতিই মূলধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুল উপনিবেশের এই ফাঁদে পা দেননি,

> উপনিবেশের ডিসকোর্স যে 'সম্মতির কর্তৃত্ব' তৈরি করে নজরুল ইসলাম তা মানেননি। ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের বিপরীতে তাঁর যাত্রা। ... নজরুল ইসলাম কলোনির ইংরেজি জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরেজি কবিতার সমকালীন কারুবিধি প্রত্যাখ্যান করেন।[২২]

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়ে, স্বাধীনতার আবাহন মন্ত্রে উজ্জীবিত নজরুল ইউরোপ নয়, তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে। তাই নজরুলের *ঝিলিমিলি* নাটকের ফিরোজা যখন বলে "খোলো না মা জানালাটা। ... ঐ পুব-দিককার জানালাটা খোলো। পুবের হাওয়ায় কদম ফোটে, না মা?"[২৩] এ অনুরোধের জবাবে হালিমা জানায় "ও–দিককার জানালা খুললে তোর আব্বা আমায় আর জ্যান্ত রাখবে না, ফিরোজা।"[২৪] ফিরোজার এই পুবজানালা খোলার আকুতি আর মির্জা সাহেবের প্রতিবন্ধকতার দরুণ হালিমার ভয়মিশ্রিত অপারগতা নজরুলের পাশ্চাত্যবিরোধিতার রূপক হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয় 'পুব জানালা' পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে প্রাচ্যমুখীনতার ইঙ্গিত। নজরুল তাই মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে বেছে নেন শ্রীমন্তকে, পদাবলি থেকে নেন বিদ্যাপতিকে, জীবনীসাহিত্য থেকে নেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে, লোক ঐতিহ্য

থেকে গ্রহণ করেন সাতভাই চম্পা অথবা মধুমালা মদনকুমারকে। এক্ষেত্রে যেসব ঘটনা বা চরিত্রে নজরুল নাট্য-উপাদান লক্ষ করেছেন সেই সব চরিত্র-ঘটনাকেই নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি। নজরুল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, উপনিবেশবাদী জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধিতা করতে হলে জ্ঞানতাত্ত্বিক লড়াই প্রয়োজন, আর এ জন্যই–

> ... নজরুলকে তৈরি করতে হয় যৌবনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধাত্মক ইমেজ। বিদ্যমান, আচরিত ও প্রায় নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ডিসকোর্স এবং তার সূত্রে গড়ে ওঠা ভাষার স্ট্রাটেজি একারণেই তিনি বদলান। প্রভু-ভৃত্যের নির্দিষ্ট সম্পর্ক-শৃঙ্খলায় নজরুলের ভাষা ও পলিফনি তাই পলিটিক্যাল।[২৫]

অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু শিল্পরূপে আবদ্ধ থাকে না বরং রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে। দেশি জ্ঞানের ঐতিহ্য ও সম্ভাবনাকে প্রান্তে রাখার অভ্যাস প্রত্যাখ্যান করে নজরুল প্রান্তে ফিরেছেন। এক্ষেত্রে 'ভাষা'কে গুরুত্ব দিয়ে নজরুল ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর বিরোধিতায় ভাষিক বৈপরীত্য নির্মাণ করেন। আর এই প্রক্রিয়ায় ঐতিহ্য ও পুরাণকে তিনি বিদ্রোহী করে তুলেছেন। তবে এক্ষেত্রে ঐতিহ্যের অন্ধ প্রেম নয় বরং ঐতিহ্যের সঙ্গে নিরন্তর বোঝাপড়া ছিল নজরুলের অন্বিষ্ট।

আবার রবীন্দ্রবিরোধিতার যে উগ্র প্রয়াস তিরিশের কবিদের মধ্যে দেখা যায়, নজরুলের রবীন্দ্রবিরোধিতা ওই পথে যায়নি। তিনি বহিরাগত আরোপিত আদর্শ নয় বরং দেশজ ঐতিহ্যের অনুসরণে এমন মৌলিক, স্বতঃস্ফূর্ত স্বর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন মেলে না, তেমনই মেলে না ত্রিশের কবিদের সঙ্গেও। এমন এক ভাষা তিনি নির্মাণ করেন, যে ভাষায় প্রকাশিত হয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান, একই সঙ্গে উপনিবেশিতের অস্তিত্বের ঘোষণাও।

ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের চাপে যে নিম্নবর্গ সাহিত্যের আসর থেকে নির্বাসিত ছিল, নজরুল সেই বৃহত্তর জনসমাজের চৈতন্যকে তাঁর ভাষায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন, প্রয়োজন অনুভব করেছেন জনসাহিত্যের। তিনি জানেন, নিম্নবর্গের চৈতন্য প্রাগ্রসর না হলেও তারা চৈতন্যহীন নয়, নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন। তাই নজরুল যে ভাষা নির্মাণ করেন, সে ভাষায় নিজেদের জীবনাভিজ্ঞতার সাদৃশ্য তারা খুঁজে পাবে। নজরুল বলেন–

> ওদের জন্য যে সাহিত্য, তা ওরা এখনো যেমনভাবে পুঁথি পড়ে, আমির হামজা. সোনাভান, আলেফ লায়লা, কাছাছল আম্বিয়া পড়ে, তখনও সেইভাবে পড়বে। ওদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। কিন্তু যেন মাস্টারি-ভাব ধরা না পড়ে। সে জন্য তথাকথিত ভদ্র-পোশাক-পরিহিত ভদ্রলোকদেরকে নেমে আসতে হবে কাদার মধ্যে– ওদেরকে টেনে তোলার জন্য। নেমে এসে যদি ওদের ওঠানোর চেষ্টা করা যায়, তবে সে চেষ্টা সফল হবে, নইলে না।[২৬]

নিম্নবর্গের মানুষ যে লৌকিক আবহে গল্প শুনতে অভ্যস্ত তাদের সেই আবহেই গল্প শোনাতে হবে। এই প্রান্তিক মানুষের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ক্ষোভ বা অনুভূতির রূপায়ণ লোকসাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এখন অপরিচিত ভাষায় কোনো আহ্বান জানানো হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাই তাদের বোধগম্য ভাষাতেই তাদের অবস্থার স্বরূপ তুলে ধরতে হবে। নজরুল নিজে জারিগান, গাজিরগান লেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করে তাঁর অবস্থান আরও সুস্পষ্ট করেন।

এছাড়া "লোকজীবনের কৃত্য ও রুচিকে অবলম্বন করেই নাটকের এক একটি বিষয় ও নাট্যরীতির জন্ম হয়েছে"[২৭], তাই নজরুলের প্রথম জীবনে লেখা লেটোগানও কৃত্যের অবশিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, এমনকি তাঁর পরবর্তীকালে রচিত নাটকও কৃত্যের বাইরে নয়। সাধারণভাবে কৃত্য বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণচিন্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সামন্ত সমাজে কৃত্য ছিল ধর্ম অনুষঙ্গযুক্ত কিন্তু ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সমাজে স্বভাবতই কৃত্য ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। নজরুল সেই বৃহত্তর জনসমাজের জীবনচেতনায় পরিবর্তনের প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর নাটকগুলোতে। নাটকের এই কৃত্যমূলক ভূমিকা কখনোই অন্তর্হিত হয়নি বলেই নাটক সাহিত্যসংরূপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনঘনিষ্ঠ সংরূপ। এদিক থেকে নজরুলের নাটক আরও বিশিষ্টতা অর্জন করেছে বেতারযন্ত্রে প্রচারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে, যার ভোক্তা এবং শ্রোতার বড়ো সংখ্যাই সাধারণ মানুষ। সেইসব মানুষকে গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার পুরনো রীতিই অনুসৃত হয়েছে নজরুলের নাটকে, এক্ষেত্রে সচেতনভাবে নজরুল কলাকৈবল্যবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নজরুলের এই উপনিবেশবিরোধী ভাষা নির্মাণের নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখেছেন অনেকে কিন্তু বিপুল রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রভাব নজরুলের ওপর পড়া অস্বাভাবিক নয় তবে সে-প্রভাব রূপক-প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিনা তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রভাবমুক্ত হয়ে হাজার বছরের নাট্য ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নজরুল হয়ে উঠেছেন ব্রিটিশ উপনিবেশের সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ সংযোগসূত্রে প্রতীয়মান হয়, ইউরোপীয় নাট্যরীতির প্রত্যাখ্যান প্রবণতায় হয়ত তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবিত।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, মধ্যযুগের বাংলা নাটক নৃত্য-গীত এবং বর্ণনার সমন্বিত আঙ্গিক। নজরুল জনমানসে প্রতিষ্ঠিত এই আঙ্গিকের সচেতন প্রয়োগের ফলে তাঁর নাটকের বড়ো অংশ জুড়ে আছে গান। বাঙালি চিরকালই গানের প্রতি মুগ্ধতা দেখিয়ে এসেছে, তাই নাটকে যখন তিনি সাংগীতিক ব্যঞ্জনা তৈরি করেন, তা ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের ধারানুসরণ হিসেবে বিবেচ্য। গান তাঁর নাটকের দুর্বলতা নয়, বরং গানই তাঁর নাটকের শক্তি। এছাড়া নাটকের অন্যতম বিষয় অভিনয়যোগ্যতা, এক্ষেত্রে নজরুল অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজনে মনোযোগী না হলেও মঞ্চনির্দেশনা এবং কুশীলবদের সাজসজ্জা-নির্দেশনার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪. নাটকের পাঠ-প্রস্তাব

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত বাংলা নাটক দেখার পর মধুসূদন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন যে, "অলীক কুনাট্য-রঙ্গে, মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"[২৮] নাটকের দুর্দশা দূর করতে তিনি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদন নাটকের কাঠামো নির্মাণে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করলেও, বিষয়ভাবনায় তিনি উপনিবেশ-বিরোধিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সার্থক উত্তরসূরি নজরুলও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর শৃঙ্খলা আমূল বদলে ফেলার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা নজরুল কবিতায় যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি করেছেন নাটকের আঙ্গিক নির্মাণের ক্ষেত্রেও।

মধুসূদনের উত্তরসূরি ছিলেন বলেই হয়ত বালক বয়সেই মহাভারতের দৈবমাহাত্ম্যের পরিবর্তে খল চরিত্র শকুনির পিতৃহৃদয়ের আর্ত-হাহাকার তিনি বাণীবদ্ধ করেছিলেন শকুনিবধ পালায়, রামবিজয়ের পরিবর্তে রচনা করেছিলেন মেঘনাদবধ পালা। মূলত সময়ের অন্তঃস্বরকে ধারণ করার প্রয়োজনেই প্রচলিত কাঠামোর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ভিন্ন নন্দনতত্ত্বের চর্চা করেছেন তিনি, ফলে দেখা যায়–

> নজরুলের নন্দনতত্ত্বের ও নান্দনিকতার মূলে তাই প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধ। যে সময়ে নজরুল লিখেছেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি বাস করেননি; কেননা সময়টা তাঁর নিজের ছিল না, সময়টা বাঙালির ছিল না, সময়টার শাসক ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।[২৯]

এই প্রতিকূল সময়ে নজরুল সুন্দরের আরাধনা করেছেন, তিনি জানিয়েছেন "আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন।"[৩০] তাঁর কবিতায় নটরাজ শিবের বারংবার উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় সেই শিবসুন্দরকে, যে প্রলয়-সংঘটনের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির সূচনা করে। অর্থাৎ নজরুলের এই সুন্দর উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে ওঠে। এজন্যই 'ক্ষণিক উদ্দামতায় রচিত'– এমন অভিযোগে তাঁর নাটক দূরে সরিয়ে রাখার সুযোগ থাকে না। কেননা তাঁর কাব্যপ্রতিভার ভিত্তিমূল ছিল স্পষ্ট এবং সুদৃঢ়। নাটক লেখার সময় তিনি বাস্তবতা প্রকাশের ভিন্ন আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন মাত্র। তাই তিনি ফিরে আসেন মাটির কাছে, মাটিলগ্ন মানুষের কাছে। কেননা–

> তাঁর (নজরুলের) টার্গেট আকাশ নয়; শেষ পর্যন্ত মাটিই তার ঠিকানা। ... নজরুলের বিদ্রোহী বীর, ক্ষ্যাপা, বেপরোয়া মুক্ত জীবনানন্দ হলেও তাঁর 'শির' নতজানু হয় ইতিহাসের কাছেই, মাটি ও মানুষের কাছে, কেননা ইতিহাসের অনিবার্য চাপেই বিদ্রোহীকে তার নিজস্ব ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করতে হয় এবং সেই কারণেই বলতে হয়, "আমি সেইদিন হবো শান্ত।[৩১]

পুরাণ, ইতিহাস অথবা ঐতিহ্য থেকে নাটকের বিষয় এবং আঙ্গিক গ্রহণ করে সমকালের জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত করার কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন। সেজন্যই নজরুলের নাটকে পুরাণ-ইতিহাস-কিংবদন্তি সাবেক অর্থে সীমাবদ্ধ না থেকে নতুন অর্থবাহী হয়ে ওঠে, সেসবের সুপ্ত ব্যঞ্জনা বিদ্রোহী-প্রতিবাদী ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষিক বিদ্রোহের স্মারক হিসেবে পাঠ করলে নজরুলের নাটকে ভিন্ন তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব।

এছাড়া নাটক সাধারণত পরিবেশনানির্ভর শিল্পরূপ, তবে নজরুল তাঁর নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকের উপভোক্তা বিচিত্র; তিনি যখন পাঠকের জন্য নাটক রচনা করেন তখন তা পাঠ্য, বেতারে শ্রোতার উপভোগের জন্য তাঁর নাটক হয়ে ওঠে শ্রাব্য, কখনও আবার মঞ্চে দর্শকের জন্য যখন পরিবেশিত হয় তখন নাট্যকলার পরিভাষায় তা হয়ে ওঠে নাট্য। এদিক থেকে *সেতু*-বন্ধ তাঁর পাঠ্য-নাটকের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে *নওরোজ* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায়। যখন পত্রিকায় এই নাটক প্রকাশিত হচ্ছে তখন তা কতটা মঞ্চে অভিনয়যোগ্য সে-প্রসঙ্গ জরুরি থাকে না বরং যে-পাঠকের কাছে নাটক পৌঁছাচ্ছে তাদের চেতনাজগতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হচ্ছে কিনা সে-প্রসঙ্গই প্রধান হয়ে ওঠে। পত্রিকার যিনি

পাঠক, অবশ্যই তিনি শিক্ষিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই শিক্ষিত পাঠকশ্রেণিকে দিয়ে সম্পূর্ণ নাটক পাঠ করানোর একটা আকাঙ্ক্ষাও নজরুলের ছিল, তাই স্বল্প পরিসরে নাট্যঘটনার যবনিকা ঘটান।

সেতু-বন্ধ নাটকে যান্ত্রিক জড়সভ্যতার আগ্রাসনে প্রকৃতি যখন হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন নজরুল লোকঐতিহ্যের অনুসরণে বিভিন্ন বস্তু এবং প্রাকৃতিক উপাদানকে সপ্রাণ চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করার মাধ্যমে প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন নাগরিক শিক্ষিত জনমতকে প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হন। এখানে নজরুল যুগ্মবৈপরীত্যের সৃষ্টি করে, দুটি পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নজরুল ঔপনিবেশিক আর উপনিবেশিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতিই চিহ্নিত করেন। এ নাটকে ঔপনিবেশিক নাট্যরীতির বিপরীতে ভাষিক প্রতিবাদের পাশাপাশি নজরুল শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন, প্রকৃতির জয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শৃঙ্খলমুক্তির জয়গান। এই শৃঙ্খল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকেই নির্দেশ করে।

লোককাহিনি যাদের চেতনায় প্রত্নপ্রতিমা হয়ে আছে সেই সাধারণ পাঠকশ্রেণির, বিপ্লবের তত্ত্বকথায় বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই যন্ত্রপাতির "প্রাসাদ চূড়ায় কৃষ্ণপতাকায় 'সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা' কাটিয়া তাহারি নেচে লেখা হইয়াছে–'বিদ্বেষ শোষণ পেষণ।"[৩২] লেখার মধ্য দিয়ে নজরুল সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেই স্লোগানের প্রতি যে স্লোগান সামনে রেখে গণমানুষের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব। সেই স্লোগানের বিপরীত মতাদর্শ লালনকারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেন সাধারণ মানুষকে।

সেতু-বন্ধ নাটক তিন দৃশ্যবিশিষ্ট এক অঙ্কের নাটক। এ নাটকে দৃশ্যান্তর সংঘটনে গানের বড় ভূমিকা রয়েছে, তবে নৃত্য ও গীতের পাশাপাশি এ নাটকে বর্ণনাধর্মিতার প্রয়োগ পরিবেশনার ক্ষেত্রে দেশজ নাট্যরীতির অনুষঙ্গ যুক্ত করেছে।

আবার নজরুলের *শ্রীমন্ত* নাটক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় রেকর্ডাকারে শ্রুতিনাটক হিসেবে। শ্রোতারাই এর উপভোক্তা, এই শ্রোতাদের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয়ই আছে। এই শ্রোতাসাধারণের চেতনালোকে আলো ফেলার জন্য নজরুল মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের অন্তর্গত বহুলপ্রচলিত লোকশ্রুতির আশ্রয় নিয়েছেন। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য এক মঙ্গলবার থেকে পরের মঙ্গলবার পর্যন্ত আটদিনব্যাপী আসরে পরিবেশিত হতো, আধুনিক মানুষ সেই নিরবচ্ছিন্ন অবসর পেছনে ফেলে এসেছে, তাই তাদের জন্য নজরুলকে স্বল্প পরিসরে পরিবেশন করার আঙ্গিক নির্মাণ করতে হয়। এজন্যই *শ্রীমন্ত* নাটকে অনাবশ্যক-অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা নয়, দ্বন্দ্ব-সংশ্লিষ্ট মূলঘটনাই নজরুলের অবলম্বন হয়ে ওঠে।

লোকপুরাণের প্রচলিত উপাদানে নজরুল সম্ভাবনার সঞ্চার করায় মঙ্গলকাব্যের ঘটনাও উপনিবেশবিরোধী বয়ান হয়ে ওঠে। উপনিবেশায়নের প্রথম ধাপ, উপনিবেশিত জাতির মনে হীনমন্যতার বোধ তৈরি করা। শ্রীমন্তের পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে কটাক্ষ, সেই হীনমন্যতা তৈরির দ্যোতক হয়ে ওঠে। তাই হারিয়ে ফেলা অস্তিত্বচিহ্ন খোঁজার জন্য আত্মমর্যাদাবোধে জাগ্রত হয়ে শ্রীমন্ত যখন মাকে জানায়–

> মা বাবাকে আমি খুঁজতে যাব, যার তার ছেলে আমায় মন্দ বলে, বলে আমার বাবা নেই। আমার কান্না পায়, আমি সইতে পারিনে। আমি যাবই যাব–আমি বাবাকে ফিরিয়ে আনব, না হয় আমিও আর ফিরব না।[৩৩]

–তখন শ্রীমন্তের পিতৃ-অনুসন্ধান হয়ে ওঠে মূলত উপনিবেশিতের আত্ম-আবিষ্কার ও স্বদেশসন্ধান; যা আত্মপরিচয়ের সঙ্গে জড়িত। অস্তিত্ব-অন্বেষী শ্রীমন্তকে তাই সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিংহলে দুঃসাহসী অভিযাত্রা পরিচালনা করতে হয়। এই অভিযানে সবাই নিরুৎসাহিত করলেও শ্রীমন্তকে উৎসাহ দেয় প্রাচীন ঐতিহ্যের 'থুরথুরো নননুরো বুড়ো', যারা নিজেদের কারিগরিতে সিংহল যাত্রার উপযোগী নৌকা তৈরি করে। শ্রীমন্তের ভাষায় "গঙ্গার জলে আমার সাতটা ডিঙে–জাহাজের মত বড়! ওকে কি বলে মা, ডিঙে তো?"[৩৪] ডিঙের সঙ্গে জাহাজের তুলনা প্রকারান্তরে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনা হয়ে ওঠে এবং শ্রীমন্ত এখানে প্রাচ্যকেই আঁকড়ে ধরেছে। আর এভাবেই শ্রীমন্ত কর্তৃক কারারুদ্ধ পিতাকে উদ্ধারের ঘটনা পরাধীন ভারতবর্ষের বন্ধনদশা মুক্তির রূপক হয়ে ওঠে।

রেকর্ডনাটক যেহেতু কানে শোনার বিষয়, তাই তা অবশ্যম্ভাবী গীতিধর্মী। বাঙালির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যে গীতিপ্রাণতা রয়েছে, তার রূপায়ণেই নজরুলের নাটকে গানের প্রাধান্য ঘটেছে, এমনকি সংলাপও গীতিময় হয়ে উঠেছে। লোকছড়া দিয়ে শুরু *শ্রীমন্ত* সমবেত কণ্ঠের অভয়মন্ত্র উচ্চারণে শেষ হয়, নেপথ্য সংগীতের পাশাপাশি দৃশ্যান্তরের ক্ষেত্রেও গানের প্রয়োগ করেন নজরুল। এখানে অঙ্ক বিভাজন নেই বরং ৭টি দৃশ্যের নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি দৃশ্যে শ্রীমন্তের বাংলা থেকে সিংহল অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে জীবনাবেগের সচলতা চিহ্নিত।

মধুমালা নাটক ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এবং ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার নাট্যভারতীতে (সাবেক আলফ্রেড থিয়েটার) মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকই নজরুলের সর্বাপেক্ষা মঞ্চসফল নাটক, ৪০ রজনী অভিনয় চলেছিল বলে জানিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।[৩৫] সাধারণত নাটক মঞ্চায়িত হয় সহৃদয় সামাজিকগণের উদ্দেশে, কিন্তু কলকাতার এই নাগরিক 'সামাজিক সজ্জন' গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন লোকসংস্কৃতির উৎসমূল থেকে। তাঁদের উদ্দেশে নজরুল লোকসংস্কৃতির রস পরিবেশন করেন। *মধুমালার* কাহিনি পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত।[৩৬] আর গীতিকা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিশিষ্ট সংরূপ। চরিত্রমূলক পরিবেশনরীতি-সূত্রে এসব গীতিকা নাট্যমূলক পালা হিসেবে চিহ্নিত হয়। সেলিম আল দীন বলেন–

> গীতিকা, পাঁচালি বা কথকতার মতো নিতান্তই আসরের সামগ্রী। এর অন্তর্গত কাহিনির আঙ্গিক, নাট্যমূলক উপস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, মধ্যযুগের বাঙলা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা নিঃসন্দেহে এক স্বতন্ত্রধারার নাট্যরীতি রূপে বিবেচ্য।[৩৭]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গীতিকা আসরকেন্দ্রিক এবং গেয় নাট্যকাঠামো। গীতিকায় গানের সংযোজন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে এবং নাট্যঘটনায় গতি সঞ্চার করে, কারণ সংলাপে বা বর্ণনায় যে অভিব্যক্তির প্রকাশ সম্ভবপর নয়, তা গানে সম্ভব। তারই ধারাবাহিকতায় *মধুমালায়* নজরুল অনেকগুলো গানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

এছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায়, বিয়োগান্ত পরিণাম আছে শুধু *মনসামঙ্গল* আর *লায়লী-মজনু* কাব্যে; সেদিক থেকে গীতিকার পালাগুলো ব্যতিক্রম। নজরুলের *মধুমালা* নাটকে বিয়োগান্ত

পরিণাম বিশ শতকের বাঙালি জীবনের রূপক হয়ে ওঠে। লোকমুখে প্রচলিত মধুমালা-মদনকুমারের প্রেমের কাহিনিকে নজরুল সমকালীন জীবনচেতনায় জারিত করে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তাই রূপকথার অলৌকিক ভূগোল, হিমালয়-পাদদেশের কাঞ্চননগর থেকে বঙ্গোপসাগরস্থ সন্দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। যা সমগ্রকে ধারণের প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

গীতিকা-র রীতি অনুযায়ী নজরুলের মধুমালা চরিত্র ব্যক্তি অপেক্ষা সৌন্দর্যের আদর্শ বা ছাঁদ (Type) হিসেবে বিবেচ্য। তাই মধুমালারূপ যে সুন্দরের অনুধ্যান মদনকুমার করে তা সহজলভ্য নয়, তাকে পাওয়া যাবে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তাই মদনকুমারের উপলব্ধি–

> আসে আসে আমার সুন্দর রুদ্রের রূপে আসে। ঐ বিজলি শিখায় তার সোনার কাঁকনের ঝিলিক। ধূলি-গৈরিক গগন কোণে দোলে তার চন্দন-রং উত্তরীয়। পুঞ্জিত কালো মেঘে তার কেশভার। ঝঞ্ঝার রাতে অসীম বিরহের আর্ত রোদন-ধ্বনি আমি শুনেছি। মরণের মাঝে তোমার আহ্বান আমি শুনেছি মধুমালা–মধুমালা।[৩৮]

সবাই মদনকুমারকে অভিযাত্রার আকাঙ্ক্ষা থেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় সেকেন্দার শা'র জারিগান শুনিয়ে। কিন্তু লোকঐতিহ্যের জারিগান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নজরুল মদনকুমারের এই উদ্দীপনাকে বৃহৎ ব্যঞ্জনা দান করেন, "সেকেন্দার শা : ... ও জীবনের বড়পাতায় প্রেমকে পাইছে– মজনুর মতো লায়লিকে পাইছে– ফরহাদের মতো শিরিকে পাইছে– এই লায়লিকে যে পায় লা এলাকে পাইতে তার দেরি হয় না।"[৩৯]

মধুমালা কল্পলোকের অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য অন্যদিকে কাঞ্চনমালা হয়ে ওঠে বাস্তব পৃথিবীর রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। নজরুল বাস্তবেই ফিরে আসেন। মধুমালা কেবল কল্পনাতেই সম্ভব, সেই কল্প-সৌন্দর্যের জন্য মদনকুমারের প্রাণান্ত সংগ্রামের বিপরীতে নজরুল কাঞ্চনমালার বাস্তব সংগ্রামকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। তাই কাঞ্চনমালার সংলাপে আবেগের সঙ্গে দৃঢ়তা প্রকট হয়– "তুমি মধুমালাকে স্বপ্নে দেখে যদি এই দূর পথ অতিক্রম করতে পার আর আমি আমার স্বামীকে বরণ-ডালার পঞ্চপ্রদীপের আলোকশিখায় দেখে সেই পথ পার হতে পারব না?"[৪০]

সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের মিলনে বিকৃত-খর্ব এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুন্দর-অসুন্দরের এই যুগ্মবৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক বাংলার অরাজকতার দিকে নজরুল যখন আমাদের দৃষ্টি ফেরান তখন লোকপ্রচলিত রূপকথা আর রূপকথা থাকে না। ছলনাকারী মগরাজ বাংলার জলে-স্থলে বিভীষিকা সৃষ্টির মাধ্যমে যে মগের মুল্লুক তৈরি করেছে, তার তুলনা কেবল উপনিবেশিত বাংলাই হতে পারে। অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে, নজরুলের প্রত্যাশা, আঘাতের পরিবর্তে প্রত্যাঘাত দিতে হবে, তাঁর সেই প্রত্যাশারই রূপায়ণ দেখি গৌড়েশ্বরের সংলাপে–

> এতদিন বাংলার ভাণ্ডার লুটে যে পাপ সঞ্চয় করেছে আজ তার শাস্তি দেবো– সমুচিত শাস্তি দেবো। যাও সেনাপতি, যুদ্ধ করো– আমিও আসছি। মন্ত্রী, তুমি কুল্লনাদের রক্ষা করো– যদি মগ জয়ী হয়–ওদের গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিও।[৪১]

গৌড়েশ্বরের এই সংলাপ একই সঙ্গে অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অস্তিত্ব ঘোষণার দ্যোতক। নজরুল যুদ্ধের তীব্রতায় মগবাহিনীর পলায়নদৃশ্য অঙ্কনের মাধ্যমে জয় ঘোষণা করেন শোষিতের। নজরুলের দৃঢ় বিশ্বাস সংগ্রামে শোষিতেরই জয় হবে।

অঙ্কবিভাজনের ক্ষেত্রে এ নাটকে নজরুল দেশীয় রীতিপদ্ধতিই প্রয়োগ করেছেন, তাই তিন অঙ্কে বিন্যস্ত *মধুমালা* নাটকে দৃশ্যান্তর চিহ্নিত করেননি তিনি, তবে প্রতিটি দৃশ্যের শেষে পরিস্থিতি অনুযায়ী গান সংযোজন করে পরের দৃশ্যের অবতারণা করেছেন।

আবার মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক লোককাহিনিকে যেভাবে অধ্যাত্মব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করা হয়েছে, তা অভাবনীয়। চৈতন্যদেবের প্রেরণায় রচিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক অসংখ্য পদ। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে রচিত পদের সংখ্যাও কম নয়। চৈতন্যদেব ছাড়াও নিত্যানন্দ-অদ্বৈতসহ বিভন্ন মহাজন বৈষ্ণবদের নিয়েও অধ্যাত্মব্যঞ্জনাঋদ্ধ পদ রচনার প্রয়াস দেখা যায়। বৈষ্ণব-ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নরোত্তম দাসের খেতুরি মহোৎসবে, যেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের লীলা ও রসপর্যায় অনুসারে পদ গাওয়ার রীতি নির্ধারণ করে কীর্তনের নতুন আঙ্গিক-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। *বিদ্যাপতি* নাটকেও নজরুল কীর্তনের সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিদ্যাপতি রচিত ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন পদ ঘটনা-পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্ত করেছেন। আর এভাবেই নজরুল কবি বিদ্যাপতির জীবনী নাটকের আঙ্গিকে ধারণ করেছেন।

আঙ্গিকবৈচিত্র্যের পাশাপাশি নজরুলের সবচেয়ে বিচিত্রপ্রসারী নাটক *বিদ্যাপতি*। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এই নাটক একই বছরে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েজ রেকর্ডে' রেকর্ড-নাট্যাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, পরবর্তীতে এই রেকর্ড কোম্পানির উদ্যোগেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে মঞ্চে অভিনীত হয় এবং ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ও হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র হিসেবে মুক্তি পায়। অর্থাৎ এই নাটক বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। চৈতন্যপূর্ব যুগে মিথিলার কোকিল বিদ্যাপতি বাঙালি না হয়েও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করে বাঙালি মানসে অনপনেয় ছাপ রেখেছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বিদ্যাপতিকে মহাজন ভক্ত হিসেবে শ্রদ্ধা করলেও সাধারণ লৌকিক প্রেমের কবি হিসেবেও অনেকে তাঁকে চিহ্নিত করেছেন। বিমানবিহারী মজুমদার জানিয়েছেন বিদ্যাপতির জন্ম ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে।[৪২] এই সময়ে ইতিহাস ও রাজনীতিসচেতন কবি বিদ্যাপতি ভারতবর্ষের ইতিহাসের সংকটমুহূর্ত অবলোকন করেছেন, *কীর্তিলতা* গ্রন্থ তার প্রমাণ বহন করে। এছাড়া বিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপতি সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য প্রদান করেছেন, বিদ্যাপতির *কীর্তিলতা* ও *কীর্তিপতাকা* কাব্যে—

> যুদ্ধাদি বর্ণনার বাস্তবতার প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান করেন, হয়তো কবি স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। যদি সেকথা সত্য হয়, তাহা হইলে, আমরা বিদ্যাপতির মধ্যে চতুর্দশ শতকের এক সৈনিক কবিকে পাইতেছি।[৪৩]

বিদ্যাপতি রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়াজনিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নজরুলও উপনিবেশিত রাষ্ট্রের জটিলতা প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনিও প্রথম জীবনে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সৈন্যবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন করলেও লড়াই সংগ্রামে তাঁকে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে সারাজীবন। সেদিক থেকে বিদ্যাপতির জীবনী নজরুলের আকর্ষণ উদ্রেক করা অস্বাভাবিক নয়।

এছাড়া কবি বিদ্যাপতির জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে নজরুল নিজের জীবনের সাদৃশ্য পেয়েছেন। রাজশক্তি কীভাবে কবির কণ্ঠরোধ করে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিদ্যাপতির জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, নজরুলকেও রাজরোষে জেল খাটতে হয়েছে। তাই বলা যায়, কবির সংকট এবং প্রতিভার সক্ষমতা এই নাটকে উদ্ভাসিত হয়েছে। রাজরোষ বিদ্যাপতিকে তাঁর কবিত্বের মূলাধার লছিমা দেবীকে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে কিন্তু এক সময়ে রাজশক্তি কবিত্বের কাছে নত হয়ে পড়ে, বিদ্যাপতি হয়ে ওঠেন কবি-কণ্ঠহার।

আবার বিদ্যাপতির প্রায় দুই শতাধিক পদে শিবসিংহের উল্লেখ রয়েছে, বিভিন্ন পদে রাজা শিবসিংহের সঙ্গে রানি লছিমা দেবীরও উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের জীবদ্দশায় লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির ঘনিষ্ঠতা দেখে তাঁর প্রতি বিদ্বেষবশত অনেকে তাঁদের সম্পর্ককে নিগূঢ় প্রণয়ের সম্পর্ক হিসেবে প্রচার করেছে। নজরুল নাটকের ঘটনা হিসেবে লোকপ্রচলিত সেই পরকীয়া প্রেমের কিংবদন্তিকেই গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবনলীলার অনুষঙ্গে অধ্যাত্মপ্রেমের ব্যঞ্জনা তৈরি হলেও বৈষ্ণবীয় অধ্যাত্ম প্রেমকে এ নাটকে নজরুল বস্তুভিত্তি দান করেন।

কীর্তনে রসপর্যায় অনুযায়ী লীলানুগ পদ গীত হয়, নজরুল এ নাটকে বিদ্যাপতির জীবনপ্রবাহের স্তরান্তর অনুযায়ী পদ যোজনার দক্ষতা দেখিয়েছেন আবার রানি লছমীর রূপানুরাগের উন্মেষ থেকে বিরহবেদনায় প্রেমের ক্রমবিকাশও দেখিয়েছেন। কিন্তু এখানে বিদ্যাপতি দেহাতীত নিষ্কাম প্রেমের পক্ষপাতী হলেও রানি অধ্যাত্মপ্রেমের সুখ চায় না, তাই সে বলে, "শোনো বিদ্যাপতি, আমি চাই না শূন্য প্রেম– যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, আমি চাই তোমাকে–তোমার প্রাণ-মন-দেহ-আত্মা– তোমার সকল কিছুকে।"[৪৪] প্রেমের নতুন সংজ্ঞায়ন করেন নজরুল, প্রেমকে তিনি শৃঙ্খলমুক্তির উপায় হিসেবে দেখেন, বিদ্যাপতি তাই বলে, "তোমার প্রেমই প্রেম, অনুরাধা, যা পায়ে শৃঙ্খলের মতো জড়িয়ে থাকে না, সে প্রেম দেয় অনন্তলোকে অনন্ত-মুক্তি।"[৪৫] তাই কামনা-বিসর্জন দিয়েই সর্পদংশনজ্বালা আর মরণ-সাগর পাড়ি দিয়ে তবেই তাদের অনন্ত মিলন ঘটে। এর মধ্য দিয়ে নজরুল ত্যাগ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিয়ে যান।

উল্লেখিত নাটকগুলোর কোনোটিই পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নয়, নাট্যঘটনার স্তরবিন্যাসে নজরুল ঐতিহ্যবাহী কলাকৌশলের প্রয়োগে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাই *বিদ্যাপতি* নাটকে নজরুল দৃশ্য বা অঙ্ক নয় এখানে তিনি নাট্যঘটনা খণ্ডে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের পরিবেশনা-ভাবনা থেকে নজরুল এই খণ্ড বিভাজনেও বৈচিত্র্য এনেছেন, রেকর্ডাকারে নাটকটি ৭টি রেকর্ডে ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে নজরুল একটি খণ্ড কমিয়ে ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে নজরুল এই বার্তা দেন যে, মঞ্চে বা পর্দায় উপস্থাপনের জন্য নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাজন মোটেও জরুরি বিষয় নয়।

উপসংহার

নজরুল বিদ্রোহের ভাষ্য রচনা করেছেন, কখনো কবিতায়, কখনো গানে, কখনো আবার নাটকে। ভাষা নামক ডিসকোর্সের ভেতর, বিকল্প ক্ষমতার এক বয়ান গড়ে তুলেছেন তিনি। তিনি ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের শৃঙ্খলা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নিজের দেশ এবং দেশের প্রান্তিক নিম্নবর্গের

চেতনা ও বিক্ষোভের রূপায়ণ করেন। নাটকেও নজরুলের এ প্রবণতা সক্রিয় কিন্তু তাঁর নাটক বিচারে সর্বত্রই প্রথাগত ঔপনিবেশিক নাট্য-কাঠামোর মানদণ্ডের প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে সেখানে ভাবাবেগের আতিশয্য, বাস্তববোধের অভাব প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে নজরুলের নাট্য প্রতিভার উৎসমূলে, যেখানে লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা লেটো গানের সঙ্গে নজরুলের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। সেই সংশ্লিষ্টতাসূত্রেই নজরুল পরিচিত ছিলেন নিম্নবর্গের জীবনচেতনা এবং দেশীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যসংরূপের সঙ্গে। তাই ত্রিশের দশকে আবির্ভূত আধুনিকতাবাদের বিপরীতে দেশীয় নাট্যকাঠামোর চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে প্রেরণা ও বিষয় সংগ্রহ করে উপনিবেশের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ভাষা নির্মাণ করেছেন। এই 'ভাষা' হিসেবে নজরুলের নাটক পাঠ করতে গেলে দেখা যাবে, তাঁর নাটক বিষয়-ভাবনা ও পরিবেশনারীতির দিক থেকে পাশ্চাত্য কাঠামোকে যেমন প্রত্যাখ্যান করে, তেমনই বাস্তবতাকে গভীরভাবে অঙ্গীকার করেই বিশশতকীয় ইউরোপীয় হতাশাবাদী আখ্যানের পরিবর্তে উপনিবেশবিরোধী বাঙালির অস্তিত্বসচেতন সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Gustav Freytag, *Technique of the Drama: an exposition of Dramatic Composition and Art*, S. C. Griggs & Company, Chicago, 1895, Chap 2, p. 104

২. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১৪৩

৩. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৪, পৃ. ১৩৬

৪. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৫. ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র* ৩, (অনু.) ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৫৫-৫৬

৬. "কোনো কোনো ইতিহাসকার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যের সঙ্গে আধুনিককালের নাট্য ইতিহাসের একটি ক্ষীণ সেতুবন্ধনে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস যুক্তি-প্রামাণ্য ও পারম্পর্যসিদ্ধ নয়, ফলে ঔপনিবেশিককালের ইতিহাস চেতনার বিপুল ও অভিব্যাপ্ত ধারার মুখে তা সামগ্রিক সত্যে দৃঢ়মূল দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি।" (সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুলাই ২০১৮, পৃ. ১৮)

৭. ইব্রাহীম খাঁ, '*নাট্যরচনায় নজরুল ইসলাম*', *নজরুল-পরিচিতি*, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২৬ মে ১৯৫৯, পৃ. ৯৬-৯৭

৮. নীলিমা ইব্রাহীম, 'নজরুলের নাটক', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *নজরুল সমীক্ষণ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮

৯. আবদুল হক, 'নজরুলের নাটক', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *নজরুল সমীক্ষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১-৪৮২

১০. ইব্রাহীম খাঁ, 'নাট্যরচনায় নজরুল ইসলাম', *নজরুল-পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি*, পঞ্চম খণ্ড, (সম্পাদক: অনু হোসেন), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৬, পৃ. ২৯৩

১২. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুলাই ২০১৮, পৃ. ৪৬

১৩. আবদুল কাদির, *নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ*, (সম্পাদনা: শাহাবুদ্দিন আহমদ), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৮৫

১৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি*, পঞ্চম খণ্ড, (সম্পাদক: অনু হোসেন), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১৬. সৈয়দ জামিল আহমেদের ভাবনাও অনুরূপ, তিনি 'Indigenous theatre'-এর ধারণা দিয়ে বলেন, 'Indigenous' is that which is 'born or produced naturally in a land of region'. The term 'theatre' denotes any action produced by an individual or a group for another individual or a group in any three-dimensional space. (Sayed Jamil Ahmed, *Achinpakhi Infinity*, The University Press Limited, Dhaka, 2000, p. 18)

১৭. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৮. A performance can be composed of (1) dance, (2) instrumental music and (3) speech rendered in prose, verse or lyric, either in the form of narration or that of dialogue. (Sayed Jamil Ahmed, *Achinpakhi Infinity*, Ibid, p. 18)

১৯. হুমায়ুন কবির, *বাংলার কাব্য*, (সম্পাদক: আনিসুজ্জামান) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৬৪
২০. আজফার হোসেন, *পাঠ: শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের রাজনীতি*, সংহতি, ঢাকা, আগস্ট ২০২২, পৃ. ১৬৭
২১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৯
২২. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৪২
২৩. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩৫৭
২৪. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭
২৫. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৬. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
২৭. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫৮
২৯. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৩০. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৭
৩১. আজফার হোসেন, *পাঠ: শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
৩২. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪
৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
৩৫. বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র: মধুমালার গোড়ার কথা, উদ্ধৃত, *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৭৩১
৩৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬, পৃ. ২৭৫
৩৭. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
৪২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১২২
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৪৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৩২
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

পূর্ব বাংলায় নারী পেশাজীবী শ্রেণি (১৯৪৭-৭০)

আসমাউল হুসনা*

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান শাসনামলে বিচিত্র পেশায় নারীর পদচারণার মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলায় একটি নারী পেশাজীবী শ্রেণি গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে নারীশিক্ষার যে প্রসার শুরু হয়েছিল দেশভাগের প্রেক্ষাপটে সেখানে স্থবিরতা নেমে এলেও ৬০'র দশকে এসে তা পুনরায় গতি সঞ্চার করে। এ সময় স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করতে শুরু করে বিপুল সংখ্যক নারী। চিকিৎসা, প্রকৌশল, ব্যবসা প্রশাসন ইত্যাদি পেশাগত বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে তারা। ফলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেশাজীবী হিসেবে নারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। একই সাথে দেশভাগ পরবর্তী দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়নকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার জনজীবনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। যা নারীদের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা হতেও উৎসাহিত করে। এটি একদিকে যেমন নারীর আর্থিক সক্ষমতাকে তুলে ধরে অপরদিকে তা নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকেও নির্দেশ করে। কেননা আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জিত হওয়ার মধ্যদিয়ে পরিবার ও সমাজ কাঠামোর নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ প্রবন্ধে পূর্ব বাংলায় নারী পেশাজীবীদের সেই ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

চাবি শব্দ: পূর্ববাংলা, নারী, পেশা, পেশাজীবী শ্রেণি।

ভূমিকা

পেশাজীবী শ্রেণি হিসেবে বাঙালি নারীর যাত্রা শুরু হয় উনিশ শতকে শিক্ষকতা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার মধ্যদিয়ে। পরবর্তীতে শিক্ষকতার পাশাপাশি চিকিৎসা পেশাতেও নারীরা যোগদান করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য পেশাতেও নারীর আগ্রহ বাড়তে থাকে। জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যে কাজে নিয়োজিত থাকে মূলত সেই কাজকেই বলা হয় তার পেশা। মানুষ তার পেশাকে অবলম্বন করে ভিন্ন একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে এবং একত্রে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। নিম্নবর্গের মানুষেরা সাধারণত পেশাকেন্দ্রিক বসবাসের স্থান নির্বাচন করে। পেশাকে কেন্দ্র করে সেইসব এলাকার পরিচিতি গড়ে ওঠে। যেমন– জেলে পাড়া, তাঁতী পাড়া, কুমার পাড়া, কামার পাড়া ইত্যাদি। পেশার সাথে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ভর করে। ফলে পেশাকে কেন্দ্র করেই সেই ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে মূল্যায়ন করা হয়।[১] তবে নারীর ক্ষেত্রে এ পথ কখনই মসৃণ ছিল না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও প্রচলিত সমাজ কাঠামোর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নারীর জন্য

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রহণযোগ্য পেশা। অনেক সময় পেশাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় না। পাকিস্তান শাসনামলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পেশাগ্রহণ নারীর জন্য ছিল অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রের নীতি ও কৌশল। যা শুরু থেকেই ছিল নারীর অধিকার আদায় ও সক্ষমতা অর্জনের অন্তরায়। অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের অঙ্গীকার নিয়ে গড়ে ওঠা পাকিস্তানে সবার মতো নারীদেরও প্রত্যাশা ছিল, কর্মসংস্থানের সুযোগসহ অন্যান্য অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। ফলে কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ ও সংখ্যাও ছিল ক্রমবর্ধমান। এ সময় পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আসে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিকূল পেশাতেও নারীরা অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। এরূপ প্রেক্ষাপটে কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের মধ্যদিয়ে একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে নারীরা সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজেদের কতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল বর্তমান গবেষণায় সে-বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যবহুল গবেষণা হলেও নারীর পেশা জীবন সম্পর্কিত গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত। তাই স্বল্পালোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বর্তমান প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গবেষণায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, দেশভাগ, সামাজিক রূপান্তর, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পূর্ববাংলায় নতুন নতুন পেশার উদ্ভব এবং নারীর অংশগ্রহণের আধিক্যের ভিত্তিতে সেসব পেশার বর্ণনা। একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা নিরূপণ করা জরুরি। সর্বোপরি পেশা জীবনে নারীর সাফল্য ও প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করাও আবশ্যক। উক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধের সুস্পষ্ট গবেষণা প্রশ্নটি হলো– পূর্ববাংলায় নারীর পেশার প্রকৃতি ও পেশাজীবনে নারীর অবস্থান কী ছিল? ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে আর্কাইভাল তথ্যাদি, সাক্ষাৎকার, আত্মজীবনী ইত্যাদি প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। তবে প্রবন্ধে কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমনির্ভর পেশা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী নারীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

দীর্ঘকালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে বাঙালি নারীর জীবন বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। গৃহে আবদ্ধ থেকে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও স্বামীসেবাকেই নারীর আদর্শ কর্ম বলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ধারণা করা হতো। পারিবারিক জীবনে নারীর এ অনবদ্য ভূমিকা সত্ত্বেও নগদ অর্থমূল্য না থাকায় এর কোনো সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। অধিকন্তু অবরোধ প্রথা, কৌলীন্য, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষাসহ নানা শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও সামাজিক সংস্কার নারীর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তবে উনিশ শতকের শুরুতে শিক্ষার প্রসার, সামাজিক রূপান্তর নারীর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এ সময় নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। শিক্ষিত নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করলে নারীর চিরায়ত ভূমিকার ক্ষেত্রেও আসে পরিবর্তন যা তাকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। উনিশ এবং বিশ শতকে বাঙালি নারীর আর্থ-সামাজিক এরং রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার আত্মজাগরণের ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা

সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নে এ সকল গবেষণার আলোকে একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে বাঙালি নারীর অবির্ভাবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

সামাজিক রূপান্তর, আধুনিক শিক্ষা ও নতুন পেশায় বাংলার নারী: ব্রিটিশ আমল

উনিশ শতক থেকেই বাঙালি নারীর আত্মজাগরণ শুরু হয়।[২] একই সময় বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে তা নারীর জীবনকেও প্রভাবিত করে। এসময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসেবে বাংলায় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ মদতেই এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি গড়ে ওঠে। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে যে আর্থ-সামাজিক নীতিগুলো কাজ করেছে তার মাঝে অন্যতম নতুন ভূমিব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।[৩] এর ফলে পুরাতন জমিদারদের স্থলে এক নতুন জমিদার শ্রেণি গড়ে ওঠে। যাদের অধিকাংশই শহরে বসবাস করত এবং ইংরেজদের অধীনে দেওয়ানি, মুৎসুদ্দিগিরি, হাট বাজারের ইজারা লাভ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সম্পৃক্ত ছিল। এ জমিদার শ্রেণিই নতুন বিত্তবান শ্রেণিতে পরিণত হয়।[৪] এছাড়া প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচনের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শুরু থেকেই প্রশাসনিক নিম্নপদে দেশীয়দের নিয়োগের নীতি গ্রহণ করেছিল। এ লক্ষ্যে দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করা হয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এ উদ্যোগ আরও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়।[৫] ধীরে ধীরে বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় আইনপেশা, চিকিৎসাপেশা, লেখক ইত্যাদি পেশাজীবী শ্রেণিরও উদ্ভব হতে থাকে। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। যদিও মুসলিম সমাজ এ ধারায় বিকশিত হয়নি সেই সময়ে। ঐতিহাসিক এ আর মল্লিক তাঁর গবেষণায় দেখান, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার তাদের জমিদারি হারায়, ১৮৩৪ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করা হলে বিচার বিভাগের অধিকাংশ মুসলমান চাকরিজীবী চাকরিচ্যুত হয়। কেননা কাজি, মুফতি, মৌলবি, প্রভৃতি নিম্নপদে মুসলমানরা বেশি নিয়োজিত ছিল। ফলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে তারা এসময় হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে পড়ে।[৬]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাঝে আধুনিক ভাবধারা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে। হিন্দু সমাজের চিরাচরিত আচার ব্যবস্থা, রীতিনীতি, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রতি তাদের বিশ্বাস কমতে থাকে। এ শিক্ষিত শ্রেণির কাছে পরিবার ও সমাজের অর্ধাংশ নারীর পশ্চাদপদ ও অবরুদ্ধ জীবনের চিত্রটি বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ আঠারো শতকে বাঙালি নারী ছিল শিক্ষা থেকে দূরে অবরোধ প্রথা, কৌলীন্য, বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা বন্দি। নারীর অবস্থার উন্নয়নে এ সময় বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়। যার মাঝে উল্লেখযোগ্য সতীদাহ প্রথা, অবরোধ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। একই সঙ্গে বিধবা বিবাহ প্রচলনেরও প্রয়াস নেয়া হয়। তবে এ সমস্ত উদ্যোগের মাঝে নারী শিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নারী শিক্ষা শুরু হয়নি।[৭] উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ঔপনিবেশিক সরকার, খ্রিষ্টান মিশনারিগণ, কোম্পানির কর্মকর্তা, এদেশে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকবৃন্দ এবং বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সহায়তায় নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৪৯ সালে বড় লাটের আইন–সচিব জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের প্রচেষ্টায় কলকাতায় প্রথমে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯ সালে এটিকে কলেজে রূপান্তর করা হয়। ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী মেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করে।[৮] উনিশ শতকের শেষের দিকে এসে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী নারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গেজেট থেকে উনিশ শতকে ৪ জন এমএ, ২০ জন বিএ এবং ৪ জন চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি প্রাপ্ত নারীর কথা জানা যায়।[৯]

তবে উনিশ শতকে হিন্দু ও ব্রাহ্ম নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেও মুসলিম নারীর অবস্থা তখনও ছিল পশ্চাদপদ। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গন এবং জনসমক্ষ থেকে দূরে রেখে নিজস্ব গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ করে ফেলে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল রক্ষণশীলতা এবং সনাতনী মূল্যবোধের নতুন চর্চা। যার বিরূপ প্রভাব পড়ে নারীদের ওপর। তারা তখন ঐতিহ্য চর্চার আধারে পরিণত হয়।[১০] ফলে মুসলিম নারী শিক্ষা কিংবা নারী অগ্রগতির পথ ছিল অনেকটাই সংকুচিত। অবশ্য উনিশ শতকের শেষের দিকে এসে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে থাকে। এসময় পূর্ববঙ্গেও নারীর অবরোধ থেকে মুক্তি, সমঅধিকার ও মর্যাদা এবং নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ব্রাহ্ম সমাজ কলকাতার মতো পূর্ববঙ্গেও বিভিন্ন শহরে নারী শিক্ষার সূচনা ও প্রসারে কাজ করে । ১৮৭০ সালে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা*, *শুভাসাধিনী সভা*। ময়মনসিংহে ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা'র* শাখা। এসময় কোনো কোনো পাঠশালায় নারীদের জন্য জেনানা ক্লাস ছিল।[১১] ১৯০১ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, অন্তঃপুরে আরবি, উর্দু ও বাংলার সাথে সে-সময় ৪০০ মুসলমান নারী ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[১২] শুধু ব্যক্তি উদ্যোগ নয় সরকারের পক্ষ থেকেও নারী শিক্ষার প্রসার উৎসাহিত করা হয়। *ঢাকার কথা* গ্রন্থে বলা হয়েছে, নারী শিক্ষার প্রসারে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং ১৯০৮-১৯০৯ সালের মধ্যে প্রদেশে ৮১৯টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫,৪৯৩ জনে। এ সময় মুসলিম সমাজে পর্দার কঠোরতা লক্ষ করে মুসলিম বালিকাদের জন্য বাড়িতে বসে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেয় সরকার।[১৩] ফলে বিশ শতকে এসে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। নিম্নের পরিসংখ্যানে দশক অনুযায়ী নারী শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হলো।

বছর	নারী শিক্ষার হার মোট (১০০%)
১৯০১	০.৬
১৯১১	১.০

১৯২১	১.৮
১৯৩১	২.৯
১৯৪১	৭.৯

উৎস: *Census of Pakistan-1951*, Vol. 3, Government of Pakistan, Korachi, p.104

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় নারীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯২৩ সালে লীলা নাগ প্রথম ছাত্রী হিসেবে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ফজিলাতুন্নেসা প্রথম মুসলিম ছাত্রী হিসেবে ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৩-১৯৪৪ সালে বিশ্বদ্যিালয়ে মোট ১০৭৭ শিক্ষার্থীর মাঝে ৮০ জন ছিল ছাত্রী। পরবর্তী সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৮৫ জন।[১৪]

নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে নারীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। জীবন ও মূল্যবোধের নতুন ধারণা নিয়ে নারীরা নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষা লাভের ফলে নারীদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সময় নারীদের মাঝে চাকরি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।[১৫] যদিও উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেনি। তবে স্বল্পবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নারীদের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধি-নিষেধের আরোপ কম থাকায় এবং দরিদ্র ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা শুরু থেকেই নানা পেশায় নিয়োজিত ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের পর নারীরা চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করে। পেশা হিসেবে প্রথম শিক্ষকতাকেই বেছে নেয় নারীরা। কারণ এ সময় নারী শিক্ষা বিস্তারে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেখানে নারী শিক্ষকের প্রয়োজন থাকায় নারীদের চাকরির একটা সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও পরিদর্শন বিভাগেও নারীদের চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। শিক্ষকতা পেশা হিসেবে প্রথম বেছে নিয়েছিলেন বামাসুন্দরী দেবী। তিনি নিজ উদ্যোগে পাবনায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিক্ষকতা শুরু করেন।[১৬] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে বাঙালিদের মাঝে প্রথম শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন সুখীনি। তিনি বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জ গার্লস স্কুলে ৫ টাকা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর সেখানে একাধিক নারী শিক্ষক ও প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন।[১৭] এছাড়া ১৮৭৯ সালে মনোমোহিনী হুইলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু বেথুন স্কুলের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক থেকে তত্ত্বাবধায়ক পদে উন্নীত হন।[১৮] শিক্ষকতার পর নারীদের সর্বাধিক অংশগ্রহণ ছিল চিকিৎসা ও ধাত্রী পেশায়। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের কারণে মূলত সমাজে নারী চিকিৎসকের চাহিদা বেশি ছিল। এসময় চিকিৎসক বলতে ছিলেন ইংরেজ ডাক্তার ও দেশীয় কবিরাজ। ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের কারণে সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা তাদের কাছে চিকিৎসা নিতে যেতেন না। এ কারণে ১৮৭০ সালে কলকাতা ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে নার্সিং ও মিড ওয়াইফারিতে নারীদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া হলে বাঙালি নারীদের নার্সিং ও ধাত্রী পেশায় আসার সুযোগ তৈরি হয়। ঢাকা

মেডিকেল স্কুল চালুর পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলার নারীরা ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলেই পড়তে যেতেন। প্রথম নারী চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন কাদম্বিনী বসু। ১৮৮৭ সালে এমবিবিএস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও পরবর্তীতে তিনি বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট সনদ লাভের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান শুরু করেন।[১৯] নারীদের মাঝে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে নারী সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারগুলোও সমাজে কমতে থাকে এবং নারীরা অনেকটাই স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠে। যার প্রভাব পড়ে নারীর পেশা জীবনে। এসময় ব্যতিক্রমী কিছু পেশাতেও নারীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যার মাঝে ফটোগ্রাফি, সাহিত্য চর্চা ও সংবাদিকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীদের মাঝে ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন সরোজিনী ঘোষ, অন্নপূর্ণা দত্ত, চঞ্চল বালা প্রমুখ। এদের মাঝে সরোজিনী ঘোষ ১৮৯৮ সালে ৩২, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে মহিলা আর্ট স্টুডিও নামে ফটোগ্রাফির দোকান খোলেন।[২০] ১৮৭০ সালে নারীদের জন্য পাক্ষিক *বঙ্গ মহিলা* পত্রিকা সম্পাদনের মাধ্যমে মোক্ষদায়িনী দেবী নারীদের জন্য সাংবাদিকতা পেশায় পথপ্রদর্শক হয়ে আছেন।[২১] তবে কলকাতাকে কেন্দ্র করে এ পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে কোন নারী সাংবাদিকের নাম পাওয়া যায় না। ১৯০৬ সালে (১৩১২ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয় ঢাকার প্রথম নারী সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা *ভারত মহিলা*। এটি সম্পাদনা করতেন ব্রাহ্ম নারী সরযুবালা দত্ত।[২২] পরবর্তীতে নারীদের জন্য এ পেশার দ্বার উন্মুক্ত হতে শুরু করে।

উনিশ শতকের আশির দশক থেকে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাকরি ক্ষেত্রেও তাদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। তবে নারী মুক্তির লক্ষ্যে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও নারীর প্রতি বঞ্চনা, বৈষম্য ও অবহেলা অব্যাহত ছিল। মুষ্টিমেয় নারী অবরোধ ভেঙে বাইরে আসতে পারলেও ব্যাপক সংখ্যক নারীই ছিল শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও পশ্চাদপদ। আবার হিন্দু ও ব্রাহ্ম নারীরা ছিল মুসলিমদের থেকে অগ্রসর। তবে এতদ্সত্ত্বেও পেশাজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০১ সালের মেরিডিথ বোর্থ উইকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯০১ সালের কলকাতায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন ৭২৫ জন নারী। তাঁদের মাঝে শিক্ষকতা পেশায় ৫৮৭ জন, প্রশাসন ও পরিদর্শনে ৬ জন, চিকিৎসায় ১২৪ জন, চিত্র গ্রহণে ৪ জন, লেখক সংশ্লিষ্ট সম্পাদক ও সাংবাদিক ৪ জন।[২৩] পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে নারীদের এ আবির্ভাব তৎকালীন সামাজিক শৃঙ্খল মোচনেরই ইঙ্গিত বহন করে। যা পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে এসে নারীর পেশাজীবনকে আরও বিস্তৃত করেছে।

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলায় নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাঙালি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করার পেছনে বিভিন্ন কারণের মাঝে অন্যতম ছিল অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন চট্টগ্রামে এক জনসভায় বলেন, 'পাকিস্তান হাসিল হলে আপনার ছেলে মুন্সেফ হবে, তাঁর ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হবে, উনার ছেলে ডেপুটি হবে, দারোগা হবে'।[২৪] নারীদেরও প্রত্যাশা ছিল নতুন রাষ্ট্রে তাদের জন্য বিভিন্ন খাতে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

হবে। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনামলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গৃহীত আইন এবং নারীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে অনেক নারীই সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। একই সাথে বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবেও তাদের আবির্ভাব ঘটে। যদিও কলকাতা কেন্দ্রিক এবং হিন্দু নারীরা ছিল এর সর্বাধিক সুবিধাভোগী। পূর্ববাংলা সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় এবং মুসলিম পরিবারগুলোতে নারীর পর্দা প্রায় সার্বজনীন থাকায় এখানকার সিংহভাগ নারী তখনও ছিল অবরোধ ও পর্দা প্রথায় বন্দি। এতদসত্ত্বেও পূর্ববাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে উনিশ শতকের শেষে অনেক নারীই চাকরিতে প্রবেশ করেছিল। এরূপ প্রেক্ষাপটে তাদের প্রত্যাশা ছিল নবগঠিত রাষ্ট্রে তাদের কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে। নতুন নতুন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে তারা আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তবতা ছিল নারীর প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন। পাকিস্তান ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটলে মুসলিম লীগে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকা এ শ্রেণিটি রাষ্ট্র সংক্রান্ত জিন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে। এর মধ্যে তারা সামন্তপ্রভু, আমলা ও সামরিক জান্তাকে নিজেদের দলভুক্ত করে তাদের শক্তিকে সংহত করে এবং ধর্মীয় পরিচয় ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর তাদের দাবি আরও বেশি জোরালো হয়। এর দীর্ঘ ৯ বছর পর পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপনের কথা বলা হয় এবং কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থি সকল আইন নিষিদ্ধ করা হয়। খসড়া শাসনতন্ত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চবিংশ ধারায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, মুসলিম নর-নারী যাতে কোরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশাবলি অনুসারে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয় সেজন্য রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে সহায়তা করবে। পাক শাসনতন্ত্রে নারীর অধিকার কতটুকু প্রদান করা হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের মত, 'ইসলামের আদর্শ এবং ভাবধারাকেই রূপদান করা হয়েছে পাক শাসনতন্ত্রে। ইসলামে নারীদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে তার থেকে কোন অংশে কম দেওয়া হয়নি'।[২৫] আবার ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে ১০ বছর শাসন করেন। এসময় তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করতে তিনি উলেমা সম্প্রদায়, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও দল বিশেষত, জামায়াতে ইসলামকে তোষণ করেন। এর ফলে ১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খান যে সংবিধান প্রণয়ন করেন সেখানেও পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বলেই ঘোষণা করা হয়। এ ধরনের ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। যদিও ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে আইনে মুসলিম নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু শরীয়া আইনকে সরকার এমনভাবে প্রয়োগ করে যেখানে নারীরা অনেক বেশি শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আমলে অর্জিত প্রগতির সাথে সাথে নারীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তে

তাদের নতুন করে সামাজিক অজ্ঞতা, অশিক্ষা, পর্দা প্রথার মতো শৃঙ্খলের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শুরুতে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন,

> পাকিস্তান জন্মলাভের অব্যবহিত পরে এই ঢাকা শহরে মেয়েদের চলাচলের কত বাধাবিপত্তি ছিল। পর্দা ছাড়া রিকশায় নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে উঠলেও অবাঞ্ছিত মন্তব্য শুনতে হতো। মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা তখন বেশি ছিল না, কলেজ আরো কম। সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ নিতান্তই সীমিত। স্কুল-শিক্ষিকা বা হাসপাতালের সেবিকার কাজই কেবল তাদের জন্য খোলা, মুসলমান মেয়েদের পক্ষে নার্সিং-এর পেশাও আবার সমাজে অনুমোদন লাভ করত না। রাজনীতিতে দুই একজন ছিলেন, কিন্তু চালকের আসনে কেউ নন। চিকিৎসক খুবই কম, আইনজীবী ছিলেন না বললেই চলে। সাহিত্য ও সংগীতে ছিলেন কয়েকজন, বেতার নাটকেও, কিন্তু মঞ্চে নন, চিত্রশিল্পেও নন।[২৬]

আনিসুজ্জামানের বর্ণনায় রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাদপদ অবস্থার চিত্রই ফুটে ওঠে। একই চিত্র পাওয়া যায় আখতার ইমাম-এর বর্ণনাতেও। নারীদের সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে তিনি তার *আমার জীবন কথা* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> সে যুগ এ যুগ ছিল না, তখন এমএ পাস মহিলা কজনই বা ছিল। যারা ছিল তাদের মধ্যে চাকরি করার মানসিকতাই বা কতজনের ছিল সে কথা এযুগে হয়তো ভাবতে চাইবে না কেউ। এ যুগে এমএ পাস মেয়েরা চাকরি পায় না আর সে যুগে চাকরি থাকলেও উপযুক্ত মহিলা পাওয়া যেতো না। আবার উপযুক্ত মহিলা থাকলেও এগিয়ে আসতো না।[২৭]

তবে রাষ্ট্রের শুরুতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাদপদ অবস্থা থাকলেও ষাটের দশকে এসে সেখানে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সময় পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে যা নারীর জীবনকে প্রভাবিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে সমানতালে চলতে থাকে নগরায়ন, পাশ্চাত্যায়ন, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া যা পূর্ব বাংলায় একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের পথকে সহজ করে।[২৮] এসময় শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। এ শিক্ষিত শ্রেণি নারীর মানবাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাদের মাঝে নারীর প্রতি একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। ফলে এ সময় নারীরা যেমন বিশ্ববিদ্যায়ে অধিকহারে প্রবেশ করতে শুরু করে, তেমনি চিকিৎসা বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যাসহ বিভিন্ন পেশাগত বিদ্যায় পড়ার সুযোগ পায়। ১৯৬৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত বুয়েটে নারীরা পড়তে পারতো না। কিন্তু ১৯৬৪ সালে তিনজন সাহসী নারী দোরা রহমান, মনোয়ারা ও চুমকি বুয়েটে পড়তে না পারার কারণে কোর্টে মামলা করেন। মামলায় জয়ী হয়ে প্রথম নারী শিক্ষার্থী হিসেবে তারা বুয়েটে পড়ার সুযোগ পান। সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ডোরা রহমান বলেন, 'পুরো শহর তথা দেশে শোরগোল পড়ে যায়। মেয়েরাও প্রকৌশলে পড়ালেখা করছে। অনেক দূর-দূরান্ত থেকেও লোকজন আসতে শুরু করে আমাদের এক নজর দেখতে।[২৯] এভাবে নারীরা শিক্ষা লাভ করে চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশের একটি অনুকূল পরিবেশ পায়। তারা সরকারি চাকরিসহ নানাবিধ পেশায় যোগদান করতে শুরু করে। দেখা যায় ১৯৫১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৫৮,৪৩৯ জন ১৯৬১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে

১,২৫,০৫,৬৮৬ জনে উন্নীত হয়।[৩০] যদিও এ স্বাবলম্বী নারীদের মধ্যে নিম্নবিত্ত নারীরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। তবে ধীরে ধীরে বিচিত্র পেশার দ্বার নারীদের জন্য প্রসারিত হতে থাকে।[৩১]

পূর্ব বাংলায় নারীর পেশা জীবনের রূপান্তর

ষাটের দশকে নারী শিক্ষার প্রসার হওয়ায় নারীদের মাঝে চাকরি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পেশাজীবী নারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি চিকিৎসা, প্রকৌশল, ব্যবসা প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে পেশাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের কারণে এ সময় নারীদের মাঝে পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আসে। নারীদের অংশগ্রহণের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

নারীবান্ধব পেশা: নারীরা শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হলেও অনেকাংশেই পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা নেই। এ ক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিগত আবেগ, দক্ষতা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পায় না। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও প্রচলিত সমাজকাঠামোর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নারীর জন্য গ্রহণযোগ্য পেশা। ফলে নারীর জন্য নির্ধারণ করা হয় এমন সব পেশা, যেগুলোকে এক পর্যায়ে আখ্যায়িত করা হয় নারীর পেশা হিসেবে। এছাড়া আরও ধারণা করা হয় প্রাকৃতিক কারণেই নারী-পুরুষের শারীরিক গড়ন ভিন্ন হওয়ায় আরামদায়ক পেশাই নারীদের জন্য উপযুক্ত। ফলে নারীকে বেঁধে দেওয়া হয় এমন কিছু কাজ, যে কাজগুলো সেবামূলক এবং এগুলোর পাশাপাশি সচল থাকে পারিবারিক দায়িত্ব পালন। পাকিস্তান রাষ্ট্রেও নারীর পেশা নির্বাচনে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এসময় শিক্ষকতা, চিকিৎসা এবং নার্সিং পেশাতেই নারীর সর্বাধিক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষকতা পেশা: পাকিস্তান আমলে সরকারি বিভিন্ন নীতির কারণে শিক্ষকতা পেশায় নারীদের চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। এ সময় সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় যে সব কমিশন গঠন করে তার প্রতিটিই 'অভিভাবকগণ ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে পড়া লেখায় আগ্রহী নয়' এই যুক্তিতে নারী শিক্ষা বিস্তারে নারীদের জন্য আলাদা স্কুল বা কলেজ গঠনের পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ইতোমধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সেখানে নারী শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে শিক্ষক হিসেবে নারীদের চাকরি লাভের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭-১৯৭০ সময়কালে পূর্ববাংলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষকের অংশগ্রহণের হার লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ সময়কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২৯২১ জন (৩.১২%) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছিল ৯৪৪ জন (২.১৮%)। পরবর্তীতে ১৯৭০-৭১ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রাথমিকে ৩৫৬৫ জন এবং মাধ্যমিকে ৩৬৪৫ জন (২.৮৫%)। অর্থাৎ পেশা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নারীরা শিক্ষকতা পেশাকেই প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নিয়েছিল।[৩২]

তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারীরা অধিকহারে যোগদান করলেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পূর্ববাংলায় প্রথম নারী শিক্ষক ছিলেন করুণাকণা গুপ্তা। ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস বিভাগে সহকারী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ বিশ বছর পরেও এ সংখ্যা ছিল নগণ্য। এ সম্পর্কে আখতার ইমাম বলেন, 'আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পড়াইতে যাই তখন (১৯৫৩ সালে) মাত্র তিনজন মহিলা শিক্ষিকা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মাঝে ছিলেন আরবি ও ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের ড.সৈয়দ ফাতেমা সাদেক, বাংলা বিভাগের ড. নীলিমা ইব্রাহিম, অর্থনীতি বিভাগের মিসেস কুলসুম হুদা'।[৩৩] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ড. নীলিমা ইব্রাহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন ১৯৫৬ সনে।

চিকিৎসা পেশা: শিক্ষকতার পর নারীদের সর্বাধিক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় চিকিৎসা পেশায়। ১৮৭৫ সালের ১ জুলাই ঢাকা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ১৮৯৫ সালে ৬ জন নারী প্রথম ভর্তি হয়। যদিও প্রথমদিকের ছাত্রীদের বেশিরভাগই ছিল ইংরেজ কর্মকর্তাদের কন্যা ও স্ত্রী।[৩৪] পাসকরা ছাত্রীদের অনেকেই সরকারের জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারিতে চাকরি নিয়ে সমাজে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।[৩৫] ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়। এ সময় থেকে মেডিকেল কলেজে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৫ জন, পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে ৫০ জন এবং ১৯৬৯-৭০ শিক্ষাবর্ষে ৫৪ জন।[৩৬]

ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৯৪০-৫০ দশক পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোন সিনিয়র নারী শিক্ষক ছিলেন না। পরবর্তীতে ডাক্তার অঞ্জলি মুখার্জী রেজিস্ট্রার এবং ডাক্তার বিমলা ভট্টাচার্য রেসিডেন্ট সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কোনো বিভাগীয় নারী ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন না। এসময় নারী চিকিৎসকের উপস্থিতিও ছিল কম। মাত্র তিনজন নারী চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়, ডা. মিস এইচ সাঈদা, ডা. মিসেস হামিদা মালিক (৬/১/১৯৪৯), ডা.জোহরা বেগম কাজী[৩৭] (২৪/১/১৯৪৯)।[৩৮] এরপর পাস করা ছাত্রীদের মাঝে অনেকেই মেডিকেল কলেজ থেকে পড়ালেখা শেষ করে চিকিৎসা পেশাকেই বেছে নেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় যেমন অ্যানাসথিসিওলজি, ফিজিওলজি, রেডিওলজি, নফ্রোলজি, সাইক্রিয়াটিক ইত্যাদি এ সময় নারী চিকিৎসকদের পছন্দের তালিকায় ছিল। তবে নারীদের পছন্দের শীর্ষে ছিল গাইনোকোলজি বা স্ত্রী রোগ ও প্রসূতিবিদ্যা। সমাজে এর চাহিদাও ছিল বেশি। কারণ নারী রোগীরা পুরুষ স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা নারী চিকিৎসকের কাছেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তৎকালীন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন উত্তরকালে জাতীয় অধ্যাপক শাহেলা খাতুন, ডা. সৈয়দা ফিরোজা বেগম। এছাড়া ছিলেন ডা. মালেকা খাতুন (শিশু বিশেষজ্ঞ), অধ্যাপক আফজালুন্নেসা (অ্যানাসথিসিয়া বিশেষজ্ঞ), অধ্যাপক ডা. সুলতানা জাহান (সহকারী সার্জন), ডা. মাসুমা নার্গিস (মেডিসিন বিশেষজ্ঞ), অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার (শিশু বিশেষজ্ঞ), ডা. কাজী মিসবাহুল নাহার তামান্না প্রমুখ।[৩৯] এ সময় চিকিৎসা শাস্ত্রে নারীরা উচ্চতর ডিগ্রীও অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে

পূর্ববাংলায় প্রথম নারী হিসেবে এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন ডা. হাজেরা মাহতাব। তিনি ছিলেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।[৪০] পূর্ববাংলায় ৬০-এ দশকে নিবন্ধিত নারী মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নিশ্চিত করে যে চিকিৎসা পেশায় নারীদের আগ্রহ এবং অংশগ্রহণ দুটিই বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের সারণি থেকে যা সহজেই অনুধাবন করা যায়–

সারণি: পূর্ব পাকিস্তানে নিবন্ধিত চিকিৎসকদের অবস্থান

বছর	এফ.আর.সি.এস		এম.বি.বি.এস		এল.এম.এফ		মোট	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১৯৬৪	২০	নাই	১৭১৩	৪২	৪৪৪৯	১৭০	৬১৮২	২১২
১৯৬৭	২৪	নাই	৩৩৫৯	২০৩	৬৪৬৫	৩১১	৯৮৫২	৫১৪

উৎস: Registar, Medical Council, Dacca Branch

নার্সিং পেশা: নার্সিং পেশায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ ছিল। যদিও মুসলমান মেয়েদের জন্য নার্সিং পেশাকে সমাজে ভালোভাবে দেখা হতো না। তবে সরকার নার্সিং পেশায় নারীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। ১৯৪৯ সালে বিদেশে নার্সিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য দপ্তর ৩০ জন ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করে যার মধ্যে ১১ জন ছিলেন পূর্ববাংলার।[৪১] নার্সিং বিদ্যাকে নারীদের জন্য আরও বেশি সহজ ও গ্রহণযোগ্য করতে বাংলা ভাষায় নার্সিং শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্ববঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভায় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতদ্‌সংক্রান্ত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য কয়েকজন ডাক্তার, প্রচার বিভাগের লোক এবং সাহিত্যিককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলগুলিতে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ও সভায় অনুমোদিত হয়।[৪২] সরকারের এ সকল প্রচেষ্টার কারণে ধীরে ধীরে নার্সিং পেশায় নারীদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ সময় পূর্ববাংলায় নার্সিং ও ধাত্রী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন ২,৯৪৬ জন নারী।[৪৩] তবে এটিও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কারণ সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত সংবাদে নার্স সংকটের চিত্রই ফুটে ওঠে। সংবাদগুলোতে এ সম্পর্কিত উদ্বেগও প্রকাশ পায়। ১৯৬৮ সালে *পাকিস্তানী খবর* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের বিভিন্ন নার্সিং বিদ্যালয়ে বছরে প্রায় ১৩৫০ জন নার্সের প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকলেও এ পর্যন্ত বছরে প্রশিক্ষণের জন্য ৩৫০ জনের বেশি নার্স যোগ দেয়নি। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান নার্সিং সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় ভিত্তিতে সংগ্রহ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে।[৪৪] তবে সরকারের নানামুখী প্রচেষ্টা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কারণে ধীরে ধীরে নার্সিং পেশায় নারীর আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে।

চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারী

সাংবাদিকতা পেশা: সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে যেমন চ্যালেঞ্জিং তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে নারী সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪৯ সালে ঢাকা থেকে পূর্ব বাংলায় প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক *সুলতানা* প্রকাশিত হয় সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজুর সম্পাদনায়।[৪৫] ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় অপর পত্রিকা *নওবাহার*। কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দত্তের সম্পাদনায় ১৯৫০ সালে পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক *মানসী* পত্রিকা। ১৯৫০ সালে ঢাকা থেকে সচিত্র সাপ্তাহিক *বেগম* প্রকাশিত হয়। *বেগম* পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় পেশাগতভাবে নারীর প্রবেশ অনেকটা নিশ্চিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে অনেক নারী সাংবাদকর্মীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথমে *বেগমের* সম্পাদক ছিলেন সুফিয়া কামাল, পরে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন নূরজাহান বেগম। ১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে জাহানারা ইমামের সম্পাদনায় মাসিক *খাওয়াতীন* প্রকাশিত হয়। এর সহ-সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন। এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল 'অজ্ঞ সমাজের নারীদের চোখে জ্ঞানের আলো জ্বালানো'।[৪৬] এছাড়া নারীদের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে ছিল আজিজা বেগমের *মালঞ্চ*, আয়েশা আমিনের *গৃহশ্রী*, বেগম আয়েশা সরদার সম্পাদিত *শতদল*, কামরুন্নাহার লাইলীর *অবরুদ্ধা*, ফেরদৌসী বেগমের *আঁচল*, সেলিনা পারভীনের *শিলালিপি*, লায়লা সামাদের *অনন্যা* ইত্যাদি।[৪৭] এদের মাঝে লায়লা সামাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।[৪৮] ষাটের দশকে এসে সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়তে থাকে। এ সময় হাসিনা আশরাফ, সেতারা মূসা, তাহমিদা সাঈদ এবং সত্তরের দশকে বেবী মওদুদ, নাসিমুন আরা, রওশন আরা প্রমুখ ঢাকায় দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন পদে পেশাগত জীবন শুরু করেন। *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় বার্তা বিভাগের শাখা প্রধান হিসেবে নাসিমুন নাহার পুরুষের পাশাপাশি রাতের শিফটেও দায়িত্ব পালন করতেন।[৪৯]

শুরুতে নারীরা সংবাদপত্র সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও ধীরে ধীরে সাংবাদিকতার অন্যান্য শাখায় তাদের পদচারণা ঘটে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক পত্রিকা *সিনেমা*। ১৯৫২ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এখানেও নারীরা বিশেষ ভূমিকা রাখেন। *সিনেমা* পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন জেব-উন-নেসা খানম।[৫০] এ সময় প্রেসে কম্পোজিটারের চাকরিতেও নারীদের দেখা যায়। সুব্রতা ভট্টাচার্য প্রথম নারী যিনি প্রেসে কম্পোজিটার হিসেবে চাকরি নেন।[৫১]

আলোকচিত্রী বা পত্রিকার প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবেও এ সময় নারীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সাইদা খানম ১৯৫০ এর দশক থেকে সাপ্তাহিক *বেগম*, *চিত্রালী* এবং *অনন্যা* পত্রিকায় আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ করে অগ্রণী হয়ে আছেন। শুধু পূর্ব বাংলায় নয় পুরো পাকিস্তানেই তিনি প্রথম নারী আলোকচিত্রী। তাঁর তোলা আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে ২টি জাপানি পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের তিনটি ছবিতে আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ

করেছেন তিনি। অপর আলোকচিত্রী শিরিন সুলতানা সাপ্তাহিক *সচিত্র সন্ধানী* থেকে শুরু করে পরে *দৈনিক মিল্লাত* পত্রিকাতেও কাজ করেছেন।

তবে চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীর এ অগ্রযাত্রার পথ কখনই মসৃণ ছিল না। কর্মক্ষেত্রে তাদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পেশাজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাইদা খানম বলেন,

> আমি যখন ছবি তুলতে আরম্ভ করি তখন সমাজ ছিল ঘোর অন্ধকার, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ঢাকাতে মেয়েরা বের হতো না। ঘোড়ার গাড়িতে দরজা বন্ধ করে মেয়েরা স্কুল কলেজে যাতায়াত করতো। খুব কম মেয়ে পথে চলাফেরা করতো। বিশেষ করে যখন পথে ছবি তুলতে বের হতাম তখন ঢিল খেয়েছি, লোকের বাজে মন্তব্য শুনেছি। চলাফেরার মাঝে এমন কোনো পোশাক পরতাম না বা আচরণ করতাম না যাতে লোকে সমালোচনা করতে পারে। সব সময় শাড়িই পড়তাম। পর্দা মানতাম না তবে পোশাকে সংযত থাকতাম লোকের বিদ্রুপের ভয়ে। ক্যামেরাটা না ঝুলিয়ে ব্যাগে রাখতাম যাতে লোকের দৃষ্টি এড়ানো যায়। স্পটে গিয়ে ক্যামেরা বের করতাম।[৫২]

বলা যায় সাইদা খানম নানা সামাজিক পশ্চাদপদতাকে মোকাবিলা করে এ পেশায় নারীদের পথ প্রশস্ত করেছেন।

বেতার ও টেলিভিশনে কর্মসংস্থান: বেতার কেন্দ্র ও টেলিভিশন নারীর জন্য সংস্কৃতি চর্চা ছাড়াও পেশাগতভাবে অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রযোজনা, প্রশাসন, প্রকৌশল, চিত্রগ্রহণ, আলোক নিয়ন্ত্রণ, শিল্প নির্দেশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ঢাকা বেতারের প্রথম নারী অনুষ্ঠান সহকারী নূরজাহান মুরশিদ। তিনি ১৯৪৭ সালের পরে কলকাতা বেতার থেকে ঢাকা বেতারে যোগ দেন। তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান নারী বেতার কর্মকর্তা। এছাড়া বিভিন্ন পদে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করেন বেশ কয়েকজন নারী। এঁদের মধ্যে পঞ্চাশের দশকে মিসেস খায়ের প্রকৌশল সুপারভাইজার হিসেবে বেতারে যোগ দেন। কর্মকর্তা হিসেবে প্রথম দিলারা হাশেম, জোহরা হক, মেহেরুন্নেসা যোগ দিয়েছিলেন। পরে যোগদান করেন হাসিনা রহমান ও সুফিয়া বেগম। দিলারা হাশেম পরে ভয়েস অব আমেরিকায় যোগ দেন। হাসিনা রহমান ও সুফিয়া খানম পদোন্নতি পেয়ে পরিচালক হয়েছিলেন। এছাড়া জে জে হামিদ খানম, নূর-ই-গুলশান হাবিব, বেগম ইসমত আরা, বেগম রওশন আরা চৌধুরী ঊর্ধ্বতন পদ থেকে অবসরে গেছেন। ১৯৭০ সাল নাগাদ বেতারে নিজস্ব নারী শিল্পী ছিল প্রায় ৭০ জন, এঁদের কেউ প্রযোজনা, কেউ নাট্যশিল্পী, কেউ প্রযোজনা সহকারী, কেউ অনুষ্ঠান সহযোগী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৫৩] বেতারে চাকরি করা অবশ্য নারীদের জন্য নির্বিঘ্ন ছিল না। কারণ নারী শিল্পীদের রক্ষণশীল সমাজে বিভিন্নভাবে সমালোচিত হতে হতো। সেই ভয়ে নারীরা বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে যোগদানেও আগ্রহী হতেন না।

বেতারের পাশাপাশি ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় টেলিভিশন চালুর পর ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে টেলিভিশন চালুর পূর্বেই কাজী মদিনা এর প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে টিভির প্রশাসন বিভাগে তিনি যোগ দেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন।[৫৪] এছাড়া ঢাকা টিভির অগ্রণী নারী

প্রযোজক ছিলেন খালেদা ফাহমী। ১৯৬৬ সালে তিনি টিভিতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠান পরিচালক ও মহাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৫৫]

কর্পোরেট খাতঃ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু একই সময় পূর্ব পাকিস্তানে ধীরগতিতে কর্পোরেট খাতের অনুপ্রবেশ ঘটলেও পরিচালনা ও প্রশাসনিক পদগুলো নির্দিষ্ট থাকত পশ্চিম পাকিস্তানি পুরুষদের জন্য। কর্পোরেট জগতে সর্বপ্রথম নারীর অন্তর্ভুক্তি ঘটে ব্যাংকিং সেক্টরে। ১৯৬৬ সালে মিসেস আনোয়ারা বেগম প্রথম নারী যিনি শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের ডিরেক্টর নির্বাচিত হন।[৫৬] এসময় বিভিন্ন ব্যাংকের মহিলা শাখা খোলা হয় যেখানে নারীরা দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সালে ইস্টার্ন ব্যাংক মহিলা শাখার উদ্বোধন করে যেখানে নারীরা অধিকহারে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।[৫৭] এ পেশায় নারীদের উৎসাহিত করতে সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় লেখা হয়,

> এতদিন ব্যাংকিং পেশা প্রধানত পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ...আমাদের মহিলারা এখন এ পেশার জন্য তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। তারা আরও প্রমাণ করেছে যে, তাঁরা ব্যাংকের আইন ও নিয়ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বৈদেশিক মুদ্রা ও অগ্রিম দান বিভাগে দক্ষতার সাথে কাজ করে প্রমাণ করেছে যে, তারা দক্ষতার দিক থেকে পুরুষের পেছনে নেই।[৫৮]

এছাড়াও কর্পোরেট জগতে সর্বাপেক্ষা সফলতার স্বাক্ষর রাখেন রোজী লতীফ। তিনি পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড-এর ঢাকাস্থ শাখা পূর্ব পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। পূর্ব বাংলার ফরিদপুরে তার জন্ম। এ সংস্থার তিনিই প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর।[৫৯]

সরকারি ও প্রশাসনিক চাকরিঃ নানা বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও পাকিস্তান শাসনামলে সরকারি চাকরিতেই নারীদের সর্বাধিক অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৪৭ পরবর্তী সময় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ৩টি স্তরে বিন্যস্ত ছিল। সুপিরিয়র সার্ভিসেস যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় সার্ভিস, প্রাদেশিক সার্ভিস, অধস্তন সার্ভিস। চতুর্থ একটি সার্ভিস ছিল যার অন্তর্ভুক্তদেরকে সার্ভিস হোল্ডার না বলে সরকারের বিশেষ প্রয়োজনে নিযুক্ত বা পদভূষিত কর্মাধ্যক্ষ বলাই সংগত (Officers holding special posts)।[৬০] যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক সার্ভিস যেমন– সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) এবং পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান-এ (পিএসপি) নারীদের যোগদানের অযোগ্য বিবেচনা করা হতো। তবে নিম্নস্তরের চাকুরিসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে বিশেষত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের মতো পেশাদারি চাকরিতে নারীদের বর্ধিত হারে নিয়োগদান করা হয়েছিল। সেলিনা রইসউদ্দীন ১৯৪৯ সালে সিএসপি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েও সিভিল বা ফরেন সার্ভিসে নারীদের নিয়োগের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পাকিস্তানের অডিট সার্ভিসে অ্যাসিস্টেন্ট একাউন্ট জেনারেল পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এ নীতির বিরুদ্ধে ১৯৪৯ সালে সেলিনা রইস উদ্দীনের উদ্যোগে নারীরা আন্দোলন শুরু করলে সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের নারীদের সিএসপি পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করলেও পূর্ববাংলায় নারীদের সে সুযোগ প্রদান করা হয়নি।[৬১] Officers holding special posts-এ এসময় পূর্ব ও পশ্চিম

পাকিস্তানে নারীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বেগম রানা লিয়াকত আলী খান ১৯৫৪ সালে প্রথম নারী রাষ্ট্রদূত-এর দায়িত্ব পান। ১৯৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি নারী কানিজ ফাতেমা ট্রেড ইউনিয়নের (ডক শ্রমিক) প্রধান নির্বাচিত হন।[৬২] পূর্ববাংলায় নারীদের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। বেগম সাদেকা সামাদ প্রদেশের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৬৩] তিনি ছাড়াও ১৯৬৪ সালে এ বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন মিসেস বীটা।[৬৪] এ ধরনের অনারারি বা সম্মানসূচক দায়িত্ব হিসেবে নারীদের জেলা পরিদর্শক হিসেবেও দেখা যায়। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার বেসরকারি জেলা পরিদর্শক হিসেবে বারোজন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়োগ করেন। তার মাঝে ছিলেন ৪ জন নারী বেগম সুফিয়া কামাল, বি এম নাসির, তাহেরা কবির এবং নূরজাহান বেগম।[৬৫] যদিও এসময় পাকিস্তানে নারী প্রগতির সূচনা হয় কিন্তু শিক্ষা এবং চিকিৎসা পেশা ব্যতীত বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসনে নারী সদস্যের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ফলে প্রশাসনে সহকারী সচিব থেকে সচিব পদাধিকারী কোন নারী ছিল না। ৬০-এর দশকে এসে নিম্নস্তরে কিছু নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আইনজীবী, বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মাত্র ১১ জন নারী। সরকারি পাবলিক সার্ভিস অফিসার (কর্মকর্তা) হিসেবে ছিলেন ২০ জন নারী। তবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে পরিদর্শক হিসেবে ৭৪১ জন নারী ছিলেন।[৬৬] অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণিতে নারীর সংখ্যা বেশি হলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলোতে বাঙালি নারীর প্রবেশাধিকারই ছিল না।

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পেশা: নারীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করার ফলে তাদের মাঝে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে। যার প্রভাব নারীর পেশা জীবনেও পড়ে। এ সময় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পেশায় বিশেষত ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা হিসেবে নারীকে দেখা যায়। যদিও সংখ্যায় ছিল খুবই কম। কারণ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি পায় যা যে কোনো উদ্যোক্তার জন্যে প্রণোদনাস্বরূপ কাজ করে। কিন্তু মুসলিম নারীর জন্য দেশভাগ পরবর্তী অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট অনুকূল ছিল না। Hanna Papanek পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবসা ও শিল্প উদ্যোক্তাদের ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখান, ৮৬টি কেস স্টাডির মধ্যে একজন নারীকেও কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বা পরিচালক হিসেবে পাওয়া যায়নি। যদিও কিছু নারী কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন, তারা পারিবারিক সূত্রে এ দায়িত্ব পান, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিল পুরুষ সদস্যের একাধিপত্য।[৬৭] এতদ্সত্ত্বেও কিছু সাহসী নারী এসময় অপ্রচলিত সেক্টরে ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর মাঝে ঢাকার প্রথম নারী উদ্যোক্তা হিসেবে মিসেস জোহরা খানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একক ভাবে একটি আধুনিক ছাপাখানা স্থাপন করেন যা আরো বৃহত্তর আকারে পরবর্তী সময়ে হাটখোলায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তী নারী উদ্যোক্তা হলেন আনোয়ারা বেগম; তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকার গুলিস্তানে করিম ড্রাগ হাউস নামে একটি ঔষধের দোকান স্থাপন করেন। পঞ্চাশের দশকে এটি ঢাকার বিখ্যাত ঔষধের দোকান হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৫৮ সালে তিনি বিদেশে ঔষধ

আমদানি রপ্তানির অধিকার লাভ করেন। এরপর ১৯৬০ সালে একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করে নিজেই ঔষধ তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। এভাবে ব্যবসা ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন এই ল্যাবোরেটরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। পরবর্তীতে তিনি ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৬৮] পূর্ব পাকিস্তানের মেহের ইন্ডাস্ট্রিজের ডিরেক্টর বেগম এম ই খান পাকিস্তানের প্রথম শিল্পপতি নারী। তিনি পাকিস্তানে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন।[৬৯] পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লিলি খান স্থাপিত লিরা ইন্ডাস্ট্রিজ ঢাকার অন্যতম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত ছিল। লিরা ইন্ডাস্ট্রিজ দেশের নির্মাণ শিল্পে প্রথম পিভিসি পাইপ ব্যবহারের প্রচলন করে।[৭০] ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা হিসেবে বুটিক স্থাপন নারী উদ্যোক্তাদের কাছে সবসময়ই জনপ্রিয় ছিল এবং সে-ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। খুরশীদ আলম ও শীলু আবেদ ১৯৬২ সালে ধানমন্ডির ৬নং রোডে *জয়া* নামে প্রথম বুটিক ও ফ্যাশান হাউজ স্থাপন করেন যা পরে তৎকালীন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে স্থানান্তরিত হয়। এছাড়া ঢাকায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৫ সালে আনোয়ারা কবির Little Jewels Nursery School প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সম্ভবত ঢাকার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল।[৭১] এভাবে সীমিত পরিসরে হলেও নারীরা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিল।

এ সময় প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী সংগঠনগুলো নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে নানা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এর মাঝে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির প্রায় প্রতিটি শাখা অফিস একটি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। যেখানে নারীদের সেলাই, উল বুনন, মেশিনের কাজ, বেতের কাজ, নল ও নারকেলের ছোবড়ার মাদুর তৈরি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো।[৭২] আজিমপুর লেডিজ ক্লাব বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় নারীদের সূচিশিল্প, টাইপরাইটিং, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা করে। কুমিল্লায় অবস্থিত পল্লীউন্নয়ন একাডেমি দরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই, রান্না, বাগান করা, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এ ধরনের কাজ পরিচালনার জন্য পল্লীকর্মী নামে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী শ্রেণি তৈরি করে। তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার তেজগাঁও-এ আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।[৭৩] পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) একই ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এখানে প্রশিক্ষিত নারীরা পরবর্তীতে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন, নার্সারি, ফল ও সবজি চাষ, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত হয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার চেষ্টা করে। এর মাঝে অনেক নারী ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্যের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কিন্তু সফল উদ্যোক্তা হতে শুরু করে। বিভিন্ন নারী সংগঠন আবার নারীদের তৈরি এসব দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করে। ঢাকা লেডিজ ক্লাব এক মীনা বাজারের আয়োজন করে যেখানে ২০টি দোকান খোলা হয়। এখানে নারীদের তৈরি বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য, সূচিশিল্প, পোশাক-পরিচ্ছদ বিক্রি করা হয়।[৭৪] এসকল প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা নারী তৈরি হয়েছিল।

আলোচনার উপসংহারে এসে বলা যায়, নারীর কর্মসংস্থান ও পেশার বৈচিত্র্য পাকিস্তান সময়ে এসে প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে ষাটের দশকে এসে পূর্ব বাংলায় যে নারী প্রগতির বিকাশ ঘটে তার সাথে যুক্ত হয় পূর্ববাংলার নগরায়ন ও শিল্পায়ন। এর ফলে নানা পেশায় প্রবেশের মাধ্যমে একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে নারীর আবির্ভাব ঘটে। প্রথমদিকে শিক্ষকতা এবং চিকিৎসা পেশায় নারীর অধিক অংশগ্রহণ থাকলেও ধীরে ধীরে নানা চ্যালেঞ্জিং পেশাকেও নারীরা গ্রহণ করতে শুরু করে। তবে সমসাময়িক নারীদের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন আলোচনার আলোকে দেখা যায়, নারীর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেলেও নারীর জন্য কর্মবান্ধব পরিবেশের অভাব এবং পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। ঢাকায় কর্মজীবী নারীদের ওপর ১৯৬৬ সালে এক জরিপ পরিচালনা করা হয়। কর্মক্ষেত্রে নারীরা কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন? এ প্রশ্নের মাধ্যমে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয় তা হলো–

(১) কর্মজীবী নারীদের বিশেষ করে অবিবাহিতদের প্রতি সমাজের মনোভাব ইতিবাচক নয়। অনেক ক্ষেত্রে একই অফিসে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে চাকরি করা নারীদের বিয়ের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
(২) পারিবারিক দিক থেকেও নারীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন, গৃহরক্ষা ও অফিস করা একসঙ্গে দুটো চালাতে কিছুটা অসুবিধা হয়। বিশেষ করে যাদের সন্তান ছোট ছিল।
(৩) এছাড়া ছিল বাসস্থান সংকট, পরিবহন সংকট বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে নারীরা একা চলতে অনিরাপদ বোধ করতেন।[৭৫]

তবু বলতেই হয়, পেশাজীবী নারীদের সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান। ধীরে ধীরে পেশাজীবী নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজেদেরকে একটি আলাদা শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় পেশাজীবী নারীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান বিজনেস এন্ড প্রফেসনাল উইমেন্স ক্লাবের আদলে পূর্ববাংলাতে গড়ে ওঠে বিজনেস এ্যান্ড ক্যারিয়ার ওম্যানস ক্লাব। পেশাজীবী নারীদের একত্রীকরণ এবং তাদের সমস্যা পর্যালোচনা করে তার সমাধানের ব্যবস্থা করাই ছিল এ ক্লাবের উদ্দেশ্য।[৭৬] এ সময় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নূরজাহান বেগম চাকরিজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব করেন। পরে ঢাকার নিউ বেইলী রোডে একটি হোস্টেল স্থাপন করা হয়।[৭৭] যা ছিল পেশাজীবী নারীদের জন্য একটি বড় অর্জন।

এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিচিত্র পেশায় নারীর অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে একটি পেশাজীবী শ্রেণি হিসেবে সমাজে নারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডল যদি নারীর প্রতি আরও উদার ও মানবিক হতো তাহলে বিচিত্র পেশায় নারীর অংশগ্রহণের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতো। তবে নারীর এ অংশগ্রহণ সংখ্যাগত দিক থেকে বিবেচনা না করে নারীর প্রতি একটি ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সেলিনা হোসেন (সম্পা.), *জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ*, ২য় খণ্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৭৩

২. উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষা, নারীর কর্মক্ষেত্র, সর্বোপরি উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০২৩।

৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। ১৭৯৩ সালের লর্ড কর্নওয়ালিস এটি প্রবর্তন করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের জমির ওপর স্থায়ী মালিকানা দেওয়া হয়। ফলে জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয় এবং তারা পরিণত হয় সরকারের অনুগত এক ধনিক শ্রেণিতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মুনতাসির মামুন (সম্পা.), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৫

৪. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৫৮-৮০

৫. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

৬. A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856*, Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1961, p. 46

৭. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

৮. পীযুষ কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *উচ্চ শিক্ষায় বাঙলার নারী সামাজিক প্রেক্ষাপট ১৮৭৯-১০৪০*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৫০

৯. বিস্তারিত: গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.২১৬-১৭

১০. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন (১৮৭৬-১৯৩৯)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১০৯

১১. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৩

১২. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, নওরোজ কিতাবস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৩৫

১৩. রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা*, আগামী প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ. ১২২, ১৩৫-১৪০

১৪. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৩৯-৪০*, পৃ. ১৬৭

১৫. আঠারো শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙালি নারীর অবরোধের যুগ হতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত তার আর্থ-সামাজিক জীবন ও সংগ্রামের ইতিহাস, নারী শিক্ষা, নারীর কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি ও আন্দোলন সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৪

১৬. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৩

১৭. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৯

১৮. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৯

১৯. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৯

২০. সিদ্ধার্থ ঘোষ, *ছবি তোলা বাঙালির ফটোগ্রাফি চর্চা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.৯৫

২১. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৩

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গ নারী*, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯

২৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড*, কলকাতা, দ্বি-সং, ১৯৭৫, পৃ. ৩২৯-৩০

২৪. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ১০

২৫. *মাসিক মাহে নও*, এপ্রিল ১৯৫৬, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ.২৬

২৬. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭-১৪ মে, ২০২০) ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, লেখক ও জাতীয় অধ্যাপক। তিনি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও ১৯৫৭ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, মুনীর চৌধুরী, স্বরূপের সন্ধানে, আঠারো

শতকের বাংলা চিঠি, *পুরানো বাংলা গদ্য*, *মোতাহার হোসেন চৌধুরী*, *আমার একাত্তর*, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, *আমার চোখ*, *কালনিরবধি*, *বিপুলা পৃথিবী* ইত্যাদি। আনিসুজ্জামান, *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬১

২৭. আখতার ইমাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী নিবাস *উইমেন্স হল* (পরবর্তীতে রোকেয়া হল)-এর প্রথম স্থায়ী প্রভোস্ট, দর্শন বিভাগের প্রথম নারী শিক্ষক এবং প্রথম নারী বিভাগীয় প্রধান। আখতার ইমাম, *আমার জীবন কথা*, মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.), প্রকাশক: আখতার ইমাম, ২০০২, পৃ. ৩৪

২৮. পূর্ববাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ও নারী জাগরণ সম্পর্কিত বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: কামরুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, ঢাকা, পৃ. ১৫৭

২৯. *পাক্ষিক অনন্যা*, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৯, সাক্ষাৎকার গ্রহণ– মামুনুর রশিদ রাজিব।

৩০. *Pakistan Statistical Year Book, 1965 and 1966*, East Pakistan Bureau of Statistics, Dhaka.

৩১. পেশাগত বৈচিত্র্যে দেখা যায়, প্রযুক্তিগত পেশা (স্থপতি, জরিপকারী, রসায়নবিদ ও ভৌত বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, নার্স, আইনজীবী প্রমুখ)-এর সাথে সম্পর্কিত নারীদের সংখ্যা ছিল ৮২২১ জন; ম্যানেজারিয়েল, প্রশাসনিক এবং কেরানি সংশ্লিষ্ট পেশায় ছিলেন ৯৪৬ জন; বিক্রয় সম্পর্কিত (খুচরা ব্যবসায়ী, ব্যবস্থাপক, বিমা এজেন্ট, বিক্রয়কর্মী, দোকান সহকারী প্রমুখ) পেশায় ছিলেন ১৮৬৮২ জন নারী। *Census of Pakistan 1961,* Vol. 5, East Pakistan Ministry of Home and Kashmir Affairs, Home Affairs Division, Govt. of Pakistan, Table 2, pp. 18-22

৩২. Government of East Pakistan, A Hand Book of Comparative Statistics of East and West Pakistan, pp. 219-220 (Dacca, Planning Department, Ministry of Planning, 1988)

৩৩. আখতার ইমাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪

৩৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৮৫৮-১৯৪৭)*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩০৫-৩০৭

৩৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন- শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২-৩১৫

৩৬. Alumni Directory, Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, p. 24

৩৭. অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম নারী চিকিৎসক। ১৯৩৫ সালে প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে তিনি এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা মেডকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনোকোলজি বিভাগের প্রধান ও অনারারি প্রফেসর ছিলেন। এছাড়া দীর্ঘদিন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের অনারারি কর্নেল পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বোন শিরিন বেগম কাজীও ছিলেন ডাক্তার।

৩৮. *The East Bengal Civil List up to 1st January 1953*, The East Bengal Civil Medical Department, Medical College and Hospital, Dacca.

৩৯. চাঁদ সুলতানা কাওছার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৪৭-১৯৭১), অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ২০২১, পৃ.২৮৪

৪০. মেহেরুন্নেসা মেরী, *উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ.৮

৪১. *বেগম*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

৪২. *বেগম*, ৪ জুলাই, ১৯৪৮

৪৩. *Census of Pakistan-1961*, Vol. 5, East Pakistan, Ministry of Home and Kashmir Affairs Home Affairs Division, Govt. of Pakistan, Table 2, pp. 18-22

৪৪. *পাকিস্তানী খবর*, ৪ মে, ১৯৬৮, ১৭ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, পৃ. ১৫

৪৫. মাসুমা খানম, *সাংবাদিকতায় নারী: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, অন্তর্ভুক্ত: *নিরীক্ষণ*, জানুয়ারি, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ, পিআইবি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৬-৩৭, উদ্ধৃত- অনুপম হায়াৎ, 'গণমাধ্যম ও নারী: সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা:), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১২

৪৬. রাবেয়া খাতুন, *স্বপ্নের শহর*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৮-৯৫; উদ্ধৃত-অনুপম হায়াৎ, *প্রাগুক্ত*

৪৭. শান্তা মারিয়া, *সাংবাদিকতায় বাংলাদেশের নারী*, অন্তর্ভুক্ত: *নিরীক্ষণ*, মার্চ–এপ্রিল, ২০০৮, পৃ.১২-১৩; উদ্ধৃত: অনুপম হায়াৎ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩

৪৮. লায়লা সামাদ ১৯৫০ সালে সাপ্তাহিক *বেগম* এর সহ-সম্পাদক এবং ১৯৫২ সালে *দৈনিক সংবাদ*-এর স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাসিক *অনন্যা* ছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেন পাক্ষিক *বিচিত্রা*। এছাড়াও তিনি *দৈনিক পূর্বদেশ* এর শিশু বিভাগ, *দৈনিক বাংলার* মহিলা বিভাগ, সাপ্তাহিক *চিত্রালীর* মহিলা বিভাগ পরিচালনা করতেন। সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা:), *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৩৫৮-৫৯

৪৯. শান্তা মারিয়া, *পূর্বোক্ত*

৫০. *পূর্বোক্ত*

৫১. *বেগম*, ২৫ এপ্রিল, ১৯৬৫

৫২. সাইদা খানম, *স্মৃতির পথ বেয়ে*, যুক্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৫-১৭

৫৩. শামীমা চৌধুরী, *বেতার গণমাধ্যমে নারী*, অন্তর্ভুক্ত: *নিরীক্ষণ*, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৩৩; উদ্ধৃত-অনুপম হায়াৎ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১৯

৫৪. কাজী মদিনা, *মনে পড়ে আজ*, কেরামত মওলা ও অন্যান্য (সম্পা:), *বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২১৬-১৭; উদ্ধৃত-অনুপম হায়াৎ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২০

৫৫. অনুপম হায়াৎ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩২২

৫৬. সালমা খান, *একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৯

৫৭. *বেগম*, ২৪ জুলাই, ১৯৬৬

৫৮. *বেগম*, ২৪ জুলাই, ১৯৬৬

৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৯, পৃ.১১

৬০. ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস অফিসারগণ এবং তাদের চাকুরি বৃত্তান্ত, *available at songramer note book.com)*

৬১. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed, *Women of Pakistan*, Zed Books Ltd., New Jersey, USA, 1987, p. 22

৬২. *বেগম*, ৩ জুলাই, ১৯৬৬; উদ্ধৃত-মালেকা বেগম (সম্পা.), *নির্বাচিত বেগম: অর্ধ শতাব্দীর সমাজ চিত্র ১৯৪৭-২০০০*; পাঠক সমাবেশ, ২০০৬, ঢাকা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯৮

৬৩. *বেগম*, ১৭ মার্চ, ১৯৬৩; উদ্ধৃত: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯৬

৬৪. সেলিনা বাহার জামান, সাত নম্বর বক্শী বাজার; *শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ইডেন কলেজ*-স্মারক গ্রন্থ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা, ১৯৯৯-২০০০, পৃ.৯৫

৬৫. *বেগম*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

৬৬. *Census of Pakistan 1961, Ibid*

৬৭. Hanna Papanek, purdah in Pakistan: Seclusion and Modern Occupations for Women, *Journal of Marriage and the Family,*1971, p. 525; উদ্ধৃত- Salma khan, *History of women Empowermen Through Entrepreneurship Since the Independence of Bangladesh*, M.Phil thesis, Department of History, University of Dhaka, 2021, p. 88

৬৮. *বেগম*, ১৪ আগস্ট, ১৯৬৮

৬৯. *বেগম*, ১৪ আগস্ট, ১৯৬৮

৭০. *বেগম*, ১৪ আগস্ট, ১৯৬৮

৭১. সালমা খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

৭২. *পাকিস্তানী খবর*, ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৮

৭৩. *পাকিস্তানী খবর*, ১ জুলাই, ১৯৬৮

৭৪. *বেগম*, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭০

৭৫. *পাকিস্তানী খবর*, ২৩ শে মার্চ, ১৯৬৮, পৃ.৫৮

৭৬. *বেগম*,৭ এপ্রিল, ১৯৬৩

৭৭. *পাকিস্তানী খবর*, ৮ জুলাই, ১৯৬৭, পৃ.১৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/জুন ২০২৪

ভারতবর্ষে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের গোড়ার কথা

মো. গোলাম কিবরিয়া*

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতে শিল্প শ্রমিকদের গড়ে ওঠার ইতিহাস এবং তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির ক্রমবিবর্তন অনুসন্ধান করতে গেলে কয়লাখনি শিল্পকে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। পরিমাণ কম হলেও ১৭৭৫ সালে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয় কুটির শিল্প থেকে কারখানা ব্যবস্থা উত্তরণের প্রথম থেকেই। ভারতবর্ষে কারখানা ব্যবস্থার সূত্রপাত বিলম্বিত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে। কারখানা ব্যবস্থার সূচনা ১৮৫০-এর দশকে। ১৮৫১ সালে বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) সর্বপ্রথম একটি কাপড়ের কল ও ১৮৫৪ সালে কলকাতায় একটি পাট কল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে কারখানা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। কারখানা শিল্পের চালিকা হচ্ছে শ্রমিক। আর আধুনিক বৃহদাকার কারখানা শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলেই শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ। শ্রমিক শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হলেও নির্মম বা নিষ্ঠুর ব্যবস্থাপনা ও সরকারের সামনে অসহায়, দরিদ্র এবং অশিক্ষিত শ্রমিকদের একত্র হওয়ার প্রচেষ্টা প্রায় অসম্ভব ছিল তখন। এমতাবস্থায় মানবদরদি (Philanthropist) সোরাপজী সাপুরজী ১৮৭৫ সালে শ্রমিকদের অবস্থা সরকারের নজরে আনেন। এহেন পরিস্থিতিতে লখেন্দে বম্বেতে একটি বিশাল শ্রমিক সমাবেশ আয়োজন করেন এবং শ্রমিকদের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকশ্রেণির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সাপ্তাহিক ছুটি মঞ্জুর করে। অতঃপর লখেন্দে সংগঠিত করেন মিলহ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন এবং তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৭৭ সালে প্রথম হরতাল পালিত হয় মজুরি হার নিয়ে এবং এ হরতালকে অনুসরণ করে আরো কিছু হরতাল পালিত হয়। ১৮৮১ সালে প্রথম কারখানা আইন পাস হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ান বিপ্লব সংঘটিত হয়। এরপর ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে লেবার ইউনিয়ন প্রথম গঠিত হয়। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ১১ এপ্রিল, অতঃপর 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (AITUC) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে। এভাবেই শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে চলে। আলোচ্য নিবন্ধে সূচনাকাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: ভারতবর্ষ, শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব, শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলন।

ভারতবর্ষে শ্রমিকসংঘের** উৎপত্তি বা গোড়ার কথা জানতে হলে পঞ্চায়েত*** এবং গিল্ড**** (Guild)-এর যুগে ফিরে যেতে হবে। এক সময় প্রতিটি গ্রামের গিল্ড এবং পঞ্চায়েতগুলো তাদের সদস্য ও প্রভু বা মালিক পক্ষের মধ্যকার বিবাদগুলো মিটিয়ে ফেলতো। ধোপা, নাপিত অথবা যেকোনো শ্রেণির কারিগরদের সাথে মালিকপক্ষের মধ্যকার মজুরি বা কাজের শর্তাবলি সংক্রান্ত অভিযোগ মিটিয়ে ফেলার পন্থা উদ্ভাবন করতো সেই বৃত্তিভুক্ত পঞ্চায়েতগুলো। প্রচলিত বা প্রথাগত পদ্ধতি ছিল প্রথমে মালিক পক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ অবহিত করানো, বিবৃতি প্রদান এবং প্রয়োজন হলে সেই মালিকের কাজ করতে অস্বীকৃতি জানানো। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তকে সদস্যদের কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। কেউ যদি এই সিদ্ধান্তের বরখেলাপ করত তাহলে

* প্রাক্তন অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ

তাকে সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করা হতো। পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে তখন যথেষ্ঠ একতা ছিল। এভাবেই ধীরে ধীরে সেদিন বিভিন্ন শ্রেণির কারিগররা সংঘবদ্ধ হতে থাকে।*****

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও কুটিরশিল্প প্রথম বিকাশ লাভ করে। সমগ্র ভারত তথা বাংলার কুটির শিল্পের খ্যাতি ছিল এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশে। বিশেষ করে মধ্যযুগে বস্ত্র বয়নশিল্পে বাংলার খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। এই বিষয়ে প্রথিতযশা দুইজন লেখকের দুটি বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো যা আলোচ্য প্রসঙ্গের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় এসে যে বাণিজ্য শুরু করে তার সিংহভাগই ছিল সুতি বস্ত্র। এন.কে.সিনহা বলেন, 'The export of Bengal textile was a major part of the East India company's commercial activities since it had started its operations in Bengal.'[১] এ বিষয়ে সুশীল চৌধুরীও অনুরূপ মন্তব্য করেন, 'The export trade of the European companies, Bengal textiles, were the most important single manufactured article, both in terms of value and volume.'[২] কুটির শিল্পের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে কারখানা ব্যবস্থা।

ব্রিটিশ ভারতের শ্রমিকশ্রেণির ক্রমবিবর্তন যদি আমরা অনুসন্ধান করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কয়লাখনি শিল্পের দিকে তাকাতে হবে। কয়লা উৎপাদন প্রথম শুরু হয় ১৭৭৫ সালে, যদিও পরিমাণের দিক থেকে তা খুবই সামান্য। উল্লেখযোগ্য হারে কয়লা উৎপাদন শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।[৩] উৎপাদন যত কমই হোক না কেন বাংলায় কয়লাখনির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থাংশে। অতএব ভারতবর্ষে কয়লাশিল্প অন্য যেকোনো শিল্পের চেয়ে প্রাচীন।[৪] কয়লা হচ্ছে শ্রমঘন (Labour Intesive) শিল্প। অতএব বলা যেতে পারে যে কয়লাখনি শিল্পের আবিষ্কার বাংলা তথা ভারতবর্ষে জন্ম দেয় শিল্প শ্রমিকের।[৫] আইএলও (ILO)-এর ১৯৩৮ সালের প্রতিবেদনে ভারতবর্ষে কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়।

> The production of coal is the most important mining industry. The first mine was opened at Raniganj in 1820, but it was not until 1854 when the East India Railways reached the coal fields that the industry began to develop. From 6.03 millon tons in 1908, the production of coal rose, though not without fluctuations, to 22.86 million tons in 1930 in British India, showing more than a threefold increase in a generation; in 1936 the figure stood at 20.53 million tons… .[৬]

'গ্রেট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি' ও 'গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানি'– এ দুটো কোম্পানি ভারতে রেলপথ স্থাপনের কাজ শুরু করে। ১৮৫৩ সালে ভারতে ২০ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। ১৮৫৭ সালে হয় ২৮৮ মাইল। ১৭৭০ সালে কয়লাখনি আবিষ্কার ও কয়লা উত্তোলন শুরু হয়। কয়লা বহনের জন্য রেলপথের জরুরি প্রয়োজন ছিল। ১৮৪৩ সালে The Bengal Coal Company প্রতিষ্ঠিত হয়। ঝরিয়া অঞ্চলে বড় বড় কয়লাখনিতে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়।[৭] ৯৫% শতাংশ কয়লা সংগৃহীত হতো বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলায়– যা রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি ও কর্ণপুরা ক্ষেত্রের মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯৫ সালের আগে কয়লাখনিতে সংগঠিতভাবে উৎপাদন শুরু হয়নি। ঐ সালেই সর্বপ্রথম কয়লা উৎপাদন পৌঁছালো

৩ মিলিয়ন টনে– ১৯০৬ সালে উৎপাদিত হলো এর দ্বিগুণ।[৮] মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং বেলুচিস্তানের কয়লাক্ষেত্রে অল্প বিস্তর কয়লা উৎপাদন হতো তবে তা তেমন গুরুত্ব বহন করত না।[৯] উৎপাদনের সাথে সাথে কয়লা খনির শ্রমিকের সংখ্যা ১৮৯০ থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লা খনির চারপাশের গ্রাম থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করতে হতো। ঐ সময় কয়লাশ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২,২৯,১০০ জন; যার বেশিরভাগই স্থানীয়। স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক আসত বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে।[১০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কারখানা ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করলেও শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষ চা, কফি, কয়লা, বস্ত্র এবং পাট শিল্পকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে শ্রমিক একটি শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলা[১১]

ভারতবর্ষে প্লান্টেশন শিল্প (Plantation Industry) প্রাচীন শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্লান্টেশন শিল্প বলতে আমরা বুঝি যে, চাষাবাদ থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিল্প। এইসব শিল্পের মধ্যে প্রাচীনতম শিল্প হচ্ছে নীল, চা, কফি, তুলা, ইক্ষু, রাবার, পাট, তামাক ইত্যাদি। উল্লিখিত শিল্পগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে নীল যা ব্রিটিশরা চাষ করতো বল প্রয়োগ করে প্রধানত বাংলায় তথা ভারতে। বি.বি. ক্লিং (B.B. Kling) এ-প্রসঙ্গে নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করেন–

> Since pre-historic times indigo had been grown and processed in India, and during the Roman Empire and the Middle Ages small quantities had been exported to Europe. It was one of the rare tropical products which first attached European traders to India.[১২]

প্লান্টেশন শিল্পের মধ্যে চা শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীল শ্রমঘন (Labour Intesive) শিল্প না হলেও চা একটি শ্রমঘন শিল্প। নীল, চা বা অন্যান্য প্লান্টেশন শিল্পের প্রসার, তার উৎপাদন এবং বাণিজ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়– আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এসব শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের অভ্যুদয়, তার কার্যপরিবেশ, নির্ধারিত শ্রমঘণ্টা, নায্য মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা, তাদের সামগ্রিক কল্যাণ এবং তাদের একত্র হওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি।

চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য শ্রমিকের চেয়ে ভিন্ন। চা শিল্পে পুরুষ ও মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং শিশু শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। কিশোর-কিশোরী বিশেষ করে শিশু শ্রমিক চা শিল্পে উল্লেখযোগ্য হারে কাজ করত আসাম এবং বাংলায় কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এদের সংখ্যা খুবই কম। চা শিল্পে সাধারণত পুরুষের চেয়ে মহিলা শ্রমিক বেশি নিয়োজিত ছিল।[১৩] এশিয়ার বেশকিছু দেশে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তদানীন্তন সিলন ও ভিয়েতনামে ৫০ শতাংশ মহিলা শ্রমিক প্লান্টেশন শিল্পে নিয়োজিত ছিল। ভারত এবং মালয়-এ ৪০ শতাংশের উপরে নারী শ্রমিক নিয়োজিত ছিল এবং পাকিস্তান ও ফিলিপাইনে মহিলা শ্রমিকের হার ছিল ৩৫ শতাংশ।[১৪] জেনেভায় অবস্থিত ILO কর্তৃক পরিচালিত ভারতের শিল্প শ্রমিকদের ওপর একটি প্রতিবেদনে ভারতবর্ষে চা চাষের অঞ্চলগুলো সম্বন্ধে একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরা হয়– চা চাষ প্রধানত আসাম ও বাংলায় হতো। আসামে চা চাষ বিস্তৃত ছিল ব্রহ্মপুত্র অথবা আসাম উপত্যকার

উত্তর ও দক্ষিণে সুরমা উপত্যকায়। বাংলায় উত্তর অঞ্চলে দার্জিলিং, তেরাই (Teari) ও ডুয়ার্স (Dooars) এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চালে ত্রিপুরা নিয়ে গঠিত চা উৎপাদনকারী অঞ্চল। এছাড়া ভারতবর্ষে অল্পকিছু চা উৎপাদন করতে দেখা যায় পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায়।[১৫]

বাংলার পূর্বে আসামে চা চাষ শুরু হয় ১৮৩৪ সালে। পঞ্চানন সাহা চা উৎপাদন প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য[১৬] প্রদান করেন: "Major Robert Bruce discovered indigenous tea plant in Assam in 1823. During the following decade discovery of wild tea was made in Assam and in 1834 Lord William Bentinck appointed a commission charged with the duty of submitting to Goverment "a plan for accomplishment of the introduction of tea cultivation in India and for the superintendents of the execution. এ প্রসঙ্গে তুষারকান্তি ঘোষের তথ্যটি প্রণিধানযোগ্য, The experimentation in cultivation of tea in India was undertaken by the Government in 1834, Tea makers and artisans from China were introduced in 1837 and some consigments of manufacture of Assam tea were forwarded to the Court of Directors in the year 1838-39.[১৭]

পরে আসামে প্রচুর চা বাগান গড়ে ওঠে। অসমীয়রা দুর্গমজঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় কাজ করতে অনাগ্রহী ছিল। বহিরাগত, আদিবাসী ও নিম্নশ্রেণির হিন্দু শ্রমিকরাই মূলত চা বাগানগুলোতে কাজ করত। যেমন: রাচী জেলা ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল থেকে এবং মধ্য প্রদেশ থেকে এসে প্রতিকূল পরিবেশে শ্রমিকরা চা বাগানে কাজ করতো।[১৮] আসামের চা বাগানগুলোতে কর্মরত দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকদের জন্য দুটি বিশেষ আইন পাস করা হয়েছিল। প্রথমটি হচ্ছে চুক্তিভঙ্গ আইন ১৮৫৯। এই আইনের অধীনে বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা যদি কাজ ছেড়ে চলে যায় তাহলে মালিক পক্ষ চুক্তিভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা নিতে পারবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্লান্টেশন আইন ১৮৬৩, এই আইন অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগকারীরা অনুমতিপ্রাপ্ত (Licensed) হতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদেরও নিবন্ধিত হতে হবে। পলায়নকারী বা পক্ষ ত্যাগকারী শ্রমিকদেরকে বিনা ওয়ারেন্টে বন্দি করার ক্ষমতা দেয়া হয় মালিকপক্ষকে।[১৯] নিম্নের সারণিতে আসামের চা বাগানগুলোয় বসবাসরত নির্দিষ্ট কিছু বছরের শ্রমিকের সংখ্যা দ্রষ্টব্য:

Table 1: Labour Population living in Assam Tea gardens in specified years[২০]

Year	Adults	Children	Total
1877	113,675	46,544	1,57,219
1900	410,075	252,374	622,451
1919-20	624,631	480,733	1,110,364
1935-36	618,034	521,353	1,139,396

Source: ILO Report on Industrial Labour in India,1938, p. 38.

বাংলায় চা উৎপাদন শুরু হয় ১৮৫০-এর দশকে দার্জিলিং-এ এবং তার প্রবৃদ্ধি হয়েছিল দ্রুত গতিতে। চা উৎপাদনকারী জেলা দুটি ছিল দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যার দিক থেকে বাংলায় সংগঠিত (Organised) শিল্পগুলোর মধ্যে পাটের পরেই চায়ের স্থান ছিল। ১৮৭০ সালে দার্জিলিং-এ মোট বাগানের সংখ্যা ছিল ৫৬টি, যেখানে ৮০০০ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। ১৯০১ সালে বাগানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৮ টিতে এবং সেখানে ৬৪০০০ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল।[২১] দার্জিলিং-এর চা বাগানে প্রায় অর্ধেক ছিল স্থানীয় শ্রমিক অবশিষ্ট অংশ ছিল নেপাল থেকে আগত।[২২] জলপাইগুড়ি চা বাগানে স্থানীয় শ্রমিকরা কাজ করতে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। আদিবাসী বা উপজাতীয়রা মূলত সেখানে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত ছিল। জলপাইগুড়ি চা বাগানে বেশিরভাগ শ্রমিক ছিল অভিবাসী (Immigrants); অর্ধেকেরও বেশি শ্রমিক আসত ছোট নাগপুর থেকে।[২৩] ১৮৭৬ সালে মাত্র ১৩টি চা বাগান নিয়ে জলপাইগুড়ি চা বাগান শুরু হয়। ১৯০১ সালে চা বাগানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৫টি এবং যেখানে ৯০ হাজার শ্রমিক কর্মরত ছিল।[২৪]

প্রকৃতপক্ষে অভিবাসী শ্রমিদের সুবাদেই চা শিল্প গড়ে উঠেছিল। কারণ চা শিল্প গড়ে উঠেছিল জঙ্গলাকীর্ণ অসমতল পাহাড়ি অঞ্চলে। আদিবাসীরা পরিশ্রমী ও শক্তিশালী হওয়ায় তারা জমিগুলোকে চাষযোগ্য করেছিল এবং প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পেরেছিল। এসব অঞ্চলে কার্যপরিবেশ ছিল না বললেই চলে। অত্যন্ত স্বল্প মজুরি দেয়া হতো তাদের। জীবনযাত্রার মান কৃষি শ্রমিকদের চেয়েও নিম্নমানের ছিল। এসব কারণেই স্থানীয় শ্রমিকরা চা বাগানে কাজ করতে চাইত না।[২৫] যুক্তরাজ্যে শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় আইরিশ (Irish) অভিবাসী শ্রমিকরাও স্বল্প মজুরিতে কাজ করতো এবং সেখানকার কৃষি শ্রমিকদের তুলনায় খুব খারাপ অবস্থায় দিনাতিপাত করত– যেমনটি বাংলার বাইরে থেকে আসা শ্রমিকদের অবস্থা ছিল।[২৬] অভিবাসী শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চল থেকে বাংলায় আসতো কর্মের খোঁজে আর এর সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ নামমাত্র মজুরি, বসবাসের অযোগ্য বস্তি এবং অমানুষিক খাটুনি খাটিয়ে গড়ে তুলেছিল একটার পর একটা চা বাগান। শুধু চা বাগান নয়, সব শিল্প কারখানাতেই অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর চলেছে অমানুষিক নির্যাতন এবং সেই সঙ্গে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল মালিকদের পুঁজির পরিমাণ।

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বেতে একটি কাপড়ের কল এবং ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষে আধুনিক কারখানা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।[২৭] পাটকল প্রতিষ্ঠার সময়কাল নিয়ে কামরুদ্দিন আহমেদ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্রিটিশ অকল্যান্ড (Ackland) শ্রমিকের প্রাচুর্য ও সুলভতা দেখে ভাবলেন এখানে পাটকল স্থাপন করলে যথেষ্ট লাভজনক হবে। এবং তিনি শ্রীরামপুরে 'ওয়েলিংটন জুটমিল' নামে একটি পাটকল স্থাপন করলেন ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। ভারতবর্ষে এটিই প্রথম পাটকল। ১৮৭৬ সালের মধ্যে বেশ কিছু পাটকল হুগলী নদীর তীরে স্থাপিত হলো।[২৮] ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর পাটশিল্পে জোয়ার দেখা দেয়। এর পিছনে কারণ ছিল রাশিয়ার শন বিশ্ব বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় ফলে অনেক চটকল স্থাপিত হলো ভারতের বিভিন্ন স্থানে। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে Indian Jute Mills Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের পাটশিল্পের সাথে ডান্ডির পাটশিল্পের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯০৮

সালে ভারতের উৎপাদন ডান্ডির উৎপাদনকে অতিক্রম করে যায়।[২৯] পাট শিল্প লাভজনক হওয়ায় পাট কলের সংখ্যা বাংলায় দ্রুত বাড়তে থাকে। পাঁচ বছর মেয়াদি (Quinquennial) পাট কলের প্রবৃদ্ধি ও নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নের সারণি[৩০] থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

Table 3: Quinquennial Progress of the Jute Mill Industry in India from 1879 to 1915 and 1918-19

Year	Number of Mills Work	Persons employed
1879-1880	22	27,494
1884-1885	24	51,902
1885-1890	26	59,541
1890-1895	28	4,357
1895-1900	34	102,440
1900-1905	38	133,162
1905-1910	60	204,104
1910-1915	70	238,274
1918-1919	76	275,500

Source: Statistices of British India, Vol. 1 Commercial Statistics, 1921, p. 74

পাট শিল্প লাভজনক হওয়ায় এ শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল। সাথে সাথে শ্রমিক সংখ্যাও বাড়তে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রায় সব পাটকলই প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। ১৮৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত পাট কলের সংখ্যা ছিল ২২টি যা ১৯৩৫-৩৬ সালে উত্তীর্ণ হয় ১০৪টিতে এবং তাঁত ও সুতা কাটার টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল যথাক্রমে ৪৯৪২ ও ৭০৮৪০ থেকে ৬৩৭০০ ও ১.২৭ মিলিয়নে।[৩১] আরও উল্লেখ্য যে, খুব উন্নতমানের এবং পরিমাণে প্রচুর পাট পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত হলেও বিভাগপূর্ব কালে এখানে কোনো পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রিটিশ বেনিয়ারা বা দেশীয় উদ্যোক্তারা শুধু পাটকল নয় কাগজকল, সিগারেট কারখানা বা কোনো ধরনের কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে তোলেনি।

ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের মাধ্যমে নবাব সিরাজের পতন ঘটায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সালে। এরপর ধীরে ধীরে তারা সমগ্র বাংলার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ঠিক এই সময়টাই ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়ার্ধে। ব্রিটেন তথা ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্প বিপ্লব ঘটে ১৭৬০ থেকে ১৮২০ এমনকি ১৮৪০ পর্যন্ত। ফলে ইংরেজরা এদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাজার নষ্ট করে কাঁচামাল রপ্তানি শুরু করে। এদেশের কৃষি ফসলে নতুনত্ব আসে, যেমন নীল ও পাট উৎপাদন। কিন্তু বিদেশে সম্পদ পাচার বেড়ে যায়। শিল্প ও বাণিজ্য হতে বাঙালি সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হয় এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কিছু আধুনিক শিল্প স্থাপন হয়। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের এতে কোনো স্থান ছিল না। অধিকাংশ শিল্প প্রচেষ্টা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।[৩২] ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা প্রভৃতি শহর নদী তীরে অবস্থিত হলেও তারা এখানে কোনো শিল্পাঞ্চল স্থাপন করতে মোটেও আগ্রহী ছিল না। শিল্প স্থানীয়করণের (Localization of

Industries) তত্ত্ব অনুযায়ী প্রচুর কাঁচামাল ও পরিবহণ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তা বিবেচনায় আনা হয়নি।

পাট কলের শ্রমিকদের ওপর ফলি (Foley) ১৯০৬ সালে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন, 'Twenty years ago all hands were Bengalies'[৩৩] অর্থাৎ ২০ বছর পূর্বে পাটশিল্পে সব শ্রমিকই ছিল বাঙালি। ১৮৯৫ সালে পাট শিল্পে বাঙালি শ্রমিকরা এসেছিল মূলত: কৃষিক্ষেত্র ও বয়নশিল্প থেকে– যার মোট সংখ্যা ছিল ৫৩.৬ শতাংশ। পরবর্তীকালে পাট শিল্পে বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে যখন বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যা থেকে অধিক সংখ্যক শ্রমিক যোগদান করতে থাকে।[৩৪] অধিক সংখ্যক শ্রমিক আগমনের পেছনে নিশ্চয় কিছু কারণ নিহিত রয়েছে; কারণগুলো আলোচনা ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাংলায় অধিক সংখ্যক শ্রমিক আগমনের পেছনে অনেক কারণ ছিল– বাংলার সবুজ শ্যামল প্রকৃতি, আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চরমভাবাপন্ন নয়, ১৯১১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। বাংলা প্রেসিডেন্সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির তুলনায়। ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতো কলকাতা থেকে। অতএব সমগ্র ভারতের জনগণ ছুটতো বাংলাদেশের দিকে কর্মসংস্থানের খোঁজে এবং পরবর্তীকালে তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করতে পছন্দ করত। তদুপরি, কর্মী সংগ্রহের কন্ট্রাকটাররা এবং শ্রমিক সর্দাররা মূলত ছিল অবাঙালি। তারা আঞ্চলিক স্বজনপ্রীতি দোষে দুষ্ট ছিল। সর্দার এবং কন্ট্রাকটাররা তাদের এলাকার শ্রমিকদের উৎসাহিত করত নিজেদের শিল্পাঞ্চলে আসতে।[৩৫]

বাংলায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি শ্রমিক ছিল নিজস্ব কর্মস্থলের আশেপাশের জেলাগুলো থেকে আসা, বাকি দুই তৃতীয়াংশ শ্রমিক আসত ছোট নাগপুর, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ থেকে। দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে দুই পঞ্চমাংশ বাংলা প্রদেশের নিজস্ব শ্রমিক যারা নিজ কর্মস্থলের আশেপাশে অবস্থান করত। বাকি অংশ আসত যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে। এ জন্যই বাংলা ছিল শ্রমিক গ্রহণের প্রদেশ, শ্রমিক প্রেরণের নয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের ঘাটতি ছিল লক্ষণীয়।[৩৬] স্থানীয় অদক্ষ শ্রমিকেরও অভাব ছিল, কারণ বাংলার কৃষকরা ছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা অবস্থাসম্পন্ন। বাংলার মাটি ছিল অত্যন্ত উর্বর, পানির সরবরাহ ছিল যথেষ্ট এবং মূল ফসল পাট ছিল তাদের একচেটিয়া। তুলনামূলকভাবে কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা ছিল এবং মজুরিও ছিল উচ্চ। এসব কারণে কৃষি শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা থাকায় শিল্প শ্রমিকদের ঘাটতি থাকত বাংলায়।[৩৭] এ ছাড়াও বাংলার পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল মারাত্মক, যে কারণে এসব অঞ্চলের মানুষেরা খনিতে ও কারখানায় পরিশ্রম সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর কাজ করতে অক্ষম ছিল। তবে দক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতার পেছনে আরো কিছু কারণ ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলায় শিক্ষার হার অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এগিয়ে ছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছিল

অধিকহারে– যারা নিজেকে ভদ্রলোক হিসেবে ভাবতে শুরু করায় অফিসে করণিক ও বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে নিয়োজিত থাকাটা পছন্দ করত এবং কায়িক পারিশ্রমকে তারা ছোট করে দেখত। এ সব নানাবিধ কারণে বাংলায় শ্রমিকের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।[৩৮]

এরপর ক্রমে ক্রমে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করল। আর শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি তখন মানবেতর জীবন যাপন করছিল। তাদের ছিল না কোন নির্ধারিত শ্রমঘণ্টা। সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করত। সাপ্তাহিক ছুটিও দেওয়া হতো না তাদের। দিনের মাঝে ছিল-না খাওয়ার বিরতি। মজুরি যা দেওয়া হতো তা দিয়ে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মিটতো না। আর পি দত্ত এ প্রসঙ্গে বলেন, 'In India the vast majority of workers get a wage which is not enough to provide them with the meanest necessities of life'[৩৯] তাদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না। S. A. Dange লিখিত *On the Indian Trade Union Movement* গ্রন্থে তিনি সে সময়ের কারখানাগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন–

> From 1852 on to 1880, the working class in these Factories was exploited most inhumanly and without pity. Arrogant Britishers, pious Hindus, religious Moslems, all combined irrespective of their religion, nationality, language or country in bleeding men, women and childrean in these slaughter house of capital. There was no limit on hours of work. Men, women and children were herded in the dens of capital to work from 12,16,18 and even 23 hours per day. There was no Sunday, no holiday, no starting and closing time. And when they died or were maimed in the machines, there was no value for their life or limb.[৪০]

অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এসব কারখানায় শ্রমিকদের অমানবিকভাবে শোষণ করা হতো। শ্রম-সময়ের বা কাজ করার সময়ের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। নারী, পুরুষ এবং শিশুরা পুঁজিপতিদের শিকার হয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো, ষোল, আঠারো এমনকি তেইশ ঘণ্টাও কাজ করত। কোনো ছুটির দিন ছিল না, কাজ শুরু ও শেষ করার কোনো সময় ছিল না। এবং যখন তারা মারা যেতো বা কল-কব্জায় আঘাত পেয়ে পঙ্গু হয়ে যেত তখন তাদের জীবন বা অঙ্গপ্রতঙ্গের কোন মূল্য দেয়া হতো না। এস এ দাঙ্গের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, কারখানা শ্রমিকদের অবস্থা দাস-দাসীদের থেকেও নিকৃষ্ট ছিল। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এদের একটা তথাকথিত মজুরি দেওয়া হতো। তাদের যে মজুরি দেওয়া হতো সেটা ছিল জীবন ধারণোপযোগী মজুরির[৪১] চেয়েও কম।

১৮৭৭ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে অবস্থিত তুলা কলগুলোয় মাসিক গড় মজুরির হার ছিল দশ থেকে বিশ রুপি পুরুষ শ্রমিকদের জন্য এবং সাত থেকে নয় রুপি মজুরি নারী শ্রমিকদের জন্য।[৪২] ভারতীয় কারখানা কমিটির ১৮৯০ সালে (Indian Factories Committee,1890) বোম্বে শহরের জন্য সংগৃহীত আনুমানিক মজুরি তথ্য নিম্নের সারণিতে[৪৩] দেখানো হলো:

Table 4: Monthly Wage of Different Group of Labourers

Groups	Monthly wages
Minor girl	Rs. 5
Boy	Rs. 6 to 7
Adult Female	Rs. 6 to 10
Adult Male (other than weavers)	Rs. 10 to 12
Adult Male (weavers)	Rs. 12 to 15

Source: Sukomal Sen, p. 40

১৮১৮ সালে কলকাতায় 'ফোর্ট গ্রাস্টার মিলস' নামে একটি সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই ভারেতের প্রথম সুতাকল। বোম্বায় অঞ্চল তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। একে কেন্দ্র করে সুতাকল গড়ে উঠল। ১৮৫৪ থেকে বোম্বায় অঞ্চলে সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৭৯-৮০ সালে মোট সুতাকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮টি। চটকল ও সুতাকলে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করতে থাকে। ভারতে কাঁচামালের প্রাচুর্য ও সস্তা শ্রমিকের কারণে বৃটিশরা এখানে বিনিয়োগ করতে থাকে। জামসেদ জি টাটা ১৯০৮ সালে জামসেদপুরে স্টিলমিল (আয়রন এন্ড স্টিল ওয়ার্কস) স্থাপন করেন। এসবের মধ্যদিয়ে ভারতে শ্রমিক শ্রেণি সংখ্যায় বেড়ে যায় এবং ক্রমশ তা আরো বাড়তে থাকে।[৪৪]

ভারতে কারখানা আইনের প্রবর্তন শ্রমিকদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আনে। তবে ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য আইন প্রণয়নের সূচনা পুরোপুরি জনকল্যাণের স্বার্থে হয়নি। ভারতে কারখানা আইন না থাকায়– বৃটিশ সংসদে এপ্রিল, ১৮৭৪ সালে আইনটি প্রথম উত্থাপন করেন জনৈক সংসদ সদস্য। এরপর হাউস অব লর্ডস (House of Lords)-এ ১৩ জুলাই ১৮৭৫ তারিখে আর্ল অব শ্যাফ্টবুরে (Earl of ShaftsBury) বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ভারতে সস্তা শ্রমিক ও কাঁচামাল থাকার পরও যদি ব্রিটিশ উৎপাদকদের সেখানে শ্রমিকদের ষোল/সতেরো ঘণ্টা কাজ করার অবৈধ সুযোগ দিই তাহলে আমাদের দেশীয় (ব্রিটেনের) উৎপাদকদের ওপর তার প্রভাব পড়বে এবং দেখা যাবে ভারতে উৎপাদিত পণ্য আমাদেরকে আমদানি করতে হচ্ছে। এই একই সুবিধাবাদী মনোভাব নিয়ে ল্যাংকাশায়ারের (Lancashire) চেম্বার অব কমার্স ১৮৭৮ সালে মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের শোষণের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব পাস করে। ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব কমার্সও (Manchester Chamber of Commerce) অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে নভেম্বর, ১৮৭৮ সালে। বৃটিশ ভারতের কাপড়ের কলগুলোয় অতিরিক্ত কাজের সময়, মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কারখানা আইনের ধারাগুলো প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।[৪৫] তবে ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণের চিন্তায় ব্রিটিশ প্রশাসন যতটা না চিন্তিত ছিল তার চেয়ে বেশি চিন্তিত ছিল এই ভেবে যে ভারতে এরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করলে ভারতের ব্রিটিশ উৎপাদকরা অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে খুব কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারবে যার ফলে খোদ যুক্তরাজ্যের শিল্প কারখানাগুলো হুমকির সম্মুখীন হবে।[৪৬]

ব্রিটিশদের এরূপ একটি চিন্তা ভাবনার পাশাপাশি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের নির্যাতিত নিষ্পেষিত শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে কিছু পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। ভারতের শিল্প

শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালের মে মাসে। হাওড়া স্টেশনের রেলশ্রমিক এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে।[৪৭] ১৮৭০-এর দশকে বেশ কিছু শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে অল্পবিস্তর সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। আর এই সচেতনতার পেছনে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির অবদান ছিল অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে কমলা সরকার বলেন, 'The Early attempt to organise labour in Bengal were made by a few intellcetuals in 1870. Sasipada Banarjee and Dwarkanath Ganguli were the two pioneers in that field organising the industrial labour in Bengal'.[৪৮] কিছু মানব হিতৈষী ব্যক্তি শ্রমিকদের করুণ অবস্থা দেখে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানুষের জন্য মানুষের অনুভূতি থেকে এগিয়ে আসেন তাদের সাহায্যে। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে দু'একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যেখানে শ্রমিকদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অমানবিক আচরণের করুণ কাহিনি প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বর্ণ পরিচয়হীন শ্রমিকদের সাক্ষরতাদান করার জন্য কিছু নাইট স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় ভারতীয় কংগ্রেসের জন্মের পূর্বে।[৪৯]

বাংলায় একদল শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রমিকদের সংগঠিত করতে এগিয়ে আসেন ১৮৭০-এর দশকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শশীপদ ব্যানার্জী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শশীপদ ব্যানার্জী যিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন সদস্য– তিনি কলকাতার কাছে বরানগর থেকে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৭৪ সালে। যে পত্রিকার মাধ্যমে তিনি শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে এবং তাদেরকে শিক্ষিত করার ব্যাপারে আওয়াজ তোলেন।[৫০] এরপর বোম্বে থেকে নারায়ণ মেঘাজী লোখেন্দে (Narayan Meghajee Lakhande) এবং আরেক ভদ্রলোক 'দীনবন্ধু' (Friend of the poor) নামে একই উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৯৮ সালে। শশীপদ ব্যানার্জী 'ভারত শ্রমজীবী' প্রকাশ করার পূর্বে ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ার্কিং মেনস ক্লাব (Working mes's club)। ভারতবর্ষে সম্ভবত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এটিই প্রথম।[৫১] ১৮৭৮ সালে কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন 'ওয়ার্কিং মেনস মিশন' (working men's mission)– যার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের মধ্যে এবং অনুন্নত শ্রেণির মধ্যে ধর্মীয় নৈতিকতা ইত্যাদি প্রচার করা।[৫২] ঐসব শিক্ষিত মানব হিতৈষী ব্যক্তির পরিশ্রমের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে সাহস ও সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। ভি ভি গিরির ভাষায়– 'In 1877 the first strike over wage rate was recorded at the Empress Mills at the Nagpur, and few other strikes were also recorded in eightees'.[৫৩]

এখানে অপর একজন মানবকল্যাণ কর্মী ও সমাজহিতৈষীর প্রসঙ্গে কিছু না বললে অবিচার করা হবে। আনুশুয়াবেন সারাভাই (Anusuyaben Sarabhi) আহমেদাবাদের একজন মিল প্রতিনিধি (Mill Agent)-এর কন্যা যিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং সেখানে তিনি সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলো কিভাবে কাজ করছে তা স্বচক্ষে দেখে ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি আহমেদাবাদের বয়ন শ্রমিকদের সাথে এবং আহমেদাবাদের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ শুরু করেন। শ্রমিকদের এবং দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের সাথে নিয়ে সেখানে কিছু স্কুল এবং তাদের মঙ্গলার্থে কিছু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। শ্রমিকরা অতি দ্রুত

তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাকে তাদের বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে এবং কোনো অসুবিধায় পড়লে তখন শ্রমিকরা তার কাছে সহায়তা চাইত।[৫৪]

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আহমেদাবাদের শ্রমিকরা পুনরায় হরতাল শুরু করে ১৯১৭ সালে। আনুশুয়া বেন এই হরতালে নেতৃত্ব দেন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ৪ ডিসেম্বর ১৯১৭ ভারতবর্ষে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে বিশেষ করে আহমেদাবাদের ক্ষেত্রে। এটি এমন একটি দিন ছিল যখন শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করেছিল তাদের স্ব-উদ্যেগে শ্রমিক সংঘের ভিত্তিতে। দিনটি আহমেদাবাদ বয়ন শ্রমিক কর্তৃক উদ্‌যাপিত হয় শ্রমিক দিবস হিসেবে। উল্লেখ্য যে, দেশের প্রথম প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন যা শ্রমিকদের দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং তাতে নেতৃত্ব দেন একজন মহিলা। হরতাল সফল হয় এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পায়।[৫৫]

১৮৭৫ সালে সোরাবজী শাপুরজী (Sorabji Shapurji)-এর তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে কিছু সমাজ সংস্কারক ও জনকল্যাণকামী (Philanthropists) মানুষ একত্র হয়ে শ্রমিকদের অবস্থা বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের দুর্বিষহ অবস্থা নিরসন কল্পে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বোম্বেতে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আইন প্রণয়নের দাবি জানাতে থাকেন। সোরাবজী সাপুরজী প্রথম বাঙালি (Sorabjee Shapurjee Bengali) যিনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে একটি কারখানা আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি একটি শ্রমিক আইনের খসড়া বিল প্রণয়ন করে বোম্বের প্রশাসক (Governor)-এর কাছে উপস্থাপন করেন ১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে। বাংলার চেম্বার অব কমার্স ও বোম্বের চেম্বার অব কমার্স এ বিলের প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে। তার সাথে সাথে বোম্বের এবং কলকাতার ব্যবসায়ী সমিতি, ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সমিতি, বিভিন্ন কারখানার ব্যবস্থাপক এবং বেশ কিছু ব্যক্তি এ ধরনের একটি আইনের বিরোধিতা করে এবং তা প্রণয়ন না করার জন্য সরকারের কাছে মত প্রকাশ করে। ব্যবসায়ী এবং উৎপাদনকারী শ্রেণির বিরোধিতা আমলে না নিয়ে ভারত সরকার ১৮৭৯ সালে খসড়া বিলটি সংসদে উপস্থাপন করে, যা মূলত এস এস বাঙালির খসড়া বিলটির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল।[৫৬] বহু প্রতিবন্ধকতা ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও ভারত সরকার বিলটি ১৮৭৯ সালে কেন্দ্রীয় সংসদে উপস্থাপন করে এবং তা পাস হয়। ১৮৮১ সালে বিলটি আইনে পরিণত হয়।[৫৭] কারখানা আইন ১৮৮১ ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারখানা আইন ১৮৮১ সকল উৎপাদনকারী সংস্থায় প্রযোজ্য হলো। কিন্তু এই কারখানা আইনের ধারাগুলো মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। মহিলাদের জন্য দৈনিক ১১ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হয়। কারখানায় কর্মক্ষম শিশুদের বয়স ৭ থেকে ৯ বছর উন্নীত করা হয়, এবং তাদের দৈনিক ৭ ঘণ্টা কার্য সময় ধার্য করা হয় এবং এই আইনে সাপ্তাহিক ছুটিও নির্ধারিত হয়।[৫৮] এরই মাঝে অপর একটি কমিশন গঠিত হয় ১৮৯০ সালে। এই কমিশনে সাধারণ সভ্য হিসেবে এস. এস. বাঙালি এবং মিস্টার লোখেন্দে বোম্বে প্রেসিডেন্সি-এর জন্য স্থানীয় সদস্য হিসেবে মনোনীত হোন। ১৮৯১ সালে নতুন একটি কারখানা আইন পাস হয়।

এন. এম. লোখেন্দেকে (N. M. Lokhande) ভারতবর্ষের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়, যিনি নিজেও একজন শ্রমিক ছিলেন। তিনি ১৮৮৪ সালে একটি শ্রমিক সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে বোম্বের শ্রমিকদের সংগঠিত করেন; সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল সেই

সময় গঠিত কারখানা কমিশন-এর কাছে দাবি দাওয়া পেশ করা। শ্রমিকরা তাদের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছিল, কিন্তু সরকার শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ নিরসনে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। অতঃপর ২৪শে এপ্রিল ১৮৯০ সালে জনাব লোখেন্দে বোম্বেতে একটি জনসভার আহ্বান করেন। এই জনসভায় ১০,০০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। সভায় দৈনিক কাজের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, সাপ্তাহিক ছুটি, মধ্যাহ্নিক কার্য বিরাম (Mid-day recess), আহত হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবি করা হয়। এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বের মিল মালিকরা সাপ্তাহিক ছুটি মঞ্জুর করে। এই বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে মি. লোখেন্দে বোম্বেতে, বোম্বে মিল হ্যান্ডস এসোসিয়েশন (Bombay Mill-hands Association) গঠন করেন এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন।[৫৯] এ প্রসঙ্গে আই.এল.ও রিপোর্টে বলা হয়– 'In 1890 a union callad The Bombay Mill Hands' Association, was organized, but this was loose combination rather than a corporate body, as it had neither definite constitution nor paying membership'.[৬০] বোম্বে মিল হ্যান্ডস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর কোনো শাসনতন্ত্র ছিল না, সদস্যদের কোনো চাঁদার ব্যবস্থা ছিল না বা পরিচালনা পরিষদও ছিল না; তবু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ উদ্যোগটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাচারী বৃটিশ শাসনামলে দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মারাত্মক বিপর্যস্ত শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। বলা যায়, ১৮৮৪ সালের শ্রমিক বিক্ষোভ ও সমাবেশ ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

১৮৮২-১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে ২৫টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।[৬১] ১৮৯৫ সালে কলকাতার বজবজ জুট মিলের ডিরেক্টরদের রিপোর্টে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, মজুররা ধর্মঘট করায় মিলের কাজ প্রায় ছয় সপ্তাহ বন্ধ রাখতে হয়েছে। একই সালে আহমেদাবাদে মিল মালিক সমিতির রিপোর্টে আট হাজার মজুরের ধর্মঘটের কথা লিপিবদ্ধ আছে।[৬২] ১৮৮২-১৮৯০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রচুর হরতালের খবর নথিভুক্ত হয়। ঐ সব হরতালে যুক্তরাজ্যের শ্রমিকরাও তাদের নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে। ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে ভারতবর্ষের জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্র সচিব (Secretary of state for India) অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে–সেখানে দাবি করা হয় যে, ভারতবর্ষে কার্যকর কারখানা আইন প্রবর্তন করা হোক।[৬৩] ১৮৯৪ সালে বম্বেতে দুটি হরতাল অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ফলাফল ছিল শূন্য। ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আহমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের প্রথম বড় হরতালের সংবাদ নথিভুক্ত হয়। আহমেদাবাদের মিল মালিক সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৮৯৬ সাল থেকে সাপ্তাহিক-এর পরিবর্তে পাক্ষিক (১৫ দিন) মজুরি পদ্ধতি প্রচলন হবে। এর প্রতিবাদে আট হাজার শ্রমিক কর্মবিরতিতে যায় কিন্তু ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না।[৬৪] ১৮৮৭ সালের ১১ মে বোম্বের মিল মালিক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা আর দৈনিক মজুরি প্রদান পদ্ধতি চালু রাখবে না। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জায়গায় হরতাল অনুষ্ঠিত হতে থাকল। হরতালের পরিপ্রেক্ষিতে আংশিক দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি চালু রইল।[৬৫]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সারা ভারতে শ্রমিকদের হরতাল সংঘটিত হয়। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজের সরকারি ছাপাখানায় হরতাল অনুষ্ঠিত হয় বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত সময় কাজ করার প্রতিবাদে। এ হরতাল ছয় মাস যাবৎ চলে। এবং যথেষ্ট ভোগান্তির পর শ্রমিকরা কাজে ফিরে আসে। কলকাতায় ১৯০৫ সালে ভারতের সরকারি ছাপাখানার শ্রমিকরা হরতালে যায়। তাদের মূল দাবি ছিল ছুটির দিন রোববারে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ না করানো, অন্যায়ভাবে জরিমানা ধার্য বন্ধ করা, অতিরিক্ত কাজে নিম্নহারে মজুরি নির্ধারণ এবং ডাক্তারি সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের ছুটি প্রদানে বাধা প্রদান না করা।[৬৬] কিন্তু হরতালের ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। এক মাস ব্যাপী হরতালের পর সাতজন প্রধান নেতাকে চাকরিচ্যুত করে স্বল্পসংখ্যক দাবি মেনে নেয় কর্তৃপক্ষ। ১৯০৭ সালে বাংলায় সমস্তীপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপে একটি হরতালের খবর জানা যায়। ছয়দিন হরতাল পালিত হবার পর কর্তৃপক্ষ কেবল দুর্ভিক্ষভাতা প্রদান করে।[৬৭]

১৮৯৭ সালে এ্যামালগামেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেন্টস গঠিত ও কোম্পানি আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। ১৯২৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন রেলওয়েমেন' (National Union Railwaymen) নামকরণ করা হয়।[৬৮] এরপর বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেদিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং শ্রমিক আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বজবজ ক্লাইভ জুট মিলে এক হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে। এসময় চটকল শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় ওয়ার্কিং মেনস ইন্সটিটিউশন, প্রিন্টার্স এন্ড কম্পজিটার্স লীগ ইত্যাদি। এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের ৯৫০ জন গার্ড ধর্মঘটে শামিল হয়। প্রচলিত বেতন রীতির বিরুদ্ধেই ছিল তাদের ধর্মঘট। ১৯০৬-০৭ সালে বাংলায় যেমন অনেক শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে তেমনি অসংখ্য আন্দোলনের ঘটনা দেখা যায়।[৬৯]

ক্রমে ক্রমে মিল কারখানার সংখ্যাও বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে। কারণ সুলভ মূল্যে কাঁচামালের সরবরাহ আর নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকপ্রাপ্তি ভারতবর্ষে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৯২-৯৩ সালে বস্ত্রমিলের সংখ্যা ছিল ১২০টি। সেখানে ১৯১২-১৩ সালে মিলের সংখ্যা হয় ২৪১টি। বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে একলক্ষ তেরো হাজার থেকে দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে উন্নীত হয়। এ সময় ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলা হয়: 'By 1914 India had become the fourth greatest cotton manufacturing country in the world.'[৭০] ১৮৯২-৯৩ সালে পাটকলের সংখ্যা ছিল ২৬টি, ১৯১২ সালে এর সংখ্য হয় ৬৩টি। এ খাতে ১৮১২-১৩ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজার যা ১৯১২-তে বেড়ে দাঁড়ায় দুই লক্ষ এক হাজারে। ১৮৯৬-১৯০০ সালে ভারতে খনির সংখ্যা ছিল ১৯১টি; আর তার গড় দৈনিক শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার তিনশত ৬৭ জন। ১৯১১-১৫ সালে মোট খনির সংখ্যা হয় ৫৬৪টি এবং খনির মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৮শত ৮৪ জন। ১৮৯৪ সালে ভারতে মোট ফ্যাক্টরির সংখ্যা ছিল ৪১৫টি। যেখানে ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮১০ জন শ্রমিক কর্মরত ছিল।

১৯১৪ সালে ফ্যাক্টরির মোট সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৯৩৬; আর সেখানে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৭৩ জন।[৭১]

আমরা সবাই জানি উৎপাদনের উপরকরণ চারটি, যথাক্রমে– জমি, শ্রমিক, পুঁজি ও সংগঠন (Land, Labour, Capital and Organisation)। এই চারটি উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রমিক। কারণ শ্রমিক ছাড়া কারখানার চাকা ঘুরবে না–উৎপাদন হবে না। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে শ্রমিকের প্রতি অবহেলা, লাঞ্ছনা, শোষণ, নিপীড়ন শুরু হয়েছে কারখানা ব্যবস্থার শুরু থেকেই।

পৃথিবীর অন্যন্য দেশের মতো ভারতবর্ষে কারখানা ব্যবস্থার শুরুর দিকে শ্রমিকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। তারপরও ভারতের শ্রমিকশ্রেণি যথেষ্ট সাহসী, প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। শুরুর দিকে সাংগঠানিক দুর্বলতা ও ধর্মঘটে সংগঠন শক্তির অভাব খুব স্বাভাবিক হলেও কেদারনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ভারতে শিল্প শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট পালিত হয় ১৮২৬ সালের মে মাসে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে। হাওড়া স্টেশনে ১২শ রেলশ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭২] ১৮৭৭ সালে নাগপুর এ্যামপ্রেস মিলে মজুরির হার নিয়ে এক ধর্মঘটের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১৯০৪ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। বোম্বের মিলগুলোয় কাজের সময় বর্ধিত করার প্রতিবাদে এবং ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে, রেলওয়ের দোকানগুলো, কোলকাতার সরকারি প্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সে-সময় দারুণভাবে হরতাল সংগঠিত হয়। বাংলার কিছু নেতৃবৃন্দ মুদ্রণ শ্রমিকদের একটি সমিতি গঠন করেন। মাদ্রাজ, বোম্বে ও কলকাতায় ডাক বিভাগের কর্মচারীরা পোস্টাল ইউনিয়ন গঠন করেন, যা পোস্টাল ক্লাব নামে পরিচিত ছিল। শ্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে ১৯০৮ সালে– সে-সময় জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা লোকমান্য তিলকের (Lokmaniya Tilk) ছয় বছর কারাদণ্ডাদেশকে কেন্দ্র করে পুরো বম্বে শহরে ছয় দিন একটানা গণ হরতাল পালিত হয়।[৭৩] প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকার স্বদেশী আন্দোলনে ভীত হয়ে জেলজুলুম ও বিভিন্ন দমননীতির পথ বেছে নেয়। তারা ভেবেছিল এই দমননীতি চালালে স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হবে। ১৯১০ সালে বোম্বায়ের মানব কল্যাণকামীরা শ্রমিক কল্যাণ সংঘ (Working Welfare Association) গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের কাছে আবেদন পেশ করা এবং মালিক শ্রমিকের বিরোধ আপসে মিটিয়ে ফেলা।[৭৪] তখনকার নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন সমিতি বা সংগঠন গড়ে তুলে শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস পান। সে দিনের শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি আজকের আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ। রজনীপাম দত্ত যদিও বলেছেন– '১৯১৪ সালের পূর্বে আধুনিক অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কেবল সীমাবদ্ধ ছিল রেলওয়ের ও গর্ভনমেন্টের উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের মধ্যে'।[৭৫]

বৃটিশ ও দেশীয় তাবেদার পুঁজিপতিদের অত্যাচারের মুখে ভারতের শ্রমিকদের একত্র হয়ে সংগঠন করা তখন দুরূহ ব্যাপার ছিল। ঠিক এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য সোরাবজী শাপুরজীর ভূমিকা, কিছু মানবকল্যাণকামী ব্যক্তির সহযোগিতা এবং এন এম লোখেন্দের ১৮৮৪ সালে শ্রমিকদের সংগঠিত করে 'বোম্বের মিল মজুর সংঘ' (Bombay Mill-hands Association) গঠন শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। প্রাথমিক অবস্থায় আজকের মত সুসংগঠিত শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবাই যায় না। বরং মিল মজুর সংঘকে আমরা শ্রমিক সংগঠনের গোড়াপত্তন বা সূচনা প্রয়াস (Humble start) বলতে পারি।

প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৭, যার প্রভাব ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়), রুশ বিপ্লব (১৯১৭) এবং ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বা আইএলও (ILO) প্রতিষ্ঠা সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণিকে যেমন নাড়া দেয় ভারতেও সেরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে রুশ বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণিকে আশার আলো দেখিয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণি অনেক বেশি শ্রেণিসচেতন হয়ে উঠেছিল। এরপর ভারতে শুরু হলো আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন। যুদ্ধের আমলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ– সে তুলনায় মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু মালিকশ্রেণির মুনাফার পরিমাণ স্ফীত হয়েছিল বহুলাংশে। এরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শ্রমিকদের আরো বেশি সচেতন করে তোলে। শ্রমিক জাগরণের মূলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও সমভাবে কাজ করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মেরুকরণ লক্ষ করা যায়। স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে কংগ্রেস মুসলিম লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়।[৭৬] এতে করে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব আরো তীব্রতর হতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিকশ্রেণির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সংগঠিত করার কাজ করে যেতে থাকেন। এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের একত্রীকরণে এবং তাদের নিজস্ব সমিতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিকদের এক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত ছিল। প্রয়োজন পড়লে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো তাদের ডাকে সাড়া দেবে এবং পক্ষান্তরে শ্রমিক স্বার্থ যখন বিঘ্নিত হবে তখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ব্রিটিশ ভারত তখন জটিল সময় অতিক্রম করছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তারা বৃহৎ কারখানার মালিক এবং সরকারের জন্য সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।[৭৭]

১৯১৭ সালে আহমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলোর এক ইউনিয়ন গঠিত হয়। কিন্তু ঐ সংগঠনের ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অতঃপর বি পি ওয়াদিয়া কর্তৃক ১৯১৮ সালে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এ্যানি বেসান্ত তার সাথে যুক্ত ছিলেন। একে আধুনিক সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রথম সুনিশ্চিত প্রয়াস বলা যেতে পারে, কারণ নিয়মিত চাঁদার ব্যবস্থা ছিল। যদিও এই সংগঠনটি প্রথমিকভাবে গঠিত হয়েছিল বাকিংহাম (Buckingham) ও কর্ণাকটিক (Karnacktic) বস্ত্রকলের শ্রমিকদের নিয়ে, তবে পরবর্তীকালে অন্য ট্রেডের শ্রমিকদেরও এই সংগঠনে যুক্ত করা হয়।[৭৮] ১৯১৭ সালে আহমেদাবাদের মিল শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে হরতালে যায়। ১৯১৮ সালে আহমেদাবাদের শ্রমিকরা পুনরায় হরতালে যায় ৫০

শতাংশ দুর্মূল্য ভাতা (Dearness Allowance) হিসেবে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে। এ বিরোধে মহাত্মা গান্ধী হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁর চমৎকার মধ্যস্ততায় ৩৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি পায়।[৭৯] ১৯১৮ সাল থেকে ভারতীয় কলকারখানায় ধর্মঘটের যে জোয়ার আসে ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে সমগ্র দেশে তার প্রচণ্ডতা ছিল অপরিমেয়। ১৯১৮ সালের শেষভাগে বোম্বাই কাপড়ের কলগুলোর ধর্মঘট গোটা শিল্পের ওপর ব্যাপক আঘাত হানে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত মিলের মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার মজুর কাজ হতে সরে দাঁড়ায়। ১৯১৯ সালের বসন্তকালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে হরতালে যোগদানের আবেদনে মজুরশ্রেণি বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে সব শ্রেণির অখণ্ড জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিকদের রাজনৈতিক ভূমিকারও প্রমাণ দেয়। ১৯১৯ সাল জুড়ে সারা দেশে ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায়। ১৯১৯ সালের শেষভাগে ও ১৯২০ সালের প্রথমভাগে ঐ তরঙ্গ বহু ঊর্ধ্বে যায়।[৮০] ১৯১৯-২০ সালে ভারতে ২৩টি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল; যেগুলো শ্রমিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৮১]

১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট ২০০টি ধর্মঘটে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল।[৮২] দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ইউনিয়নগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়– যে সংগঠনের মধ্যে দিয়ে তারা সাধারণ নীতি বিষয়ে মত বিনিময় এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তদ্নুযায়ী ১৯২০ সালে সর্ব ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress) গঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা শ্রমিক আন্দোলনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রসঙ্গে Ramaswamy and Ramaswamy বলেন, 'The year 1920 also marked the formation of the All-India Trade Union Congress (AITUC). Its first session was presided over by Lala Lajpat Rai who was then also President of the Congress. The formation of the AITUC was the direct result of the formation of the International Labour Organization in 1919.'[৮৩] এরপর ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট (Trade Union Act, 1926) পাস হয়। এই আইন শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি দিক নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।[৮৪] ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আইন একটি আইনগত ভিত্তি প্রদান করে। ১৯১৭ সাল থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নলিখিত ঘটনাবলি ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণিকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং শ্রমিক আন্দোলনে সাহস জুগিয়েছিল– ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ১৯১৮ সালে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন গঠন, ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), ১৯২০ সালে সর্ব ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন (এআইটিইউসি) গঠন এবং ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট পাস হওয়া ছিল উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলতে হয় যে, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মত দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের নেতারা শ্রমিক আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং জাতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রপঞ্চ হিসেবে

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পুরোপুরি একত্র হয়ে কাজ করেছে।[৮৫] ভারতবর্ষেও শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকসংঘ গঠনে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন– যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। V.V. Giri এ প্রসঙ্গে বলেন– 'Political leaders also greatly helped in the formation and development of trade unions. The mass movement started by Lokamanya Tilak, Annie Besant and late by Mahatma Gandhi who raised ripples in the trade union movement.'[৮৬] অর্থাৎ শ্রমিক সংঘ গঠনে এবং উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিপুলভাবে সাহায্য করেন। লোকমান্য তিলক ও এ্যানি বেসান্তের দ্বারা যে গণআন্দোলন শুরু তা পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের ফলে শ্রমিক আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। আর এখানেই নিহিত রয়েছে যুক্তরাজ্য ও ভারতবর্ষের শ্রমিক সংঘ গড়ে ওঠার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। যুক্তরাজ্যের শ্রমিকরাও আমাদের দেশের মতোই মালিক পক্ষ ও সরকারের দিক থেকে বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে সংগঠিত হয় এবং শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে সংসদে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার অভিপ্রায়ে তারা লেবার পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়। কার্ল মার্কসও অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন–

> The workers must form a political party to match the effort of the trade unions. This party would carry the class struggle into every sphere, municipal and national politics, philosopy, literature, the courts, the armed forces and even religious organisations.[৮৭]

লেবার পার্টি যুক্তরাজ্যে সরকারও গঠন করেছে বহুবার। এই দলটি আজও সেখানে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্যাতিত ও বঞ্চিত শ্রমিকদের সংগঠিত ও একত্র করতে সচেষ্ট হন এবং তাঁদের উদ্যোগে শ্রমিক সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলগুলো শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলে আর যুক্তরাজ্যের শ্রমিক সংগঠনগুলো গড়ে তোলে লেবার পার্টির মতো একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

** দি প্রেস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা(১৯১৯), দি ক্যালকাটা ট্রামওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯১৯), নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯), গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯), মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯১৯), পাঞ্জাব প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (১৯১৯), মাদ্রাজ অ্যান্ড সদার্ন মহারাষ্ট্র রেলওয়ে ইউনিয়ন, মাদ্রাজ (১৯১৯), জামসেদপুর লেবার অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), আমেদাবাদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯২০), ইন্ডিয়ান কলিয়ারি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), বি এন রেলওয়ে ইন্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন (১৯২০), অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এ্যান্ড আর এম এস ইউনিয়ন (১৯২০), দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক ইন্ডিয়ান স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), দি বার্মা লেবার ইউনিয়ন (১৯২০), হাওড়া লেবার ইউনিয়ন (১৯২০), দি ওড়িয়া লেবার ইউনিয়ন (১৯২০), বিএ্যান্ডএনডাব্লিউ রেলওয়ে মেন্স অ্যাসোসিয়েশন, বি বি অ্যান্ড সি আই রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), ই বি রেলওয়ে ইন্ডিয়ান এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), বম্বে পোর্ট এপ্লয়িজ ইউনিয়ন (১৯২০), বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন (১৯২০), দি ড্রাইভার্স ওয়েমেন্স অ্যান্ড ফায়ামেন্স ইউনিয়ন, থ্রসল ইউনিয়ন, দি ড্রাইভার্স ইউনিয়ন আমেদাবাদ (১৯২০) ইত্যাদি।

*** পঞ্চায়েত প্রথা (ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা): পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন পঞ্চায়েত প্রথা (পঞ্চায়েত রাজ বা গ্রাম পরিষদ) হলো ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যা প্রধানত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং শ্রীলংকায় বিদ্যমান। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ঐতিহাসিকদের মতে ২৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই পঞ্চায়েত প্রথার প্রচলন ছিল। পঞ্চায়েত শব্দের অর্থ পাঁচ (পঞ্চ) জনের পরিষদ। ঐতিহাসিকভাবে পঞ্চায়েতগুলো স্থানীয় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানী ও সম্মানিত প্রবীণদের নিয়ে গঠিত। ঐতিহ্যগতভাবে এই পরিষদ ব্যক্তি এবং গ্রাম পর্যায়ের বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। জওহরলাল নেহেরু লিখিত *The discovery of India* গ্রন্থে পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। 'The village *Pancahyet* or elected council has large powers, both excutive and judicial, and it's members were treated with the greatest respect by the kings officers. Land was distributed by this *Panchayet,* which also collected taxes out of the produce and paid the govermnets share on behalf of the village. Over a number of these village councils there was a large *panchayet* or council to supervise and interfere if neccesarry.' Jawarharlal Nehru, *The Discovery of India,* Jawarharlal Nehru Memorial Fund, Oxford University Press, Teen Murti House, New Delhi, 1995, p. 248.

**** গিল্ড (Guild) অর্থ সংঘ, শ্রেণি বা একটি ক্লাব। এক পেশায় নিয়োজিত শিল্প বা কারিগর বা বণিকেরা তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে যে সংঘ-প্রথা প্রতিষ্ঠা করে তাই গিল্ড বা সংঘ বা শ্রেণি নামে পরিচিত। ভারতে প্রাচীন গুপ্তযুগে গিল্ড ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, আনুমানিক খ্রিষ্টাব্দ ৩২০ থেকে ৫৫০ অব্দ, উইকিপিডিয়া।

***** V.V. Giri, *Labour Problem in Indian Industry,* (Bombay: Asia Publishing House, 1962), p. 1

১ N.K. Sinha, *The History of Bengal (1757-1905),* (Calcutta: University of Calcutta, 1967) p. 350.

২ Susil Chaudhuri, 'European Companies and Export Trade', *History of Bangladesh (1704-1971),* Ed. Sirajul Islam, Vol. 2, (Dhaka: Asciatic Society of Bangladesh,1997), p. 157

৩ G. Ramanujam, *Indian Labour Movement,* (New Delhi: Sterling Publishers private Limited,1986), p. 6

৪ Panchanan Saha, *History of Working-Class Movement in Bengal*, (New Delhi: Peoples Publishing House, 1978), p. 10

৫ Md. Gholam Kibria, et. al., *Trade Union Movement in Bangladesh*, (New Delhi: Serials Publications, 2006), p. 48

৬ Statistics of British India, 1922, Vol. 1, p. 90; Indian Coal Statistics, Table No. 4, 1936, Quated in ILO Studies and Reports Series A, (Indisteial Relations) No. 41, Industrial Labour in India (Geneva), 1938, Published in the United Kingdom for International Labour Office (League of Nations) by P.S. King & Son, Ltd. Orchard House,14 Great Smith Street, Westminster, London, S.W.1, pp. 24-25

৭ আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, (পড়ুয়া, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৫), পৃ. ১৯

৮ Panchanan Saha, *Op. cit.,*1978, p. 10

৯ S.G. Panadikar, *Industrial Labour in India,* (Bombay: Longmans, Green and Co. Ltd., 1933), p. 93

১০ Sunil Kumar Sen, *An Economic History of Modren India,* (Calcutta: Prograssive Publishers, 1981), p. 314

১১ G. Ramanujam, *Op. cit.*, 1986, p. 6

১২ Blair B. Kling, *The Blue Mutiny: The Indigo Disturbance 1859-1862,* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, USA, 1966), p. 16

১৩ Sarit Bhowmik, *Class Formation in the Plantation System,* (New Delhi: Peoples Publishing House, (P) Ltd., 1981), p. 5

১৪ Easter Boserup, *Women's Role in Economic Development,* (London: Gorge Allen and Unwin Ltd. 1970) p. 76

১৫ ILO Studies and Reports, On Industrial Labor in India, (Geneva, 1938, *Op. cit.*), p. 36

১৬ Quoted in Saha, 1978, *Op. cit*., p. 7

[১৭] Tushar Kanti Gosh, *Op. cit*., p. 3
[১৮] Kamruddin Ahmad, *Op.cit*., p. 3
[১৯] *Ibid*
[২০] ILO Studies and Reports, On Industrial Labor in India, Geneva, 1938, *Op. cit*., p. 38
[২১] Bengal District Gazetteers, Calcutta, 1907, pp. 44-45
[২২] G. M. Broughton, *Labour In Indian Industries*, (London: Humphery University Press, 1924), p. 77
[২৩] Census of India, Vol. 5, part-1, (Calcutta: Bengal Sacratariat, 1912), p. 358
[২৪] Bengal District Gazetteers, Jailpaiguri, (Allahbad: 1911) pp. 102-103
[২৫] G.M. Broughton*, Op. cit*, p. 74
[২৬] *Ibid*
[২৭] A.S. Mathur & J.S. Mathur, *Trade Union Movement in India,* (Alhabad: Chaytanya Publishing House, (1962), p. 12
[২৮] Kamruddin Ahmad, *Op. cit.,* p. 4
[২৯] সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯০৫*, (কলিকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫) পৃ. ২৪
[৩০] Statistics of British India, Vol.1, Commercial Statistics, 1921, p. 74
[৩১] Statistics of British India, Vol.1, Commercial Statistics, 1922, p. 89
[৩২] আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩), উপক্রমণিকা, পৃ. ১৪
[৩৩] Sunil Kumar Sen, *Op.cit.,* p. 312
[৩৪] *Ibid*
[৩৫] *Ibid*, p. 313
[৩৬] S.G. Panadikar, *Op. cit*., pp. 17-18
[৩৭] *Ibid,* p. 18
[৩৮] *Ibid*
[৩৯] Rajni Palme Dutt, *India Today,* (New Delhi: Peoples Publishing House, 1969) p. 388
[৪০] S. A. Dange, *On The Indian Trade Union Movement,* (Bombay: A Communist Party Publication,1952), p. 18
[৪১] জীবন ধারণোপযোগী মজুরি (subsistence wage) হচ্ছে, যে পরিমাণ মজুরি পেলে একজন শ্রমিক বা কর্মী তার পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ কোনো রকমে চালিয়ে নিতে পারে। এলিজাবেথ ল্যানহাম বলেন, মজুরি এমন একটা ন্যূনতম স্তরে নির্ধারিত হতে হবে যা তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য আবশ্যক। ডেভিড রিকাডোও অনুরূপ মত পোষণ করেন– মজুরি এমনভাবে নির্ধারিত হবে যা দ্বারা শ্রমিক তার জীবন ধারণের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে এবং তার বংশধরদের টিকিয়ে রাখতে পারে। এ ধরনের মজুরি পেয়ে শ্রমিকরা মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রা চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ কোনো দিনই দেখতে পারে না।
[৪২] British Parliamentary Papers, (1888), emd 5328, p. 118, Quated in Sukomal Sen, (*Op. cit.,* 1997) p. 40
[৪৩] British Parliamentary Papers, (1891), Paper 86, Quoted in Sukomal Sen, *Op. cit.,* 1997, p. 40
[৪৪] আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০
[৪৫] Kamruddin Ahmad, *Op. cit.,* p. 5
[৪৬] *Ibid*
[৪৭] আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৮ Kamla Sarkar, *Bengal Politics, (1937-1947),* (Calcutta: Mukherjee and Co. Pvt. Ltd.,1990), p.217
৪৯ Sukomal Sen, *Op. cit*., p. 66
৫০ *Ibid*
৫১ *Ibid*, pp. 66-67
৫২ *Ibid,* p. 67
৫৩ V.V. Giri, *Op.cit.,* p. 2
৫৪ G. Ramanujam, *Op.cit.,* p.13
৫৫ *Ibid*
৫৬ G.K. Sharma, *Labour Movement in India: Its Past and Present*, (New Delhi: Sterling publishers, (P). Ltd., 1971), p. 48
৫৭ G. Ramanujam, *Op. cit.,* p. 8
৫৮ Kamruddin Ahmad, *Op.cit.,* p. 6
৫৯ V.V. Giri, *Op.cit.,* p. 62
৬০ ILO Studies and Reports, *Op.cit.,* p. 123
৬১ রজনী পাম দত্ত, *আজিকার ভারত (২য় ভাগ)*, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, ১৯৪৮, পৃ. ২৩৩
৬২ বোম্বাই ফ্যাক্টরি রিপোর্ট, ১৮৯৫, উদ্ধৃত *আজিকার ভারত*, তদেব, পৃ. ২৩৪।
৬৩ G. Ramanujam, *Op.cit.,* p. 8
৬৪ Mukhtar Ahmad, *Trade Unionism and Labour Disputes in India*, Bombay: Longmans Green & Co. Ltd., 1935, p. 13
৬৫ *Ibid*, p.14
৬৬ *Ibid*
৬৭ G.K. Sharma, *Op.cit.,* p. 62
৬৮ Rajni Palme Dutt, *Op.cit.,* p. 235
৬৯ আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
৭০ Vera Anstey, *The Economic Development in India*, (London: Longmans Green & Co.Ltd., 1952), p. 62
৭১ সুকোমল সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩
৭২ মে দিবসের কাহিনী ও ঐতিহ্য, উদ্ধৃত আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
৭৩ V.V. Giri, *Op. cit.* p. 3
৭৪ *তদেব*, পৃ. ২৩৬
৭৫ *তদেব*
৭৬ *তদেব*
৭৭ K. N. Subramanian, *Labour Management Relations in India,* (Bombay: Asia Publishing House,1967), p. 34
৭৮ E.A Ramaswami and Uma Ramaswami, *Industry and Labour: An Introduction,* (Delhi: Oxford University Press, 1981), p. 88
৭৯ *Ibid*, pp. 88-89
৮০ রজনী পাম দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬
৮১ আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
৮২ রজনী পাম দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬
৮৩ E.A. Ramaswami, and Uma Ramaswami, *Op. cit.,* p. 89

[৮৪] V.V Giri, *Op. cit.* p. 12
[৮৫] Basudeb Sahoo, *Op. cit.,* p. 14
[৮৬] V.V. Giri, *Op. cit.,* pp. 4-5
[৮৭] Kamruddin Ahmad, *Op. cit.* pp. XIV-XV